তিন কাহিনী

মনোজ বসু

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট। কলিকাতা-৭৩

প্রথম প্রকাশ :
অক্টোবর ১৯৫৯

প্রকাশক :
ময়ূখ বসু
বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭৩

মুদ্রক :
অজিত কুমার সামই
ঘাটাল প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
১/১এ গোয়াবাগান স্ট্রীট
কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

দাম : পনেরো টাকা

তিন কাহিনী

শত্রুপক্ষের মেয়ে
নরবাঁধ
বনমর্মর

মনোজ বসুর অন্যান্য বই

নিশিকুটুম্ব
বন কেটে বসত
জলজঙ্গল
মানুষ গড়ার কারিগর
ভুলি নাই
বাঁশের কেল্লা
সৈনিক
চীন দেখে এলাম
সেই গ্রাম সেইসব মানুষ

শত্রুপক্ষের মেয়ে

তুমি আমি এবং আর পাঁচটি ভদ্রসন্তান শুইয়া বসিয়া হাই তুলিয়া আরাম করিয়া এই কাহিনী পড়িতেছি। আমার মনের মধ্যে বারম্বার ছবি ভাসিতেছে—জনহীন ছায়াহীন দিগন্তবিসারী এক বালুক্ষেত্র। তারই কিনারে উন্মুক্ত আকাশের নিচে না জানি এতক্ষণ মালঞ্চ নদীর কত খেলাই জমিয়া আসিল। জোয়ার যদি আসিয়া থাকে, লক্ষকোটি তরঙ্গ শিশু খলবল করিতে করিতে দূর-দূরান্তর হইতে ছুটিয়া আসিয়াছে, আনন্দ-বন্যায় দুই কূল ডুবাইয়া ভাসাইয়া ছোট ছোট বাহু দিয়া তারা বাঁধের গায়ে আঘাতের পর আঘাত করিতেছে, একবার বা ছলাৎ শব্দে লাফাইয়া মুখ উঁচু করিয়া দেখিতে চায়, ওদিকের কাণ্ডটা কি? দেখিতে পায় না কিছুই—আবার লাফাইয়া ওঠে—আবার—আবার। বাঁধের খোলে মাছের আবাদ, জলের তুফান। মানুষজন নাই একটা, টিলার উপর কেবল অনেকগুলা ভিটা—দ্বীপের মতো সংখ্যাতীত ভিটা জাগিয়া রহিয়াছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বাঁধের গায়ে লুটোপুটি খাইয়া অবসন্ন জল-তরঙ্গ অবশেষে ভাঁটার টানে ফিরিয়া যায়, চর জাগিয়া ওঠে। মসৃণ চরের কাদায়, শান্ত গাঙের জলে সূর্যলোক বিষণ্ণ হাসির মতো ঝিলমিল করিতে থাকে।

কতদিন ঐ পথে নৌকা করিয়া গিয়াছি। তোমরা কি ভাবিবে জানি না, কিন্তু আমার কেমন সন্দেহ হয়। সেবার হইল কি—একদিন খররৌদ্রে দুপুরের নিস্তব্ধতার মধ্যে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিয়া গেলাম, অসাড় নিস্পন্দ বালুচর। ফিরিবার মুখে রাত্রি হইল। ওরই কাছাকাছি আসিয়া বড় ঝড় উঠিল। নোঙর ফেলিয়া চরের উপর নামিয়া সভয়ে ঝড় থামিবার প্রতীক্ষা করিতেছি, মনে হইল, স্পষ্ট মনে হইল—আমাদেরই মতো আরও বহু জন তেপান্তরের মাঠে হি-হি করিয়া কাঁপিতেছে, তাদের নিশ্বাস নদীর এপার-ওপার ফুঁসিয়া বেড়াইতেছে। অনেক রাত্রে ঝড় থামিয়া গেল, কিন্তু মেঘ কাটিল না। এমন গাঢ় নির্নিরীক্ষ অন্ধকার যে সে যেন জগদ্দল পাথর হইয়া বুক

পিষিয়া মারে। নৌকা আবার চলিল। জলের ঢেউয়ে জোনাকির মতো এক একবার আলোর ফিনকি ফোটে। কোনদিকে কিছু নাই, কি মনে করিয়া বাহিরে তাকাইয়াছি—দেখিলাম, আমাদেরই পাশে পাশে ভাঁটা সরিয়া-যাওয়া অনাবৃত নদীবক্ষের উপর দিয়া সারি বাঁধিয়া ছায়ামূর্তির প্রকাণ্ড একদল চলিয়াছে—এক—দুই—তিন—চার—একের পর এক—কে তাদের গণিয়া পারিবে? দৃপ্ত সমুন্নত গতি-ভঙ্গিমা, কবাট-বক্ষ—নিঃশব্দে পা ফেলিয়া জলস্রোতের সঙ্গে পাল্লা দিয়া তারা চলিয়াছে।

মাঝি! মাঝি!

ছইয়ের মধ্য হইতে একজনে তাড়াতাড়ি আমার টর্চটা লইয়া আসিল। আলো ফেলিয়া দেখি, কিছুই না।

আর একবার পূর্ণিমার রাত, বড় পরিষ্কার জ্যোৎস্না, বোধ করি সেটা চৈত্রের শেষাশেষি হইবে। বাঁধে নূতন মাটি দিয়াছে, হু-হু করিয়া হাওয়া বহিতেছে, বালু উড়াইয়া পরীর পাখা মেলিয়া সমস্ত চরটাই যেন আকাশে উড়িয়া যাইতে চায়। পালে নৌকা চলিতেছিল, দাঁড়িরা শুইয়া শুইয়া খঞ্জনী বাজাইতেছে, বাজনা থামাইতে বলিলাম। মনে হইল, যেন অসমান বহুবিস্তীর্ণ বাঁধের ওধারে লোকালয়-সীমার বহুদূরে আজ রাত্রে বাংলার দুরন্ত সন্তানগুলি শ্মশান-শয্যা-হইতে উঠিয়া বসিয়াছে। যে লাঠিগুলা একদা মালঞ্চের স্রোতে তারা ভাসাইয়া দিয়াছিল, খুঁজিয়া পাতিয়া সেগুলি কুড়াইয়া আনিয়া অম্বুবাচীতে, বীরাষ্টমীতে, লক্ষ্মী পূর্ণিমায় পৌষমাসের দুরন্ত শীতের রাত্রে জ্বলন্ত আগুনের আলোয় যেমন করিয়া বীরভঙ্গিমায় দাঁড়াইত, আজ আবার তেমনি দাঁড়াইয়াছে। জানি, এসব কিছু নয়, দৃষ্টিবিভ্রম মাত্র। বাতাস উড়াইয়া লইয়াছে তাদের চূর্ণীভূত অস্থিপঞ্জর, যুগ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছে তাদের সমস্ত স্মৃতি। বিশ্বাস কর ভাই, পিছনের জন্ত আমি দুঃখ করি না, আমাদের আনন্দ-বেদনা আগামী দিনকে ঘিরিয়া। অতীতের দিকে তাকাইয়া দেখিতে তবু ভাল লাগে। এ মোহ কাটাইয়া ওঠা যায়।

প্রথম অধ্যায়

(১)

চিতলমারির খাল আসিয়া পড়িয়াছে মালঞ্চ নদীতে। খালের যেমন শিষ্ট শান্ত হওয়া উচিত, চিতলমারি সে রকমের নয়। অনেকগুলা দহ—বিশেষ করিয়া মোহনার কাছাকাছি চণ্ডীদহ নামে একটা জায়গা আছে, সেখানে জোয়ারের সময় জল যেন পাগল হইয়া ওঠে। খালের এপারে ঢালিপাড়া—ইহারা শ্যামগঞ্জ তরফের। অনেকদিন আগেকার কথা—শ্যামগঞ্জের নরহরি চৌধুরির সঙ্গে ঝগড়া করিয়া শিবনারায়ণ ঘোষ ওপারে বরণডাঙায় গিয়া নূতন বসতি করিলেন। তারপর ওপারে ঠিক এই রকম এক ঢালিপাড়া পত্তনের চেষ্টা হইয়াছিল। শিবনারায়ণের পরম ভক্ত সাকরেদ চিন্তামণি—নরহরির তুলনায় কোনদিক দিয়া খাটো হইতে রাজি নয়। সে চায়, শিবনারায়ণ আবার নূতন তালুক-মুলুক করিবেন, সদর্পে দলবল লইয়া চিন্তামণি খাল ধার দিয়া ওপারের সঙ্গে টক্কর দিয়া বেড়াইবে। কিন্তু সকল উৎসাহ নিভাইয়া দিলেন শিবনারায়ণ। বলিলেন, না বাপু, ওতে শান্তি নেই। ও-পথ ছাড়তে না পার তো শ্যামগঞ্জে ফিরে যাও। নরহরি লুফে নেবে তোমাদের।

দলের অনেকেই সেই হইতে শ্যামগঞ্জে ফিরিয়া গিয়া মহাস্ফূর্তিতে আছে। চিন্তামণি কেবল ওপারে রহিয়া গিয়াছে, মরমে মরিয়া আছে। আর যে ক'জন আছে তারা অক্ষম অপটু—বয়স হইয়া গিয়াছে, দাঙ্গাবাজিতে আর আগ্রহ নাই তাদের। তারা জন-কিষাণ খাটে, ঘর গৃহস্থালী করে। ক্রমশ বাহিরের আরও দু-দশজন জুটিয়া বরণডাঙার পারেও ছোট-খাট নিরীহ একটি পাড়া জমিয়া উঠিল।

চিন্তামণির সহিত ঘোষ গিন্নি সৌদামিনীর দেখা হইলে হাসিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিতেন, লাঠি কি ফেলে দিয়েছ ওস্তাদ?

না মা, আছে আড়ার উপর তোলা। গরু তাড়াই, ডিঙি বাই

বিলের মধ্যে। তাতে লাঠি লাগে না, লগি আর পাচনবাড়িতে কাজ চলে যায়।

তবে রেখেছ কোন ভরসায়?

শিবনারায়ণের নাবালক ছেলে কীর্তিনারায়ণ। হয়তো তখন মায়ের ভয়ে ছুলিয়া ছুলিয়া সশব্দে শব্দরূপ কণ্ঠস্থ করিতেছে, আর চঞ্চল চোখে এদিক-ওদিক তাকাইতেছে। তাকে দেখাইয়া চিন্তামণি বলে, ঐ উনি ভরসা আমাদের। কর্তাভাই বড় হয়ে যদি নিরাশ করেন, সেইদিন মালঞ্চে লাঠি ভাসিয়ে দেব।

নিশ্বাস পড়ে সৌদামিনীর। এই ছেলে আবার বড় হইবে, বাপের মতো হইবে।

একটা গল্প বলি শোন—ঐ শ্যামগঞ্জ গ্রাম গড়িয়া উঠিবার গল্প। আগে এ অঞ্চলে কোন বসতি ছিল না, পূর্বদিকে মালঞ্চ আর উত্তর-পশ্চিমে ডাকাতের বিলের মাঝখানে পোড়ো মাঠ ধূ-ধূ করিত। এই মাঠের মধ্যে আসিয়া পাঁজা সাজাইলেন শ্যামশরণ চৌধুরি মহাশয়। শ্যামশরণের নামেই মাঠ আজ শ্যামগঞ্জ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পঁচিশ বিঘা জমির উপর ইট-পাথরে তিনি প্রকাণ্ড চক-মিলানো তিনমহল বাড়ি তুলিলেন। লোকলস্কর হাতিঘোড়া অতিথিশালা কোন-কিছুর অভাব রহিল না। এতদিন তো হইয়া গিয়াছে, আজও বাড়ির এক টুকরা মালমশলা খসে নাই—এমন মজবুত কাজকর্ম। কথা কহিলে এখনও কক্ষের মধ্যে গমগম করিয়া বাজে।

শোনা যায়, শ্যামশরণ বিষম জেদি মানুষ ছিলেন। এক রাত্রে মশারি না পাইয়া মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া বাড়ি ছাড়িয়া যান, সে পৈতৃক বাড়িতে জীবনে আর পা দিলেন না। মায়ের মৃত্যুকালে—তখন শ্যামশরণ ধুমধাম করিয়া নগর পত্তন করিতেছেন—ভাইরা আসিয়া হাত-পা ধরিয়া কত কান্নাকাটি করিল, শ্যামশরণ নিশ্চল। মাথা নাড়িয়া বলিলেন, যাও তোমরা, ব্যস্ত হোয়ো না—দেখা হবেই। তা হইল বটে। মায়ের শব শ্মশানে নামাইলে দেখা গেল, মলিন অবসন্ন

মুখে সকলের পিছনে শ্যামশরণ একলা বসিয়া কাঁদিতেছেন। চিতার আয়োজন হইতে লাগিল। যতক্ষণ না চিতায় তোলা হইল, শ্যামশরণ মৃতার পা দু-খানির তলায় মাথা গুঁজিয়া নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিলেন। চিতার আগুন দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। তারপর শ্যামশরণ আর সেখানে নাই।

আর আর ভাইরা পৈতৃক বাড়িতে সাধ্যমতো শ্রাদ্ধ শান্তি করিল, শ্যামশরণ বিপুল সমারোহে নিজের বাড়ি দানসাগরের আয়োজন করিলেন, ভাইদের কারও ডাকিলেন না। ভাইরা নাছোড়বান্দা হইয়া ডাকাডাকি লাগাইলে বরকন্দাজ ডাকিয়া তাদের হাঁকাইয়া দিলেন—এমনও শোনা যায়।

রাত্রিবেলা এক কাপড়ে বাড়ি ছাড়িয়াছিলেন, তখন শ্যামশরণ একরকম শিশু বলিলেই হয়। আর একদিন হাঁকডাক করিয়া গ্রাম বসাইতে লাগিলেন, দোল-দোল-দুর্গোৎসবে অফুরন্ত টাকা খরচ করিতে লাগিলেন, দেশের মধ্যে ভয় ও সম্ভ্রমের অন্ত রহিল না। শ্যামশরণের তখন গোঁফে চুলে পাক ধরিয়াছে। লোকে বলিত, সাত ঘড়া সোনার মোহর তাঁর শোবার দালানের মেজেয় পুতিয়া তার উপর বিছানা পাতিয়া বুড়া ঘুমাইতেন। কোজাগরী পূর্ণিমার রাত্রে ঘরের দরজা-জানলা সমস্ত আঁটিয়া নিজের হাতে সাবলে মেঝের পাথর উঠাইয়া বুড়া ঘড়াগুলি সমস্ত বাহির করিতেন; সমস্ত রাত্রি ধরিয়া পাথরের উপর সোনার মোহর ঢালিতেন, তুলতেন, চটুল হাসি হাসিতেন, আপনার মনে কত কথা বলিতেন, গল্প করিতেন···জানলায় কান দিয়া বুড়ার কোন কোন কর্মচারী একটু-আধটু তাহা শুনিতে পাইত। বৎসরের কেবল এই একটিমাত্র রাত্রি। পরদিন হইতে শ্যামশরণ আবার কঠোর রুক্ষ স্বল্পভাষী ভয়ানক মানুষটি। আর তিনশ' চৌষট্টি দিনের মধ্যে মুখে তাঁর তিলার্ধ বাচালতা নাই।

নিঃস্ব গৃহহারা গ্রাম্যশিশুর ভাগ্যে কি করিয়া অবশেষে এত সোনা জুটিল, সঠিক তাহা জানিবার উপায় নাই। কেউ বলে, রাজা প্রতাপাদিত্যের এক ভাঙা গড়ের উপর বেড়াইতে বেড়াইতে দেয়াল

খসিয়া তিনি মাটিতে পড়িয়া যান। হাঁটু ভাঙিয়া গেল, তারপর খোঁড়া পায়ে কোন গতিকে উঠিয়া দেখিতে পাইলেন, দেয়ালে পোতা সারি সারি কলসির মধ্যে সোনা ঝিকমিক করিতেছে।

কিন্তু বরণডাঙার ঘোষ-বাড়িতে এখন এইসব গল্প কর দেখি—তারা নাক সিঁটকাইয়া বলিবে, ছাই। আসল খবর শুনিতে চাও যদি···

বউভাসির ঘাট বলিয়া বটের ছায়া-স্নিগ্ধ একটা জায়গা আছে ডাকাতের বিলের লকগেটওয়ালা বাঁধালের ধারে। অনেককাল আগের কথা। একবার মাঘের শেষাশেষি এক যুবা তার তরুণী বউকে বাপের বাড়ি পৌঁছাইয়া দিতে পানসি করিয়া যাইতেছিল। বাপের বড় অসুখ—খবর পাইয়া বউটির আহার-নিদ্রা নাই। ন'পাড়ার হাটে পৌঁছিতে সন্ধ্যা হইল। সেখান হইতে চাল ডাল হাঁড়ি মশলাপত্র কিনিয়া ওপারের চরে পানসি বাঁধা হইল, বউটি পরম যত্নে রান্নাবান্না করিয়া স্বামীকে খাওয়াইল, দাঁড়ি-মাঝিদের খাওয়াইল, নিজে কিছু মুখে দিল না। এক ঘুমের পর যুবা জাগিয়া দেখে, দিব্য জ্যোৎস্না উঠিয়াছে—বধূ কিন্তু ঘুমায় নাই, বসিয়া বসিয়া কাঁদিতেছে। পথের বিপদ-আপদের কথা শোনা আছে, তবু সে পানসি খুলিতে হুকুম দিল। পথ সোজা হইবে বলিয়া আড়াআড়ি বিল ফুঁড়িয়া যাইতে বলিল। তাহা হইলে ভোরের কাছাকাছি ঘাটে পৌঁছানো যাইবে। নহিলে নদীতে জোয়ারের অপেক্ষায় থাকিলে কাল বিকালের আগে যাওয়া যাইবে না।

তাদের দেখাদেখি ন'পাড়ার ঘাট হইতে একখানা হাটুরে-নৌকা খুলিয়া দিল। ছপ-ছপ করিয়া সেখানা খানিকটা পিছনে পিছনে আসিতে লাগিল। সে নৌকার লোক চেঁচাইয়া কহিল, আস্তে চল ভাই একসঙ্গে যাওয়া যাক। দু-খানা একসঙ্গে দেখলে কোন সুমুন্দি এগোবে না।

এক বাঁক দু-বাঁক এমনি চলিল। জ্যোৎস্নার আলোয় বিসর্পিল রেখার মতো অনতিস্পষ্ট বাঁধাল দেখা যাইতেছে। ভুল-পথে

আসিয়াছে—এইখানে তো পথ আটকাইয়া গেল। খালের মধ্যে পড়িবার কথা—সেই খাল সোজা একেবারে মালঞ্চে পড়িয়াছে।

বধূ বিরক্তকণ্ঠে বলিল, রাখ দিকি একটুখানি তোমাদের বাওয়া। পথটা ওদের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও।

তাড়াতাড়ি ছইয়ের মধ্য হইতে যুবা বাহির হইতেছিল, এক মুহূর্তে ঝকঝকে এক সড়কি তার গায়ে এফোঁড়-ওফোঁড় বিঁধিয়া গেল। সেইখানে সে কাত হইয়া পড়িল। দাঁড়িরা দাঁড় ফেলিয়া ঠক-ঠক করিয়া কাঁপিতেছে। নিশিরাত্রে বিলের বুক প্রতিধ্বনিত করিয়া গ্রাম-বধূ চিৎকার করিয়া উঠিল।

হঠাৎ বাঁধালের শুকনা পথে ঘোড়ার খুরের আওয়াজ! দূর হইতে গম্ভীর কণ্ঠ ভাসিয়া আসিল, মেয়েমানুষ কাঁদছে কেন হে সর্দার?

শ্যামশরণ বুড়া হইয়া ঠাণ্ডা হইয়া যাইতেছেন সেই সময়, এসবে অরুচি ধরিয়া আসিয়াছে। সর্দার ভারি অপ্রতিভ হইয়া গেল। তার ভয়ও হইল। এখন শ্যামশরণ চৌধুরি কি জন্য এই বাঁধাল দিয়া চলিয়াছেন, কে জানে? সর্দার বলিল, কিছু নয় চৌধুরি মশায়, একটু-আধটু সোনা গায়ে আছে—দিতে চাচ্ছে না।

চৌধুরি বলিলেন, থাকগে—থামতে বল।

কিন্তু তার আগেই কান্না থামিয়া গেছে। বধূ বিলের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িল। শ্যামশরণের তখন এমন নামডাক পড়িয়া গেছে যে তাঁর খপ্পরে পড়িবার আগে মানুষ মরিয়া জুড়াইতে চায়।

মশাল জ্বালিয়া অনেক খোজাখুঁজি হইল। পাওয়া গেল পরদিন দিনের আলোয়—মরিয়া ফুলিয়া বাঁধালের ধারে পড়িয়া আছে। সেই বটগাছ আজও আছে, বউভাসির ঘাট বলে বটতলাকে।

শ্যামশরণের নামে সত্য-মিথ্যা এমন অনেক গল্প মানুষে রটাইয়া বেড়ায়। বিশেষ করিয়া শত্রুপক্ষ—বরণডাঙার ঘোষ-গিন্নীর দল। সেকালে মালঞ্চে আর ডাকাতের বিলে যত ডাকাতি হইত, তার সকল জিনিসপত্র বেচিয়া সকল গহনা গলাইয়া জমিয়াছিল নাকি শ্যামশরণের ঐ সোনা। একলা শ্যামশরণ নিজের দু-খানা হাতেই

নাকি একশ-একটা মানুষ মারিয়া ডাকাতের বিলের হোগলা-কলমির দামের নিচে চালাইয়া দিয়াছিলেন।

সে যাই হোক, নগণ্য এক পথের ভিখারি কি করিয়াছিল, কি করিয়া বেড়াইত, কে-ই বা তার খবর রাখে—কিন্তু দালান-ইমারত সোনা-জহরতের মালিক শ্যামশরণকে একটি দিনও কেউ রাত্রে বাহির হইতে দেখে নাই। সন্ধ্যা হইতে না হইতে শোবার ঘরের চারিপাশে খুব উজ্জ্বল অনেক আলো জ্বালিয়া শ্যামশরণ দরজা আঁটিয়া দিতেন। সেই দিনের মতো আলোয় বাহিরে ঢালিরা ঢাল-সড়কি লইয়া সমস্ত রাত্রি টহল দিয়া ফিরিত। কিন্তু চৌধুরির শত্রুরা রটনা করে, একশ-এক সেই বিদেহী আত্মা তাদের হকের ধন পাছে কাড়িয়া লইয়া যায়, তাই তাঁর এ সতর্ক ব্যবস্থা।

রাতের পর রাত কাটিয়া যাইত, বুড়া কখনও ঘুমাইতেন না। বাহিরের ঢালিদের এক মুহূর্ত যদি ঝিমুনি আসিত, পদক্ষেপ ক্ষীণ হইয়া উঠিত, বজ্রকণ্ঠে বুড়া অমনি চিৎকার করিয়া উঠিতেন, কোথা?

রাত্রির নিস্তব্ধতা সে বজ্রস্বরে কাঁপিয়া উঠিত। ঢালির খড়ম আবার চলিতে শুরু করিত খট-খট-খট—

শ্যামশরণের মনের কথা হইত একটু-আধটু কেবল দয়াময় ঘোষালের সঙ্গে। দয়াময় ছিলেন দেওয়ান। একদিন কথায় কথায় বয়সের কথা উঠিল। দয়াময় বলিলেন, কি আর এমন বয়স আপনার চৌধুরি মশায়? ওর দুনো বয়সে মানষে চতুর্থ পক্ষে নায়ছে। আপনি একটি বিয়ে করুন।

রুক্ষদৃষ্টি মেলিয়া শ্যামশরণ বলিলেন, কেন?

সে দৃষ্টির সামনে একটু ঘাবড়াইয়া দয়াময় বলিলেন, মানে আপনার অতুল ঐশ্বর্য দেখবে কে? দু-একটা ছেলেপুলে না থেকে বাড়ি যেন আঁধার হয়ে আছে।

কেমন এক ধরনের অদ্ভুত হাসিতে শ্যামশরণের মুখ ভরিয়া গেল। অনেকক্ষণ ধরিয়া হাসিতেই লাগিলেন। তারপর বলিলেন, দু-একটা নয় দয়াময়, আমার সাত-সাতটা ছেলে। আবার বলিলেন, তারা

আমার ঘর আলো করে রয়েছে—দেখবে ? একদিন দেখিয়ে দেব তোমায়।

সে দেখানো কোনদিন হইয়াছিল কিনা, কে জানে! তখন হাসিয়া দয়াময়ের কথাটা উড়াইয়া দিলেন বটে, কিন্তু শ্যামশরণের মুখের হাসি বেশিক্ষণ থাকিল না। মনে নিরন্তর ঐ ভাবনাটাই কাঁটার মতো ফুটিতে লাগিল, তাঁর অবর্তমানে এ বিপুল স্বর্ণ রক্ষা করিবে কে ? রাতের ঘুম তো ছিলই না, দিনের কাজকর্মও অতঃপর সমস্ত ঘুচিয়া গেল। বিবাহে রুচি হইল না, সমস্ত জীবন পথে পথে ঘুরিয়া বিয়ে থাওয়া সংসার-ধর্মে এমনি আতঙ্ক জন্মিয়াছিল যে সেটাও বোধকরি ডাকাতের বিলের স্বর্ণলিপ্সা ঐ একশ-এক আত্মার চেয়ে এক বিন্দু কম নয়। দিন-রাত ভাবিয়া ভাবিয়া শ্যামশরণ এক অতি ভীষণ বিচিত্র সঙ্কল্প করিলেন।

(২)

ডাকাতের বিলে আজকাল অজস্র পদ্ম ফুটিয়া থাকে, সেকালের মতো গভীর জল নাই, জলে ঢেউ নাই, জলের চেয়ে ইদানীং পাঁকই বেশি। বড় নৌকার পথ নাই—ডিঙি ও ডোঙা চলে মাঝে মাঝে। আর বারো মাসই নানারকম ফুলে বিল আলো হইয়া থাকে—কলমিফুল, সাপলাফুল, কেউটেফণার ফুল, লাল ও সাদা রঙের বড় বড় পদ্ম—যেন তার সীমা নাই, দৃষ্টি যতদূর যায় কেবল ঐ ফুলের সমুদ্র।

ঐ ডাকাতের বিলের ধারে—আজকাল যেখানটা নরহরি চৌধুরির গোলাবাড়ি, ওরই কাছাকাছি কোনখানে শ্যামশরণ মাটির নিচে সারি সারি সাতটা পাথরের কুঠারি তৈয়ারি করিলেন, দরজাগুলা তার লোহার। শ্যামশরণের বাড়ির কোন্ একটা গোপন জায়গা হইতে সুড়ঙ্গ আসিয়া সেই সাত দরজার মুখে লাগিয়াছে। সে-সুড়ঙ্গের মুখও পাথরে বাঁধানো, বাহির হইতে দেখিয়া কিছুই টের পাইবার জো নাই।

এত সব কাণ্ড হইয়া গেল, কতদিন ধরিয়া কত লোকজন খাটিল, অথচ বাহিরে কাক পক্ষীতেও টের পাইল না। এই কাজে দয়াময় ঘোষাল নাকি দশ ক্রোশ বিশ ক্রোশ দূর হইতে রাতারাতি রাজমিস্ত্রি আনিয়াছিলেন। নৌকা বাহিয়াছিল শ্যামশরণের যৌবন-দিনের সাকরেদরা—গলা কাটিয়া তাদের মারিয়া ফেলা যায়, কিন্তু কথা বাহির হয় না। মিস্ত্রিদের অন্দর মহলে ঢুকাইয়া দিয়া দয়াময় খালাস। তারপর শ্যামশরণ নিজের হাতে একটি একটি করিয়া সমস্ত দরজা-জানলা আঁটিয়া দিলেন, বাহিরে ক্ষীণতম শব্দটিও আসে না। মাসখানেক পরে আবার এক রাত্রিবেলা সেই দরজা খুলিয়া গেল। উঠান জুড়িয়া পড়িয়া রহিয়াছে মিস্ত্রিগুলার লাস; কাজের শেষে তারা বখশিশ পাইয়াছে। দরজা খুলিয়া শ্যামশরণ ইঙ্গিত করিলেন। মালঞ্চে তখন ভরা জোয়ার, বিপুল স্রোত। গরুর গাড়ি বোঝাই লাস ঢালা হইল সেখানে। সেই স্রোতে ভাসিয়া ভাসিয়া হতভাগারা বোধকরি বা নিজ দেশেই ফিরিয়া চলিল। দয়াময় ঘোষাল আগাগোড়া অন্দরবাড়ি খুঁজিয়া দেখিলেন, আরও অনেকে দেখিল—আশ্চর্য! মিস্ত্রিগুলা এতদিন ধরিয়া যে কি করিল, কোনখানে তার খোঁজ পাইবার জো নাই। অবিকল সেই আগেকার উঠান, একটি পাথরের কণিকা কোথাও খসে নাই, দেয়ালের জমাটে ক্ষীণতম রেখাটি পড়ে নাই। সুড়ঙ্গের গোপন মুখ জগতের মধ্যে জানিয়া রাখিলেন একমাত্র শ্যামশরণ।

গ্রীষ্মকাল। দুপুরবেলা আকাশ হইতে যেন আগুন-বৃষ্টি হইতেছে। এমন সময় একদিন এক ব্রাহ্মণ হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া শ্যামশরণের অতিথিশালায় উঠিলেন, সঙ্গে বারো বছরের ফুটফুটে নধর গোছের একটি ছেলে। কথায় কথায় প্রকাশ হইল, ছেলেটি মামার বাড়ি থাকিয়া পড়াশুনা করে, মামা অধ্যাপক মানুষ—সম্প্রতি বাপকে পাইয়া জেদ করিয়া দিন কয়েকের জন্য তাঁর সঙ্গে বাড়ি চলিয়াছে। এত পথ রৌদ্রে হাঁটিয়া ঘামিয়া কচি মুখখানা জবাফুলের মতো টকটক করিতেছে। শ্যামশরণ তাড়াতাড়ি হাঁক-ডাক করিয়া

বাড়ির মধ্য হইতে তরমুজের শরবৎ আনাইয়া বাপ-ছেলেকে খাওয়াইলেন। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতে বেলা প্রায় পড়িয়া আসিল। অচেনা পথঘাট, সামনে অন্ধকার রাত্রি—সেদিন রাত্রিটাও ঐখানে কাটাইয়া দেওয়া হইবে, এই রকম সাব্যস্ত করিয়া শ্রান্ত ব্রাহ্মণ ছেলে লইয়া ঘুমাইয়া পড়িলেন। ঘুম যখন ভাঙিল, তখন ঘোর হইয়া গিয়াছে। ছেলে পাশে নাই। কোথায় গেল? কোথায় গেল? কেউ সে খবর দিতে পারে না। আগে ভাবিয়াছিলেন, কোথায় হয়তো কোন এক ছেলের দলের সঙ্গে ভাব করিয়া খেলাধূলায় মাতিয়াছে। কিন্তু রাত্রি গভীর হইল, ছেলের সন্ধান নাই। বাপ শেষে পাগলের মতো হইয়া উঠিলেন। আর আর যারা খুঁজিতে গিয়াছিল, অবসন্ন হইয়া তারা ফিরিয়া আসিল: সমস্ত রাত্রি কেবল একটি লণ্ঠন হাতে বিপন্ন ব্রাহ্মণ অশ্রান্ত কণ্ঠে ডাকিয়া ডাকিয়া ফিরিলেন।

তখন ছেলে রুদ্ধদ্বার পাতালপুরীতে—বাপের ডাক সেখানে পৌঁছে না। শ্যামশরণ মাটির নিচে পাষাণ-কক্ষে কোমল করিয়া শয্যা বিছাইয়া রাখিয়াছিলেন, টানিতে টানিতে সোনা-বোঝাই একটা ঘড়া আনিয়া এখন শয্যার শিয়রে রাখিলেন। তারপর ঘুমন্ত ব্রাহ্মণ-শিশুকে সুড়ঙ্গ-পথে লইয়া গিয়া সেখানে শোয়াইয়া যেই পিছু ফিরিয়াছেন, অমনি আলো-বায়ুহীন কক্ষের মধ্যে বোধকরি বা নিশ্বাস ফেলিবার কষ্টেই বালক জাগিয়া চিৎকার করিয়া উঠিল। দ্রুত ছুটিয়া বাহির হইয়া শ্যামশরণ ঘড়াং করিয়া লোহার দরজা বন্ধ করিলেন। তারপর কান পাতিলেন, শব্দ কিছুই বাহিরে আসিবার ফাঁক নাই। কিন্তু বুকের মধ্যে সেই সদ্য-জাগ্রত অসহায় বালকের আর্ত কণ্ঠ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। একটু স্থির থাকিয়া তারপর সুড়ঙ্গ ধ্বনিত করিয়া উন্মাদের মতো শ্যামশরণ হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, জেগেছিস? বেশ, বেশ বাবা, জাগলি তো খুব সজাগ হয়ে ঘড়া আগলে বসে থাক। যে নজর দেবে একটা মোচড় দিয়ে তার ঘাড় ফিরিয়ে দিবি অন্য দিকে—

দীর্ঘক্ষণ ধরিয়া একলা এমনি হাসিয়া আবার শ্যামশরণ সহজ সাধারণ মানুষ হইয়া উপরে উঠিয়া আসিলেন।

ছেলে-ধরার ভয়ে ও-অঞ্চলের মানুষ তখন আর ছেলেপেলে ঘরের বাহির হইতে দেয় না, দিন-রাত চোখে চোখে সামাল করিয়া রাখে। তবু এমনিভাবে আরও ছয়-ছয়টা ব্রাহ্মণ-বালক চুরি হইয়া গেল। পৃথিবীর নিরন্ধ্র তলদেশে না খাইয়া তৃষ্ণায় শুকাইয়া দিনের পর দিন কঙ্কালসার হইয়া অবশেষে সেই কঙ্কাল গলিয়া পচিয়া গুঁড়া হইয়া কি প্রক্রিয়ায় যে অবশেষে পাতাল-রাজ্যের ধনরক্ষক হইয়া দাঁড়াইল, কে জানে। কিন্তু সাতটা যক্ষ দিনরাত সজাগ থাকিয়া ডাকাতের বিলের কাছাকাছি কোন এক অনির্দেশ্য জায়গায় শ্যামশরণের বিপুল ধন বহুকাল পাহারা দিয়া বেড়াইয়াছে, এ কাহিনী অবিশ্বাস করিবে তেমন মানুষ তখনকার দিনে এ অঞ্চলে একটা জন্মে নাই।

আরও মাস কয়েক ঘুরিয়া আবার কোজাগরী পূর্ণিমা আসিল—পরিষ্কার মেঘশূন্য রাত্রি। এ রাত্রে বিজন কক্ষে শুইয়া শুইয়া শ্যামশরণের ঘুম আর আসে না। কোথায় অনেক দূরে মাটির সুগভীর নিম্নে অবরুদ্ধ কক্ষতলে সাত ঘড়ার সকল সোনা ঝনঝন করিয়া বাজিয়া যাইতেছে, সাতটি সোনার শিশু সারা বৎসরের অন্ধকারের মধ্যে কত কান্না কাঁদিতেছে। অনেকক্ষণ ছটফট করিয়া অনেক ইতস্ততঃ করিয়া শ্যামশরণ অবশেষে নিষুপ্ত মধ্যরাত্রে দ্বার খুলিলেন। ইদানীং বাহিরে ঢালির পাহারা বন্ধ, পাকা পাহারার বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে—আর প্রয়োজন কি? জ্যোৎস্নালোকিত জনহীন উঠানের প্রান্তে গুপ্ত সুড়ঙ্গের দ্বারে দাঁড়াইয়া কম্পিত শ্যামশরণ একটা মশাল জ্বালিয়া লইলেন, তারপর পাথর সরাইয়া ধীরে ধীরে সোপান বহিয়া পাতালে নামিয়া গেলেন। এমনি কতদূর চলিয়াছেন—দপ করিয়া হঠাৎ মশাল নিভিল, দম আটকাইয়া আসিল, অন্ধকারের মধ্যে কে যেন লোহার মত ভারী হাতে বুক চাপিয়া ধরিয়া গুঁড়াইয়া দিতেছে। শ্যামশরণের চেতনা-লোপ হইয়া আসিল, তাহারই মধ্যে একবার উপরের দিকে তাকাইলেন। জ্যোৎস্নার যে

ক্ষীণ রশ্মি সুড়ঙ্গের প্রবেশপথে ঢুকিয়াছিল, কোথাও তার একবিন্দু চিহ্ন নাই। সর্বনাশ! পাথর পড়িয়া গিয়া মুখ ইতিমধ্যে কখন আটকিয়া গিয়াছে, বাহিরের বাতাসের ঢুকিবার ফাঁক নাই। অতদূর উঠিয়া আসিয়া কাঁধে তুলিয়া মুখের সে পাথর সরাইয়া দিবেন, সে শক্তি শ্যামশরণের নাই। মুখ থুবড়াইয়া সেইখানে তিনি পড়িয়া গেলেন। সেই রাত্রে সোনার প্রহরী সাত যক্ষের সঙ্গে মিতালিটা তাঁর কি রকমের হইল, বাহিরের মানুষ কোনদিন তার তিলার্ধ জানিতে পাইল না।

(৩)

কিন্তু শ্যামশরণের এই রকম মৃত্যুর কাহিনী চৌধুরি-বাড়ির কাহাকে কোনদিন শুনাইও না, শুনিলে তোমাকে আস্ত রাখবেন না। পুরানো জমাখরচেও প্রমাণ রহিয়াছে, শ্যামশরণের চিতায় দশ মণ চন্দনকাঠ এবং আড়াই মণ ঘি পুড়িয়াছিল। শত্রুপক্ষেরা কিন্তু নাক সিটকাইয়া বলে, ঐ ঘি আর চন্দনকাঠ পর্যন্ত—আর কিছু নয়। মরার খবর পাইয়া ভাইরা আসিয়া মালঞ্চের কূলে তাড়াতাড়ি লোক-দেখানো প্রকাণ্ড এক চিতা সাজাইল। কিন্তু শব ছিল না তাহাতে। কলসি কলসি জলে চিতা ধুইয়া দিয়া তারা ভাবিল, চৌধুরি-বংশে শ্যামশরণ যে কালি লেপিয়াছেন, তাহাও নিঃশেষে ধুইয়া গেল বুঝি! তৃপ্তমনে তারা নিজেদের গরিব ঘরে ফিরিয়া গেল—যে পাষাণ-অট্টালিকা হইতে শ্যামশরণ একদা অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছিলেন, সেদিকে ফিরিয়াও চাহিল না। দেওয়ান দয়াময় কত খোশামোদ করিলেন, কিছুতে না।

অগত্যা দয়াময় এবং তারপর তাঁর ছেলে-নাতিরা ঐ শ্যামগঞ্জের বাড়িতে বসবাস করিতে লাগিলেন। বাড়িটায় জঙ্গল হইয়া সাপ-শূকরের আস্তানা হয় নাই, সে কেবল তাঁরা ছিলেন বলিয়া। এই সময়ে এক কাণ্ড হইল। চৌধুরি-বংশের এক কুলাঙ্গার ছোট লোকের সমাজে ছড়া কাটিয়া আর গান গাহিয়া সমস্ত কিশোর বয়সটা

কাটাইয়া দিয়া শেষে বুঝিলেন, ছড়ায় গানে পেট ভরিবার উপায় হয় না। নরহরি তাঁর নাম—এক সকালে সদলবলে তিনি হঠাৎ শ্যামগঞ্জের বাড়ি আসিয়া উদয় হইলেন। যারা নরহরির সঙ্গে কালীকীর্তন গাহিত, তারাই সব 'জয় কালী কালবারিণী' হুঙ্কার দিয়া লাঠি-সড়কি লইয়া বাড়ি ঢুকিয়া পড়িল। শুধু মাত্র গায়ের জোরেই একদণ্ডের মধ্যে দয়াময়ের নাতি-নাতবউদের পথে তুলিয়া দিয়া বাড়ি দখল হইয়া গেল।

ঢালিদের লইয়া দিন কয়েক খুব খাওয়া-দাওয়া গান-বাজনা সমারোহ চলিল। বাপ-মা ছিল না—নরহরি ভাই-ভাইপোদের আনিতে গেলেন পৈতৃক বাড়ি হইতে। তারা আসিবে না। নরহরি কত লোভ দেখান, মিথ্যা করিয়া বলেন—সুড়ঙ্গ খুঁড়িয়া শ্যামশরণের সেই সাত ঘড়া মোহর পাইয়া গিয়াছেন, অতুল ঐশ্বর্যবান এখন তিনি। কিছুতেই তারা রাজি নয়—পূর্বপুরুষ নিষেধ করিয়া গিয়াছেন, বারম্বার সেই কথা তোলে। রাগ করিয়া তখন নরহরি বাড়িতে আগুন ধরাইয়া দিলেন। খোড়ো-ঘরগুলি ছাই হইয়া গেল দেখিতে দেখিতে।

বিয়ে করিলেন, এক ছেলে হইল, নাম রাখিলেন শ্যামকান্ত। নামের ঐক্যে যদি শ্যামশরণের বিদেহী আত্মা ইহার মধ্যে ভর করেন, সেকালের সেই শক্তি-সম্ভ্রম ও ঐশ্বর্য আবার যদি ফিরিয়া আসে! সুড়ঙ্গের খোঁজে সত্যই নরহরি তোলপাড় করিয়া বেড়াইতেছেন। উঠানের সমস্ত পাথর খুঁড়িয়া তোলাইলেন, দেয়ালের এখানে ওখানে সন্দেহ করিয়া কতবার ভাঙাভাঙি করিলেন, বছরের পর বছর কত চেষ্টা হইল, সোনার মোহরের একটি কণিকা মিলিল না।

মিলিবে কেমন করিয়া? শ্যামশরণের সে সোনা কি আছে, চাঁদামাছ হইয়া মালঞ্চের স্রোতে কবে ভাসিয়া গিয়াছে। দুষ্টু ছেলে-মেয়েরা যখন ঘুমাইতে চাহে না, মায়েরা এই গল্প করিয়া ঘুম পাড়াইয়া থাকেন। এই মায়েদের মায়েরাও একদা এই গল্প করিয়া গিয়াছেন।

শ্যামশরণের মৃত্যুর অনেক বছর পরের কথা। তখন নাককাটির খাল ছিল না, চিতলমারি ছাড়া মালঞ্চের সঙ্গে আর কোন সংযোগই ছিল না ডাকাতের বিলের। একদিন খর দুপুরে জনমানবহীন বিলের প্রান্তে হঠাৎ পাতাল ভেদ করিয়া সাত যক্ষ মাটির উপরে উঠিয়া বসিল। সাতটি বড় বড় মলিন পিতলের কলসি—কিন্তু জীবন্ত চলনশীল। এত কাল পরে পৃথিবীর আলো-বাতাসের এতখানি আকস্মিক তৃষ্ণার হেতুটা কি বলা শক্ত, কিন্তু যক্ষেরা উঠিয়া বসিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া রহিল না—গড়াইতে গড়াইতে ধীরে ধীরে মালঞ্চের দিকে চলিল। এক বুড়ি ওদিককার গ্রামে দুধ বেচিতে গিয়াছিল। দুধ বেশি বিক্রয় হয় নাই, ক্ষুণ্ণ মনে ফিরিয়া আসিতেছিল—মাঠের মধ্যে অপরূপ ব্যাপার দেখিয়া থমকিয়া দাঁড়াইয়া গেল। আরও আশ্চর্য কাণ্ড, যক্ষ বুড়িকে ডাকিয়া বলিল; সকলের আগে যেটি চলিতেছিল, তার সেই কলসির দেহ হইতে মিষ্টি রিণরিণে ছেলে-মানুষের করুণ আওয়াজ বাহির হইল, তেষ্টা পেয়েছে বুড়ি-মা, দুধ দাও—খাই। বুড়ির বিস্ময়ের ভাব তখন একরকম কাটিয়া গিয়াছে—কি করি না করি, মনের অবস্থাটা এই রকম। কলসির মধ্য হইতে পুনশ্চ কথা আসিল, মুখে ঢেলে দাও না একটু দুধ। সাত-পাঁচ ভাবিয়া বুড়ি একপো দুধ মাপিয়া কলসির মুখের মধ্যে ঢালিয়া দিয়া বলিল, দাম? কলসি বলিল, আমার পিছে যে আসছে দাম দেবে সে-ই। পরের জন আগাইয়া আসিলে বুড়ি বলিল, বাবা আমার একপো দুধের দাম? সে বলিল, আমার পিছে। এমনি করিতে করিতে সবার শেষের কলসি বলিল, আমার মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দাও—একেবারে দু-হাতে যত সোনা ধরে নিয়ে নাও। আনন্দে বুড়ি কি করিবে ভাবিয়া পায় না। কোঁচড় পাতিয়া তাড়াতাড়ি দু-হাত ভরিয়া সোনা একবার তুলিল। আবার ভাবিল, এত সোনা রয়েছে, নিই না আর একবার—কি আর হবে। আর একবার যেই হাত ঢুকাইতে গেছে, কলসি গড়াইয়া অমনি তার ঘাড়ের উপর আসিল। বুড়ি পড়িয়া গেল, কলসির কানায় তার নাক দুই খণ্ড হইয়া গেল।

কোঁচড়ের দিকে তাকাইয়া দেখে, সমস্ত সোনা চাঁদামাছ হইয়া লাফাইতে শুরু করিয়াছে। দেখিতে দেখিতে মাঠের উপর দিয়া অনতি-গভীর খাল নামিয়া গেল। সাতটা যক্ষ উপুড় হইয়া সমস্ত সোনা ঢালিয়া দিল, সোনা চাঁদামাছ হইয়া লাফাইতে লাফাইতে খালে পড়িল, বুড়ির আঁচলেরগুলাও পড়িয়া গেল। সে খাল আজও আছে—নাককাটির খাল উহার নাম। নরহরির রান্নাবাড়ির পাশ দিয়া বাদাম-বনের ছায়ায় ছায়ায় মালঞ্চে গিয়া পড়ে।

(৪)

কালীর কিঙ্কর নরহরি চৌধুরি।

মাসের মধ্যে যে কয়টা দিন নরহরি বাড়ি থাকিতে পারেন, সকালবেলা রঘুনাথের সঙ্গে কুস্তি লড়েন, মাটি মাখিয়া বেলা দেড় প্রহর অবধি বসিয়া থাকেন, দু-জনে। বিকালে ওস্তাদ চিন্তামণি দলসুদ্ধ সকলকে লাঠি-সড়কির তালিম দেয়। সন্ধ্যার পর কালীর গানের আসরও বসে কখন কখন। জনশ্রুতি, অমাবস্যার নিশিরাত্রে শ্মশানঘাটে গিয়া বারকয়েক নরহরি শব-সাধনের চেষ্টা করিয়া আসিয়াছেন, কিন্তু উপযুক্ত গুরুর অভাবে সাধনা বিশেষ অগ্রসর হইতে পারে নাই।

হাতী-ঘোড়া লোক-লস্করে যখন শ্যামশরণের জমজমাট অবস্থা তিনি সেই সময়ে এক মন্দিরের ভিত্তি গড়িয়াছিলেন, আর পাশে এক দীঘি কাটাইতেও শুরু করিয়াছিলেন। কোনটাই শেষ হয় নাই। নরহরি শেষ করিতে লাগিয়া গেলেন। মন্দিরে কালী-প্রতিষ্ঠা হইবে; আর দীঘির নাম আগেই দেওয়া হইয়াছে—কালীদীঘি।

সোনা খুঁজিয়া খুঁজিয়া নাজেহাল, তবু তিনি লোভ ছাড়েন নাই। এখন আর পাষাণ-প্রাসাদের মধ্যে নয়—যে নদী-খালের জলে সোনা মাছ হইয়া চরিতেছে, সেই জলের উপর ঘুরিয়া বেড়ান সোনার খোঁজে। কিছু পাইয়াছেনও নিশ্চয়, নহিলে হঠাৎ অবস্থা এমন ভাল হইয়া উঠিল কিরূপে? সম্প্রতি এক ভাল কারবার ফাঁদিয়াছেন—

ধান-চাল কেনা বেচা। আরও নাকি কোন কোন কারবার আছে। অর কতক লোকে জানে, কতক বা রটাইয়া বেড়ায়। কালীর করুণায় এসব হইতেছে—সঙ্কল্প করিয়াছেন, মন্দির-প্রতিষ্ঠা হইয়া গেলে প্রতি অমাবস্যায় বিপুল সমারোহে সেখানে কালীপূজা হইবে।

ইদানীং কাহন পনের ধান লইয়া নরহরি বড় মুশকিলে পড়িয়াছেন। ধানটা গত বছরের কেনা। গোলা বোঝাই পড়িয়া আছে, পোকায় খাইয়া তুষ করিয়া দিতেছে, কাটাইয়া দিবার নিতান্ত গরজ। কিন্তু ব্যাপারিরা দেখিয়া মুখ সিটকায়। বলে, ও-ধানের কাহন পাঁচ টাকার বেশি দেওয়া যাবে না, ভানাতে গেলে একটা চালও বেরুবে না—ক্ষুদ হয়ে আসবে।

কারবারে ভাগীদার সম্ভবত রঘুনাথও। মুনাফার বখরা কি আন্দাজে পাইয়া থাকে, বাহিরের কাহারও জানিবার উপায় নাই। কিন্তু শীত নাই, বর্ষা নাই, সময়-অসময় নাই, চৌধুরির মুখের কথাও লাগিবে না, একটুখানি চোখের ইশারা পাইলেই হইল—আর তাহাকে রুখিবে কে?

নরহরির মুখে ব্যাপারির প্রস্তাব শুনিয়া রঘুনাথ সজোরে ঘাড় নাড়ে।

না চৌধুরি মশায়, যোল টাকা পড়তা পড়েছে—কি হবে পাঁচ টাকায় বেচে? ও পোকার পেটেই যাক, খেয়ে বাঁচুক পোকামাকড়। তাতে পুণ্যি আছে।

নরহরি বলেন, না হে—দিয়ে দাও ঐ পাঁচ টাকায়। ডাক ব্যাপারিদের। কালীর করুণা থাকে তো পাঁচই ঘুরে ফিরে পঁচিশ হয়ে সিন্দুকে উঠবে।

দুপুরবেলা ব্যাপারিরা ধান ঝাড়িয়া বস্তাবন্দি করিয়া নৌকায় তুলিল। সন্ধ্যার পর দেখা গেল, সেই বস্তাগুলিই আবার ডিঙা বোঝাই হইয়া নাককাটির খালের মোহনার দিকে ফিরিয়া আসিতেছে। কিনারায় কসাড় গেঁয়োবন। তার মধ্যে অনেকক্ষণ হইতে একটানা একটা শব্দ হইতেছে—টু টু-টু। শুনিলে মনে হয়, অসহায় কোন

পাখীর ছানা আঁধারে মাকে খুঁজিয়া পাইতেছে না। কাতর হইয়া ডাকাডাকি করিতেছে।

ডিঙা প্রাণপণে লগি ঠেলিয়া সেই গেঁয়োবনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল পাখীর ছানার ডাকও সঙ্গে সঙ্গে নিঃশব্দ। নরহরি অপেক্ষা করিতেছিলেন, অন্ধকারে তাঁর চোখ দুইটি জ্বলিতেছিল। ডাকিলেন, রঘুনাথ!

রঘুনাথ ডিঙা হইতে লাফাইয়া পড়িল। বলিল, কিছু বেগ পেতে হয় নি চৌধুরি মশায়। ওস্তাদ সড়কি উঁচিয়ে দাঁড়ালেন, আমি একটা বাড়ি কষে দিলাম ব্যাপারির মাথায়। জোরে নয়, আস্তে—মোলায়েম করে। হাউ-হাউ করে সব বেটা কেঁদে উঠল। হুকুম করতেই তারা চরের উপর এক-হাঁটু জলে নেমে দাঁড়িয়ে শীতে আর ভয়ে হি-হি করে কাঁপতে লাগল। ধীরে-সুস্থে ডিঙিতে মাল তুলে নিয়ে এই আসছি।

ওস্তাদ চিন্তামণি এখন একেবারে ভালমানুষ হইয়া ডিঙার গলুয়ে বৈঠা ধরিয়া বসিয়াছিল। সে হাসিয়া বলে, নৌকোয় উঠে তারা ঝপাঝপ উল্টোমুখো উজান ঠেলে ছুটেছে। জন্মে আর এ পাইতকে আসবে না, চৌধুরি মশায়।

বেশ ভালো। নরহরি রঘুনাথের পিঠে জোরে থাবা দিলেন। বলিলেন, ইদিকে আমিও বসে ছিলাম না—মহাদেব সা'র সঙ্গে কথাবার্তা ঠিক করে ফেলেছি। প্রথমটা কিছুতেই রাজী নয়। বলে, জল-পুলিশের বড় হাঙ্গামা। শেষকালে অবশ্য রাজী হল, কিন্তু কাহন দিতে চায় মোটে তিন টাকা হিসাবে।

রঘুনাথ আশ্চর্য হইয়া বলে, তিন টাকায় এক কাহন ধান?

নরহরি বলেন, বাস্তু ঘুঘু যে বেটা! দু-কথায় আঁচ পেয়ে গেছে, জুত পেয়ে দাও মারছে।

তারপর গম্ভীর হইয়া বলেন, তাই সই। ক্ষতি কি আমাদের? কালীর করুণায় এইরকম দু-তিন বার হাত-ফিরতি হলেই পুষিয়ে যাবে। খাটনিটা বেশি হচ্ছে, কিন্তু দিনকাল খারাপ পড়ে গেছে—কি করা যাবে বল?

জোয়ার আসিল একটু পরেই। গেঁয়োগাছের হাত দেড়েক অবধি ইহারই মধ্যে জলে ডুবিয়া গিয়াছে, ডালের গায়ে নদীজল ছলছল করিতেছে। মহাদেব সা'র মহাজনি ভাউলে দেখা দিল। প্রকাণ্ড নৌকা—মাঝি-মাল্লা দিয়া পনের-ষোল জন হইবে, তার কম নয়। ঘস্‌স করিয়া নৌকা চরে লাগিল, সঙ্গে সঙ্গে মহাদেব লাফাইয়া পড়িল দূর-বিস্তৃত নোনা-কাদার উপর। খালের মধ্যে অলক্ষ্য কোন জেলেদের উদ্দেশে সে হাঁক দিয়া বলে, মাছ কিছু পড়ল নাকি বেড়জালে? চাট্টি মাছ দেবে, ও ভাই? ডাল-ভাত গিলে তো পারা যাচ্ছে না।

আসিতেছে, মাছ আসিতেছে বইকি—দেখা যাইতেছে ঐ তো। ছায়ামূর্তির মতো নরহরি গেঁয়োবনের বাহিরে আসিলেন, আসিয়া মহাদেবের নৌকায় উঠিলেন। ফিসফিস কথাবার্তা—অন্ধকারের মধ্যে টাকা বাজিবার মৃদু আওয়াজ। তারপর নৌকার কয়েকজনকে সঙ্গে লইয়া নরহরি নামিয়া গেলেন। মাছ আসিয়া পড়িবে এইবার। মালঞ্চের নির্জন চরে নক্ষত্রের মৃদু আলোয় অতি নিঃশব্দে গেঁয়ো জঙ্গল হইতে বস্তার পর বস্তা আসিয়া উঠিল মহাজনি নৌকায়। মহাদেব খুশী মনে নৌকা ছাড়িতে হুকুম দিল। ছপছপ চারিখানা দাঁড় মেলিয়া জোয়ারের সঙ্গে মন্থরগতিতে নৌকা চলিল।

নরহরি ও রঘুনাথ বাঁধের উপর। একদৃষ্টে নরহরি তাকাইয়া আছেন। বাঁকের মুখে নৌকা অদৃশ্য হইল। দাঁড়ের আওয়াজ মৃদুতর হইতেছে। ক্রমশ তাহাও মিলাইয়া গেল।

রঘুনাথ গা ঝাড়া দিয়া উঠিল। এই রাতেই?

গম্ভীর কণ্ঠে নরহরি বলিলেন, হুঁ—

দু-জনে ডিঙায় উঠিলেন। মাঝির জায়গায় বসিয়া চিন্তামণি।

রঘুনাথ বলিল, ওদের পাছ লাগতে হবে, ওস্তাদ—

তারপর নিচুগলায় চিন্তামণিকে বোঝাইতে লাগিল, কি অন্যায় দেখ—তিন টাকা করে কাহন কিনে নিয়ে গেল। কালকে

শোলাদানার হাট—হাটে যদি ওর থেকে দু-পাঁচটা বস্তাও বেচে ফেলে, পোষানো যাবে না।

চিন্তামণি ভাল মন্দ কিছু বলিল না, লগির ঠেলা দিয়া ডিঙা জঙ্গলের বাহিরে আনিল। বারকয়েক বৈঠা বাহিয়া সহসা থামিয়া গেল। নরহরির দিকে মুখ তুলিয়া বলিল, এটা ঠিক হচ্ছে না কিন্তু। জল-পুলিশের কড়া নজর—কোথায় কোন বাঁকে ঘাপটি মেরে আছে, পাছ লাগলে সন্দ করবে।

রঘুনাথ বলিল, আগে মেরে ওঠ তা হলে। ওরা শোলাদানার হাটে চলেছে। ভীমখালির ঘাটে নৌকো বেঁধে খাওয়া-দাওয়া করিগে আমরা। সুমুন্দিরা পৌঁছে গেলে তখন বোঝাপড়া হবে।

নরহরি গুম হইয়া ছিলেন, নিশ্বাস ফেলিয়া বলিয়া উঠিলেন, না, কাজ-কারবার চলবে না এমন করে। ব্যাপারিগুলো কি রকম ছ্যাঁচড়া। ষোল টাকার মাল তিন টাকায় নিয়ে যায়—এটা তো বুঝে দেখবে না পুলিশ-বেটারা।

ছয় বৈঠা একসঙ্গে পড়িতেছে, ডিঙা তীরবেগে চলিয়াছে। রঘুনাথ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, হাত-ফিরতি এমন কতবার চলবে চৌধুরি মশায়?

বিরস মুখে নরহরি বলিলেন, চলা না চলা আমাদের হাত নয়, ব্যাপারি মশায়দের দয়া। যতক্ষণ পড়তায় না পোষাবে, এই রকম চলবে। ব্যবসা করতে বসে লোকসান দিয়ে মরতে পারি নে তো।

চিন্তামণি বলে, কিন্তু যা বললাম চৌধুরি মশায়, ওঁয়াদের নজর পড়ে যাচ্ছে। আজ সকালে নিজের চোখে দেখেছি, কার্তিকদ'র কাছে তিনখানা বোট বাঁধা। কাদের নারকেল-বাগানে ঢুকে কাঁদি কাঁদি ডাব পাড়ছে আর খুব ডাব খাচ্ছে।

নরহরি বলিলেন, ওসব শুনে আর করব কি—দেখে শুনে সামাল হয়ে কাজকর্ম করতে হবে। সাধ করে কি এত ঝঞ্ঝাট পোহাচ্ছি? এই শ্যামগঞ্জে মাল তুলে দিলাম, বরাপোতায় খালাস হল। তেঘরার

জঙ্গলে মাল বোঝাই হল, খালাস হবে গিয়ে ভীমখালিতে। আবার কোথায় না জানি কাল বোঝাই দিতে হবে! ব্যাপারিরা একটু বিবেচনা করলে এত সব কে করতে যেত বল, ওস্তাদ?

ভীমখালির ঘাটে দোকান আছে একটা। ভাল দোকান। চাল-ডাল নুন-লঙ্কা সমস্ত মিলিল, মিলিল না কেবল তেল-ঘি কোনটাই। ঘি কোন দিনই থাকে না, ঘি খাইবার লোক এ অঞ্চলে নাই। তেলটা ফুরাইয়া গিয়াছে আজ দু-তিন দিন মাত্র, গঞ্জ থেকে আনাইয়া লইতে হইবে। দোকানদার অভয় দিয়া বলিল, দিন আষ্টেকের মধ্যেই এসে পড়বে মশায়।

রঘুনাথ খুব উৎসাহিত হইয়া উঠিল। বলে, হিসেব করে নাও দিকি ওস্তাদ, ফি জনের আধসের হিসাবে। চৌধুরি মশায় খাবেন না, তাঁকে বাদ দাও। উনুন খুঁড়ে খিচুড়ি চাপিয়ে দিতে হবে এক্ষুণি। তোফা হবে।

তোফা খিচুড়ির আয়োজন হইতে লাগিল। দোকানদার বাসন ধার দিয়াছে, বটতলায় রান্না চাপানো হইয়াছে। রঘুনাথের হাতে খুন্তি—প্রধান পাচক সে-ই। আর জন আষ্টেক উনুন ঘিরিয়া বসিয়াছে, সবাই রান্নার উপদেশ দিতেছে। কেউ বলে, জল দাও; কেউ বা বলে, নুন কম হয়ে যাবে কিন্তু। সবাই তো সড়কি চালায় আর নৌকা বায়—তার মধ্যে এ বিদ্যায় কবে বিশারদ হইয়া বসিল, সেইটা সমস্যার বিষয়।

নরহরি ইহাদের মধ্যে নাই, একাকী ডিঙার উপর বসিয়া। সেখান হইতে চাপা-গলায় একবার বলিলেন, খিচুড়ি রাঁধ আর যা-ই কর বাপু, ওদিকে যেন নজর থাকে। খালে ঢুকে চুপি-চুপি সরে না পড়ে। আমি দেখছি অবশ্য, তা হলেও—

তারা অভয় দিয়া বলে,—হাঁ,—হাঁ, নজর থাকবে বইকি! দশজনের দশ জোড়া চোখ। যাবে কোন দিকে মহাদেব-শালা?

কিছুক্ষণ হইতে মেঘ জমিতেছিল। চারিদিকে গাঢ় আঁধার। রঘুনাথ খুন্তিতে খিচুড়ি তুলিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিল। মহা ফুর্তিতে

বলিয়া উঠিল, পাতা পেতে ফেল, আর দেরি নেই। সারবন্দি বসে পড় সবাই।

সবে পাতার উপর খিচুড়ি পড়িয়াছে। এমন সময়—বিধাতা বিমুখ—ঝুপ ঝুপ করিয়া বৃষ্টি আসিল। ডিঙাতেও ছই নাই। পাতার উপর হাত ঢাকা দিয়া সকলে এদিক-ওদিক তাকাইতেছে। দোকানের মধ্যে অতি সঙ্কীর্ণ জায়গা, এত লোকের সেখানে সুবিধা হইবে না।

রঘুনাথ বলিল, ভাবিস কি, টপাটপ খেয়ে নে। বৃষ্টি পড়ছে—সে তো ভালই—ঐ জল মিশে যাচ্ছে, আলাদা করে আর জল খেতে হবে না।

সে-যা হয় একরকম হইত, বিপদের উপর বিপদ—নরহরি সেই মুহূর্তে হাঁক দিয়া উঠিলেন, গোন লেগেছে রে। শিগগির আয় সব, ডিঙি ছাড়তে হবে। এক্ষুণি—এক্ষুণি—

বৃষ্টির ছাট উপেক্ষা করা চলে, কিন্তু নরহরির হাঁক না শুনিয়া পারিবার জো নাই। যে যতটা পারিল, খিচুড়িতে মুখ ভরতি করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। দুই চক্ষের দৃষ্টি পুঞ্জিত করিয়া রঘুনাথ দেখিল, সত্যই অনেকদূরে একেবারে ওপার ঘেঁসিয়া গতিশীল একটি কালো রেখা—

ওপারে গ্রাম। গাছপালা জলে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। তারই তলে যখন আসিয়া পড়ে নৌকা একেবারে অদৃশ্য হইয়া যায়, ফাঁকায় আসিলে মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্নায় আবছা একটি রেখার মতো আবার নজরে আসে। স্পষ্ট কিছু বুঝিবার জো নাই। ছপ-ছপ করিয়া ছ-খানা বৈঠা পড়িতেছে; ডিঙা দুলিতে দুলিতে ছুটিল। নরহরির চোখে পলক নাই। বলিতেছেন, জোরে—আরও জোরে, শব্দ-সাড়া না হয়—হাত চেপে বৈঠা চালাও। ঐ যে সামনে—চলো—

সামনে এমন ঝুঁকিয়াছেন যেন জল না হইলে ডিঙার অনেক আগে ছুটিয়া চলিয়া যাইতেন তিনি। নৌকার পিছু ধরিয়া ডিঙা চলিল। দু-বাঁক তিন-বাঁক এমনি চলিল। কোন রকমে সুবিধা হয়

না—লোকের সাড়া আসিতেছে, হাটুরে লোক নদীতীরের পথে ফিরিতেছে। গ্রামের পর গ্রাম চলিয়াছে। অবশেষে তারা ফাঁকায় আসিয়া পড়িল। দু-পারেই দিগন্তব্যাপ্ত বিল।

চিন্তামণি তীব্রদৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিয়া বলিল, আরে রঘুনাথ, মহাজনি ভাউলে কোথা ? এ যে হল বজরা—

রঘুনাথ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উঁহু···ঐ দেখুন—ঐ যে উঁচুতে হাল ধরে আছে।

চিন্তামণি বলে, হাল না হাতী। ও হল পালের বাঁশ। চোখের মাথা খেয়ে বসেছ এর মধ্যে ?

নরহরিও দেখিয়া বলিলেন, না রঘুনাথ, মহাদেব সা'র নৌকা এ নয়। ভুল করে আমরা এদিকে এসে পড়েছি—এসেছিও অনেকটা দূর। সে নৌকো খাল দিয়ে এতক্ষণ বারোবেঁকিতে পড়েছে। কপাল ভাল মহাদেব বেটার।

নিশ্বাস ফেলিয়া নরহরি চুপ করিলেন।

রঘুনাথ বলে, না-ই বা হল মহাদেবের নৌকো। বজরা তো বজরাই সই! এদ্দূর যখন এসেছি, কারবারে লোকসান হতে দেওয়া হবে না। কি বলিস রে তোরা সব।

হাঁ-হাঁ করিয়া প্রায় সকলেই সায় দিল। এত পথ পিছু পিছু আসিয়া বেকুব হইয়া ফিরিতে কেহ রাজী নয়।

(৫)

বজরার মধ্যে শিবনারায়ণ ঘোষ, তাঁর স্ত্রী আর ছোট দু'টি ছেলেমেয়ে। শিবনারায়ণের বড় দুঃসময়। জমাজমি ছিল, পাকাবাড়ি ছিল, বাড়িতে বারো-মাসে তের পার্বণ হইত। কিন্তু মানুষে নয়—নদীতে সর্বনাশ করিয়াছে; ঘরবাড়ি ভাঙিয়া লইয়াছে। এক নাজিরঘেরি তালুকে সম্বৎসরে যা আদায় হইত, তাহাতে শিবনারায়ণের মতো তিনটা পরিবার পুঁথিপত্র নাড়িয়া চাড়িয়া গায়ে ফুঁ দিয়া স্বচ্ছন্দে কাটাইয়া দিতে পারিত। নাজিরঘেরির গোটা তালুকটাই গ্রাস

করিয়াছে রাক্ষসী নদী। তালুকটা শিবনারায়ণের নিজের আমলে অনেক কৌশলে ও বিস্তর অর্থব্যয় করিয়া বন্দোবস্ত লওয়া – সেই জন্য উহার শোক মনে বেশি বাজিয়াছিল। আরও গিয়াছে—শক্ত সমর্থ ষোল বছরের একটি ছেলে। সে অবশ্য নদীগর্ভে যায় নাই, ওলাওঠায় মারা গিয়াছে। নদীকূলে তার শেষকৃত্য চুকাইয়া শিবনারায়ণ দেশ ছাড়িয়াছেন, চিরদিনের জন্য ছাড়িয়াছেন। সঙ্গে কিছু টাকাকড়ি আছে। মতলব, ফতেহাবাদের মধ্যে প্রেমভাগ উঠতি জায়গা, পুণ্যস্থানও বটে—আচার্য রূপ ও সনাতন গোস্বামী বসবাস করিতেন —অতীত জীবনের সকল স্মৃতি মুছিয়া ফেলিয়া সেইখানে কুঁড়েঘর বাঁধিয়া সামান্য ভাবে থাকিবেন। দুটি দায়িত্ব আছে জীবনে—মেয়ে মালতীকে পাত্রস্থ করা আর শিশু কীর্তিনারায়ণকে মানুষ করিয়া তোলা। আর কয়েকটা বছর তাই পঙ্কিল সংসারের ভিতর না কাটাইয়া উপায় নাই।

ছয় বৈঠার ডিঙা একেবারে পিছনে আসিয়া পড়িয়াছে। চিন্তামণি প্রশ্ন করে, কোথায় যাচ্ছ তোমরা মাঝি ?

বজরা-নৌকার মাঝি—ভারিক্কি চাল—জবাব দিল না। অকস্মাৎ গলা ছাড়িয়া গঙ্গা-বন্দনা গাহিতে শুরু করিল, বন্দ মাতা সুরধনী, পুরাণে মহিমা শুনি, পতিতপাবনী পুরাতনী—

দুই নৌকা আগে পিছে রশিখানেক এমনি চলিল। তারপর ডিঙা হইতে করুণ আবেদন জানায়, ও মাঝি ভাই, আঁশ-বঁটি আছে তোমাদের সঙ্গে ? একটু খানি যদি দাও—

বজরা তবু নিঃসাড়ে চলিতে লাগিল। ডিঙা হইতে আবার বলে, দাও ভাই বঁটিখানা। আমাদের দা ছিল, সে ঘোড়ার ডিম খুঁজে পাচ্ছি না। আশা করে এক পাতাড়িমাছ কেনা গেছে, কোটার অভাবে তা পড়ে রয়েছে।

শিবনারায়ণের স্ত্রী সৌদামিনীর করুণা হইল। বলিলেন, দিয়ে দাও মাঝি। আহা, বলছে এত করে—

এস গো বাঁদিক পানে—

মাঝি বঁটিকা জলের দিকে উঁচু করিয়া ধরিল। দাঁড়-টানা বন্ধ রাখিয়াছে। নরহরির ডিঙা তীরের মতো বজরার গায়ে ভিড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সড়কি হাতে মরদেরা লাফাইয়া পড়িল বজরায়। রঘুনাথ ব্যঙ্গ করিয়া বলিয়া উঠিল, বঁটি দিয়ে লড়বি নাকি তোরা? রেখে দে বঁটি। কি কি আছে, বের কর্ শিগগির।

জানে না কামরার মধ্যে আছেন শিবনারায়ণ, জানে না শিবনারায়ণের পাশে আছে পাকাবাঁশের পাঁচহাতি লাঠিখানা। তিনটা জেলায় যত ঢালি-ওস্তাদ আছে, এককালে ঐ লাঠির নামে তাদের বুকের ভিতর কাঁপিয়া যাইত। ইদানীং অবশ্য উহার ব্যবহার নাই। শিবনারায়ণ সর্বস্ব ফেলিয়া আসিয়াছেন, লাঠিও রাখিয়া আসিতেছিলেন। কিন্তু অজানা পথঘাটে নারী ও শিশু লইয়া একলা যাইতেছেন—সাত-পাঁচ ভাবিয়া শেষ পর্যন্ত লাঠি সঙ্গে আনিয়াছেন।

দীপের আলোয় শিবনারায়ণ নিবিষ্ট মনে কি একখানা পুঁথি পড়িতেছিলেন। পুঁথি পড়িয়া ভক্তিরসে মনটা নিষিক্ত করিয়া রাখিতে চান, কিন্তু ইহারা তাহা হইতে দিবে না। জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, ভারি যে বকবক করছ, কারা তোমরা? কি চাও?

চিন্তামণি সড়কি তাক করিল। সড়কি দেখিয়া শিবনারায়ণের মাথায় চনচন করিয়া রক্ত ঠেলিয়া উঠিল। হুঙ্কার দিয়া তিনি বাহিরে আসিলেন। লাঠির এক ঠোকরে শিশুর হাতের খেলনার মতো সড়কি চিন্তামণির হাত ফসকাইয়া পড়িয়া গেল। নরহরি ঠিক এই সময়ে লাফাইয়া উঠিতেছিলেন বজরায়। লাঠি ঘুরাইয়া শিবনারায়ণ নরহরির কবজির উপর বাড়ি মারিলেন। সে কি বাড়ি—হাতখানাই শুধু নয়—সর্বদেহ থরথর করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়া যেন অসাড় হইয়া গেল। নরহরি জলে পড়িয়া গেলেন। এত সহজে পলাইতে দিবেন না, শিবনারায়ণের সঙ্কল্প—স্ত্রী-ছেলেমেয়ে নিঃসহায় নৌকায় রহিল, সে খেয়াল নাই—তিনিও ঝাঁপ দিয়া পড়িলেন নরহরির সঙ্গে সঙ্গে। চিন্তামণি বজ্রাহতের মতো দাঁড়াইয়া। এমন করিয়া তাকে একেবারে

পুতুল বানাইয়া দিল—এই আশ্চর্য লোকটির কাণ্ডকারখানা সে অবাক হইয়া দেখিতেছে।

আরও হইল। বছর দশেকের ফুটফুটে মেয়ে মালতী—এক-গা গহনা—সন্ত ঘুম ভাঙিয়া দুয়ারের ধারে চোখ মুছিতেছিল। এত কাণ্ড হইল, এতটুকু মেয়ে ভয় পায় নাই! সমস্তই ইহাদের তাজ্জব। গহনায় রঘুনাথের নজর পড়িয়াছে; মালতীকে সে ধরিবে। যেন লুকোচুরি খেলিতেছে, এমনি ভাবে এপাশ-ওপাশ করিতে লাগিল মেয়েটা। এক একবার ধরিয়া ফেলে আর কি! কিন্তু পারিয়া উঠে না, পাঁকালমাছের মতো পিছলাইয়া যায়। তারপর এক সময়ে ঝপ্‌পাস করিয়া জলে ঝাঁপ দিল। চিন্তামণি সহসা যেন সম্বিৎ পাইয়া হাহাকার করিয়া ওঠে। সে-ও ঝাঁপাইয়া পড়িল।

বেকুব রঘুনাথ ও দলের সকলে ডিঙায় ফিরিল। ডিঙা তখন সরিয়া অনেক দূরে গিয়াছে। বজরার মাঝি হতবুদ্ধি হইয়া হাল ছাড়িয়া দিয়াছে; জলস্রোতে সজোরে নৌকা পাক খাইল। ঝড় জল কিছু নাই—এত বড় বজরা চালকের অভাবে জলতলে ডুবিয়া যায় আর কি।

সৌদামিনী বাহিরে আসিয়া তীক্ষ্ণ স্বরে বলিলেন, না পার তো মাঝি সরে দাঁড়াও। আমি দেখছি। উজ্জ্বল গৌর গায়ের বর্ণ, কপালে বড় সিঁদুরের ফোঁটা, উত্তেজনায় মাথার ঘোমটা খসিয়া পড়িয়াছে, মুখের উপর আগুন জ্বলিতেছে যেন। সাত বছরের কীর্তিনারায়ণ সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া মাকে জাপটাইয়া ধরিল। সেই হইয়াছে বিষম বাধা—নহিলে তিনি কখন এমন চুপচাপ থাকিতেন না।

মাঝি যেন চমক ভাঙিয়া ওঠে। বলিল, না মা, সে কি কথা।

দৃঢ় হাতে আবার হাল বাহিতে লাগিল।

সৌদামিনী আদেশ দিলেন, ঐ আমার মেয়ে ভাসছে, কর্তার কাছে পৌঁছতে পারছে না। নৌকো ঘুরিয়ে নাও ঐদিকে।

হুকুম, হুকুম!

বন্দুকের আওয়াজ। খালের মধ্য হইতে নীলরঙের বোট তীরের মতো বাহির হইয়া আসিল। মেঘ কাটিয়া পরিষ্কার জ্যোৎস্না ফুটিয়াছে। দিগ্‌ব্যাপ্ত নদীজল জ্যোৎস্নার আলোয় ঝিকমিক করিতেছে। বন্দুকের শব্দে ওপারের অশ্বত্থতলা হইতে উল্টা দিকে উজান ঠেলিয়া আরও খান দুই পুলিশের বোট আসিতে দেখা গেল। জল-পুলিশ তবে এখানে আসিয়াও আস্তানা পাতিয়াছে।

শিবনারায়ণ ও নরহরি খুব কাছাকাছি আসিয়া পড়িয়াছেন। নরহরি বলিলেন, উঃ—জোর বটে তোমার লাঠির। ডান হাতের দফা শেষ করে দিয়েছ, এবার মাথাটার উপর লোভ বুঝি। এমন লাঠি ধরতে জান তো পুলিশের লেজুড় ধরে বেড়াচ্ছ কি জন্যে? মরদের মতো মাথায় লাঠি মারো, ক্ষোভ থাকবে না। কিন্তু দোহাই ভাই, পুলিশের হাতকড়ি পরিও না।

শিবনারায়ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমি বোষ্টম মানুষ,—শাক-পাতা খাই—মাথার উপর লোভ নেই আমার। হাতখানা চুরি-ডাকাতির কাজে লাগিয়েছ কেন? নইলে ওটার পরেও কোন আক্রোশ হত না।

সাঁতার দিয়া নীল-বোটের কাছে গিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, আমার মেয়ে নৌকো থেকে জলে পড়ে গেছে— তারই হৈ চৈ। আর কিছু নয়।

নরহরিকে দেখাইয়া বলিলেন, অতি মহাশয় ব্যক্তি। আমার বিপদ দেখে ঝাঁপিয়ে পড়েছেন এঁরা সব।

মেয়ে জলে পড়িয়াছে, শিবনারায়ণ ঘাড় ফিরাইয়া তখনই দেখিয়াছেন। তা বলিয়া তাঁর মনে কোন উদ্বেগ নাই। ভাঁটি-অঞ্চলের মানুষ—ইঁহাদের কাছে ডাঙায় হাঁটিয়া বেড়ানো যা জলে সাঁতার কাটা তার চেয়ে কষ্টকর কিছু নয়। জ্যোৎস্নার স্বচ্ছ আলোয় স্পষ্ট দেখা যাইতেছে, মালতী ভাসিতে ভাসিতে অনেকটা দূর গিয়াছে, চিন্তামণি পারিয়া উঠিতেছে না—পিছনে পড়িয়াছে। ডাকিতেছে, ভয় নেই মা—পালিও না, ধরতে দাও। কিন্তু উল্টা-পাল্টা হাওয়ায়

আহ্বান মালতীর কানে পৌঁছিতেছে না বোধ হয়। ভয় পাইবার মানুষই বটে এই মেয়ে! ঘুরিয়া একবার বা কাছাকাছি আসে, চিন্তামণি ধরিবার জন্য দ্রুত বাহুবিক্ষেপে জল কাটাইয়া তীরবেগে নিকটে গিয়া পড়ে। পানকৌড়ির মতো মালতী ভুস-ভুস করিয়া ডুব দেয়। চিন্তামণিও সেইখানটায় আসিয়া ডুব দিল—অর্থাৎ তাহাকে নির্ঘাৎ ধরিয়া ফেলিবে এবার। কিন্তু কোথায় সেই চঞ্চলা মেয়ে—ডুব-সাঁতার দিয়া একেবারে হাত কুড়িক গিয়া সে ভাসিয়া উঠিয়াছে। এ তো আততায়ীর হাত হইতে নিস্তার পাইবার প্রয়াস নয়—ঠকাইয়া বেকুব বানাইয়া দিতেছে দুর্ধর্ষ এক জোলো-ডাকাতকে।

জল-পুলিশের বোট বাঁকের আড়ালে অদৃশ্য হইল। তরঙ্গ-মুখর মালঞ্চের উপর জ্যোৎস্নালোকিত রাত্রিবেলা বজরায় উঠিয়া ভিজা কাপড়ে নরহরি ও শিবনারায়ণ কোলাকুলি করিলেন। ডিঙা বেগতিক বুঝিয়া প্রাণপণে বৈঠা বাহিয়া সরিয়া পড়িতেছিল, নরহরি জকার দিতে বজরার পাশে আসিয়া ভিড়িল। নদীজল হইতে উঠিয়া মালতী বাপের গা ঘেঁসিয়া বসিল।

নরহরি বলিলেন, তোমায় ছাড়ব না ভাই, শ্যামগঞ্জে নিয়ে যাব। যেতেই হবে।

শিবনারায়ণ জবাব না দিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিলেন।

লাঠিতে হেরে গেছি—কিন্তু বুকে নিয়েছ, সেই জোরে তোমাদের টেনে নিয়ে তুলব এই বজরাসুদ্ধ। ঝেড়ে ফেলে দেবে তো বুক জড়িয়ে ধরলে কেন ভাই?

শিবনারায়ণ বলিলেন, নাগালের মধ্যে এসে পড়লে যে!

সবাইকে বুকে নিয়ে যাও এই রকম?

চেষ্টা করি অন্তত। ধরে নিয়ে শ্যামঠাকুরের দরবারে হাজির করে দিতে চাই। ঠাকুর অন্তরের কালিমা মুছে দেন।

নরহরি মুখ ফিরাইলেন। মুখ তাঁর কালো হইয়া গিয়াছে।

বুড়া চিন্তামণি ওদিকে শিবনারায়ণের পায়ের গোড়ায় বসিয়া

বলিতেছে, লাঠি-সড়কি কিচ্ছু জানি নে আমি, একেবারে কিছু না। আজকে টের পেলাম।

শিবনারায়ণ বলিলেন, যা জান, ব্রতভ্রষ্ট হয়ে তা-ও কাজে আসছে না। লাঠির অপমান কর তোমরা—তোমাদের এই বৃত্তি অধর্ম খেলোয়াড়ের পক্ষে।

চিন্তামণি কাতর হইয়া বলে, গুরু বলে প্রণাম করলাম, দু-একখানা চাল আর দুটো-একটা বাড়ি অন্তত আমাকে শিখিয়ে দিতে হবে।

ভুলে গেছি আজকাল ও-সব।

চিন্তামণি বলিতে লাগিল, আপনার দরকার না-ই যদি থাকে, মানুষ কি লাঠিবাজি ছেড়ে দেবে একেবারে? আর দশজনের তো কাজে লাগবে। পাদপদ্মে আশ্রয় নিয়েছি, লাথি মারলেও নড়ব না।

(৬)

শিবনারায়ণকে থাকিয়া যাইতে হইল। ইহারা নাছোড়বান্দা একেবারে। প্রেমভাগে গিয়া কি হইবে, ভক্তি থাকিলে প্রেমভাগের চেয়েও মহত্তর ধাম এইখানে গড়িয়া উঠিবে। ভাই-ভাইপোকে নরহরি অনেক চেষ্টা করিয়াও আনিতে পারেন নাই, পরিজনবিহীন একা পড়িয়াছিলেন। কালী কপালিনী তাই করুণা করিয়া মালঞ্চের প্রবাহে ভাই বহিয়া আনিয়া দিলেন। এ বিরাট প্রাসাদে স্বচ্ছন্দে দু ভায়ের স্থান কুলাইয়া যাইবে। শ্যামশরণের আমলের বিষয়-সম্পত্তি তেমন কিছু নাই—কিন্তু নূতন সম্পত্তি করিতে কতক্ষণ? নরহরির ইতিমধ্যেই কিছু সঞ্চয় হইয়াছে, শিবনারায়ণও রিক্ত হস্তে আসেন নাই।

লাভজনক ধানের কারবারটা কিন্তু ছাড়িয়া দিতে হইয়াছে। শিবনারায়ণ নদী-খালে কিছুতে এই রকম ভাবে ঘুরিতে দিবেন না। তিনি লাঠিয়াল…লাঠিয়ালের রীতি ইহা নয়, ইহা হীন কর্ম। তা ছাড়া দিনকাল বদলাইয়াছে। শ্যামশরণ যে ভাবে চলিতেন, তাহা এযুগে

অচল। প্রবল-প্রতাপ কোম্পানি বাহাদুর উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, যারা নৌকা মারিয়া বেড়ায় তাদের সায়েস্তা করিবেনই। কশবায় আদালত বসিয়াছে, সেখানে গঞ্জও ক্রমশ জাঁকিয়া উঠিতেছে। শুধু আর মেয়েলোক নয়, পুরুষেরা অবধি বিষম সাবধানী হইয়া গিয়াছে। বেপরোয়া সাহস উপিয়া গিয়া ভয় মানুষের বুকের ভিতর বাসা বাঁধিতেছে। দুই দণ্ডের রাস্তা লোকে এখন স্থলপথে পুরা দিন ধরিয়া গরুর গাড়ি মহিষের গাড়িতে অতিক্রম করিবে, তবু দশ-বারোখানা নৌকার বহর না সাজাইয়া নদীমুখো হইতে চায় না।

কারবার ছাড়িয়া অবধি নরহরির ঘরের বাহির হইবার বড় একটা গরজ হয় না। আবার গানের নেশায় পাইয়া বসিতেছে। ঢালিপাড়ায় তাঁরই উৎসাহে নূতন এক ভাব-গানের দল হইল। দলের খুব নাম পড়িয়া গিয়াছে। যেদিন গ্রামের মধ্যে গান হয়, দেখিতে পাওয়া যায়, নরহরি শ্রোতাদের সামনে নিবিষ্ট হইয়া বসিয়া আছেন। স্থির দৃষ্টি—অচঞ্চল। শমের মুখে কেবল এক-একবার দুই জানুতে দুটি হাতের মৃদু আঘাত পড়ে, ফাঁকার মধ্যে আসরের কম্পমান আলোয় আঙুলের আংটির হীরা মুহূর্তের জন্য ঠিকরাইয়া উঠে। গান ভুলিয়া গায়কদেরও এক মুহূর্ত নজর পড়িয়া যায় তাঁর দিকে। গান ছাড়া আর কোন ব্যাপারে ইদানীং নরহরিকে সন্ধ্যার পর বাহিরে দেখা যায় না। শিবনারায়ণের নিষেধ আছে, নরহরি প্রাণপণে তা মানিবার চেষ্টা করেন।

চিতলমারির এপারে একে একে পাঁচখানা চেক কেনা হইয়াছে ইতিমধ্যে। ইঁহাদের এক নূতন নামও হইয়া গিয়াছে—পাঁচ-খামারের ভুঁইয়া। শিবনারায়ণের সমস্ত সকালবেলাটা কাটিয়া যায় বিষয়-আশয়ের তদারক করিতে, ঠাকুরের নাম লইবার অবসর ঘটে না। এজন্য তিনি বিচলিত হইয়া উঠিতেছেন। মুক্তির আশায় বাহির হইয়া এ কোথায় আটকাইয়া গেলেন? দিন দিন পঙ্কে তলাইয়া যাইতেছেন। অনেকবার সঙ্কল্প করিয়াছেন, নিজেকে এ-সবের মধ্যে আর জড়াইবেন না। কিন্তু নরহরির উপর যে এক বিন্দু আস্থা

করিবার উপায় নাই। শক্তি আছে, বুদ্ধিও আছে—কিন্তু তাঁর হাতে কিছু ছাড়িয়া দিলে সঙ্গে সঙ্গে তিনি অঘটন ঘটাইয়া বসিবেন। অন্তত শিবনারায়ণ যতটা বুঝিয়াছেন, তাহাতে তাঁর এইরূপ আশঙ্কা।

কীর্তিনারায়ণ একদিন নরহরিকে ধরিয়া বসিল, সে-ও গান শুনিতে যাইবে তাঁর সঙ্গে। আবদার কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়, গানে বনের পশু বশ হইয়া যায়। নরহরি আপত্তির কিছু দেখিলেন না, বরঞ্চ মনে মনে খুশী হইলেন। এ বিষয়ে কীর্তিনারায়ণের সত্যিই যদি অনুরাগ জন্মিয়া থাকে, বাড়ির মধ্যেই তাঁর একজন জুড়ি পাওয়া যাইবে। বেলা পড়িয়া আসিতে চুপি-চুপি দু-জনে বাহির হইলেন।

সেদিন আবার বিশেষ একটু ব্যাপার। অনেক দূর—পূব অঞ্চল হইতে আর একটা দল আসিয়াছে, দুই দলে গানের পাল্লা হইবে। লোক গিস-গিস করিতেছে, অত বড় মাঠটি নরমুণ্ডে ভরিয়া গিয়াছে। দু-পাশ দিয়া সারবন্দি কলার তেউড় বসানো, তার উপর তুষ-ভরতি সরা। ঘোর হইয়া আসিতে তুষে কেরোসিন ঢালিয়া জ্বালাইয়া দিল। চারিদিকে আলোয়-আলোময় হইয়া গেল।

গুড়-গুড় করিয়া ঢোল বাজিয়া উঠিল। গান খুব জমিয়া গেল। চারিদিকে 'বাহবা' 'বাহবা' রব উঠিতেছে। অষ্টমীর চাঁদ ডুবিয়া গেল, গানের তবু বিরাম নাই।

আসর ভাঙিয়া গেলে বাড়ি ফিরিবার সময় কীর্তিনারায়ণের গা কাঁপিতে লাগিল। এত রাত্রি অবধি কখন সে বাড়ির বাহিরে থাকে নাই। পাঠশালা ফাঁকি দিয়া ইতিপূর্বে কখন কখন সমস্তটা দিন পালাইয়া বেড়াইয়াছে, শিবনারায়ণ তাহা লইয়া রাগও করিয়াছেন, পরে আবার সব জুড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু রাত্রির অনুপস্থিতির এই ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়াইবে, কে জানে? নরহরি সঙ্গে রহিয়াছেন, তবু ভয় কাটিতেছে না।

নরহরিরও ভয় হইল। শিবনারায়ণ যদি চেঁচামেচি করিয়া হাতে মারিয়া শাস্তি দিতেন, আপদ চুকিত, যা হোক এক রকম আস্কারা

হইয়া যাইত। কিন্তু থমথমে মুখে ক'দিন তিনি ঘুরিয়া বেড়াইলেন, ভালমন্দ একটি কথা কহিলেন না। কীর্তিনারায়ণের বিষয়ে যেন নির্লিপ্ত হইয়া যাইতেছেন, এই রকম ভাব। নরহরির সঙ্গেই ছেলের উঠা-বসা। যত দিন যাইতেছে, বাপের নিকট হইতে সে যেন দূরবর্তী হইয়া যাইতেছে।

নরহরি আর চিন্তামণি কীর্তিনারায়ণের হাত টিপিয়া একদিন খুব তারিপ করিতেছিলেন। শেষে নরহরি শিবনারায়ণকেও না ডাকিয়া পারিলেন না।

দেখে যাও ভাই, চেয়ে দেখেছ কোন দিন? যা কবজির গড়ন, এ ছেলে সবাইকে আমাদের ছাড়িয়ে যাবে, এই বলে দিলাম।

প্রশংসায় কীর্তিনারায়ণের মুখ উজ্জ্বল হইয়াছিল, বাপ সামনে আসিতে ছাইয়ের মতো সাদা হইয়া গেল। শিবনারায়ণ তাহা লক্ষ্য করিলেন। তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

না ভাই, বোষ্টম মানুষ—আমার ছেলেকে লাঠিবাজির মধ্যে নিও না আর তোমরা।

নরহরি বিদ্রূপ-কণ্ঠে বলিলেন, বয়স হয়ে তোমার মতিচ্ছন্ন হয়েছে। বাঘের বাচ্চা বাঘ হবেই। খাঁচায় পুরে যতই নিরামিষ চাল-কলা খাওয়াও, নখ-দাঁতে দেখতে পাবে আপনা-আপনি ধার হয়েছে। ঠেকাতে পারবে না।

শিবনারায়ণ বেশি তর্ক করেন না। তাঁর মনের বাসনা, শ্যামকান্তর মতোই শান্ত-সভ্য হইয়া উঠুক কীর্তিনারায়ণ। যে দিন-কাল আসিতেছে, তাহাতে টিকিয়া থাকিবে শ্যামকান্তরাই। এক একবার এমনও মনে হয়, ছেলে লইয়া ইহাদের মধ্য হইতে পলাইয়া যাওয়া উচিত। তবে আনন্দের ব্যাপারও আছে, বন্ধন ধীরে ধীরে শ্লথ হইয়া যাইতেছে। ছেলে বাপের চেয়ে নরহরিরই বেশি অনুগত। লীলাময় প্রভু কাঁধের বোঝা নামাইয়া দিতেছেন, তাঁর দায়িত্ব অন্য লোকে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিতেছে। ইহাতে আরাম পাইবারই তো কথা।

খালের ওপারে বরণডাঙা গ্রামের সঙ্গে হুনদাড়ি খেলায় কীর্তিনারায়ণদের একদিন পাল্লা হইয়া গেল। খেলাটা হইল চিতলমারির চরে। শেষ পর্যন্ত জিত হইল শ্যামগঞ্জের। খেলা ভাঙিতে সন্ধ্যা গড়াইয়া গেল। তা যাক, স্ফূর্তিতে সকলে তুড়িলাফ দিতে দিতে ফিরিয়া আসিতেছে। এমন সময় দীঘির পাড়ের খেজুরবনে ঠন-ঠন করিয়া ভাঁড়ের আওয়াজ শোনা গেল। বেশ ঘোর হইয়া আসিয়াছে, গাছেরও মাথা অবধি ভাল নজর চলে না। একজন বলিল, শোড়েল উঠে রস খাচ্ছে।

উঁহু। দলপতি কীর্তিনারায়ণ নজর করিয়া দেখিয়া ঘাড় নাড়ে। ঐ যে ছায়া—শোড়েল ঐ রকম লম্বা হয় বুঝি! চল তো এগিয়ে—ওদিকে দীঘি, তিনদিক ঘিরে সামাল হয়ে যাই চল—

আবার অতি সন্তর্পণে দেখিয়া লয় একবার।

মানুষ—আক্রমণ করতে হবে। খালি হাতে নয়—জিওলের ডাল ভেঙে নাও এক-একখানা।

তাহাই হইল। হাতের মাথায় যে যেমন পাইল, এক এক ডাল ভাঙিয়া আগাইয়া চলিল। হঠাৎ—ও বাবা রে—উপর হইতে ছড়ছড় করিয়া খেজুর-রস পড়িল একজনের মাথায়, মাথা হইতে গড়াইয়া সর্বাঙ্গ ভিজিয়া গেল। শীতের রাত্রি, উত্তুরে হাওয়া দিতেছে, মুহূর্তে তার সর্বাঙ্গ কাঁপিয়া কুঁকড়াইয়া উঠিল। তার পরে যে অবস্থা হইবে, ভাবিতে ভয় হইয়া যায়—চুল এমন আঠা হইয়া মাথার সঙ্গে আঁটিয়া যাইবে, গা চটচট করিবে, যে এই রাতে রীতিমতো অবগাহন স্নান না করিয়া পরিত্রাণ নাই।

কীর্তিনারায়ণ রাগিয়া মুখ খিঁচাইয়া ওঠে। সরে আয়, দূরে আয়—শত্রুব্যূহে যেতে আছে ঐ রকম অসাবধান হয়ে? ভাগ্য ভালো, ভাঁড়ের রস ফেলেছে—আস্ত একটা ভাঁড় মাথায় ভাঙে নি।

গলা উঁচু করিয়া অদৃশ্য শত্রুর উদ্দেশে সে কহিল, মেঘের আবরণে

বরুণ-বাণ মারছ কেন ইন্দ্রজিৎ? ভূমে এসে রণ দাও। পরীক্ষা হোক, কার কেমন শক্তি।

খানিকক্ষণ চুপচাপ। অন্ধকার, শত্রুদল কি করিতেছে ঠাহর করা যায় না। চষাক্ষেত হইতে মাটির ঢিল কুড়াইয়া ইহারা প্রস্তুত হইয়া আছে। সামনে হঠাৎ কয়েকটা ছায়ামূর্তি। কীর্তিনারায়ণ রুখিয়া উঠিল, আক্রমণ কর—ধ্বংস কর—

শত্রুদলের একজন আগাইয়া একেবারে ইহাদের মধ্যে চলিয়া আসিল। বলে, রস খাচ্ছিলাম এক ঢোক—

কীর্তিনারায়ণ তাহাকে চিনিল। নাম ভানুচাঁদ—পরে জানিয়াছে। নরহরির সহিত সেই যে গান শুনিতে গিয়াছিল, সেই আসরে উহাকে সে দেখিয়াছিল। দেখিয়াছিল তো অনেককেই, কিন্তু ইহাকে বিশেষ করিয়া মনে রাখিবার কারণ, বাড়ি-হইতে-আনা একটা পানের খিলি সংগোপনে দিয়া ছেলেটা তাকে খাতির করিয়াছিল। ফর্শা চেহারা, কম বয়স—এই কীর্তিনারায়ণের সম্পর্কে ভানুচাঁদের মনে হইয়াছিল, সোনালি রঙের কঠিন ইস্পাত দিয়া তৈরি। চোখ আর সে ফিরাইতে পারে নাই। সবাইকে বাদ দিয়া পানের খিলি সে ইহাকেই আনিয়া দিয়াছিল।

ভানুচাঁদ বলে, রস খাচ্ছি তা তোমরা ওরকম লেগেছ কেন বল দিকি?

কীর্তিনারায়ণ মুরুব্বিয়ানা করিয়া জবাব দেয়, খাবে তা চেয়ে খাওয়াই তো উচিত। না বলে নিলে চুরি করা হয় না?

ভানুচাঁদ বলে, চাইলে কি দেয়? উল্‌টে গালিগালাজ করে।

ইহার উপরে যুক্তি নাই। চাহিলে দেয় না, অতএব না চাহিয়াই ব্যবস্থা করিয়া লইতে হইবে—আর কি তৃতীয় পন্থা থাকিতে পারে? কীর্তিনারায়ণ তর্ক না তুলিয়া বলিল, তাহলে মোটের উপর বক্তব্যটা কি দাঁড়াচ্ছে? সন্ধি?

অত সব সাধু-উক্তি বুঝিবার ক্ষমতা ভানুচাঁদের নাই, মুরারি পণ্ডিতের পাঠশালায় পড়ে নাই তো! সে কেবল ঘাড় নাড়িল

কীর্তিনারায়ণ খুশী হইয়া বলে, বেশ—মঞ্জুর। ক-জন তোমরা? গাছ ক-টা সব কি সাবাড় হয়ে গেছে?

না, তাহারা জন চারেক মাত্র। সবে শুরু করিয়াছিল—বহুত গাছ বাকি এখনো। নিচু গাছিগুলির রস খাওয়া যাইবে না, শিয়ালের উৎপাতে গাছিরা নেড়া সেঁজির আঠা দিয়া রাখে। তা লম্বা গাছ গণিয়া দেখিলে পনের-কুড়িটা হইবে বইকি।

মজা-দীঘির জলে পাট পচানো। কত পাট কাটিয়া লইয়া গিয়াছে, পাটকাঠি স্তূপাকার হইয়া আছে। তাহারই এক এক টুকরা ভাঙিয়া লইয়া কাঠবিড়ালির মতো সকলে এগাছ-ওগাছ করিতে লাগিল। আধঘণ্টার মধ্যে খাতির এমনি জমিয়া উঠিল যে ভানুচাঁদ ইহাদের নিমন্ত্রণ করিয়া গেল। তার বাড়িতে গেলে সে নূতন জিনিস খাওয়াইবে, যেন নিশ্চয় তারা যায়। কি জিনিস তাহা বলিল না, বিস্তর চাপাচাপি করিয়াও বাহির করা গেল না।

(৭)

বড় কড়া মুরারি পণ্ডিত, তিলমাত্র ফাঁকি চলে না। এক পাশে জল-চৌকির উপর তাঁর আসন, পাশে জোড়া-বেত। সামান্য যদি গুঞ্জন ওঠে পাঠশালার কোন কোণে, বেতটা কেবল ছুঁইলেই হইল, তার অধিক আবশ্যক নাই। তবে কীর্তিনারায়ণের সঙ্গে সম্পর্ক আলাদা। কি কারণে সঠিক বলা যায় না, তাকে শাসন করিতে পণ্ডিতের সাহসে কুলায় না। বড় রাগ হইলে তার যে কিছু হইবে না—ঠারে-ঠোরে এইটুকু মাত্র জানাইয়া দেন।

খুঁটির গায়ে পেরেক পোঁতা। তাহাতে এক টুকরা কাঠ টাঙানো থাকে, কাঠে খুদিয়া লেখা আছে—'বাহির'। বাহিরে যাইবার গরজ হইলে পণ্ডিতের কাছে ছুটি লইবার প্রয়োজন নাই, কাঠখানা হাতে লইয়া চলিয়া যাও। দুই রকম সুবিধা এই ব্যবস্থায়—পণ্ডিতকে বারম্বার কথা বলিয়া হুকুম দিতে হয় না, তা ছাড়া কাঠ একখানা মাত্র থাকার দরুন একসময়ে একজনের বেশি বাহিরে থাকিতে পারে না।

আবার থুতু ফেলিয়া যাইবার নিয়ম। অতি দ্রুত কাজ সারিয়া থুতু শুকাইবার আগেই ফিরিতে হইবে। ছেলেরা ইটের উপর কিংবা ঘাসবন দেখিয়া থুতু ফেলে, যাহাতে অতিশীঘ্র থুতু না শুকায়। ছুটি এইরূপে যতটা দীর্ঘস্থায়ী করিতে পারা যায়।

বইয়ের পড়া হয় বিকালবেলা। সেটা নিতান্তই গৌণ—সব দিন যে হইবে তার ঠিক নাই। হাটবারে পণ্ডিত হাট করিতে যান, সেদিন বিকালে পাঠশালা বসেই না। তা ছাড়া দলিল লিখাইতে, সামাজিক বা অন্য কোন গোলমাল বাধিলে সালিশি করিতে মাঝে মাঝে পণ্ডিতের ডাক পড়ে। বিকালে পাঠশালার তাই নিশ্চয়তা নাই।

আসল কাজকর্ম সকালবেলার দিকে। প্রথমে হাতের লেখা—তালপাতায়, কলাপাতায়, শ্লেটে। নূতন শ্লেট উঠিয়াছে কসবায়, অবস্থাপন্ন দু-চারিজন কিনিয়া আনিয়াছে ছেলেদের জন্য। হাতের লেখার পর কোনদিন হয় শ্রুত-লিখন, কোনদিন বা পত্র ও দলিলের রকমারি মুশাবিদা। ঘরের ভিতরের ছেলেরা ধারাপাত অভ্যাস করে।

পণ্ডিত বলিলেন, নামতা পড়া দেখি আজ ফট্‌কে। কুড়ির ঘর অবধি।

শুকনা মুখে ফটিক উঠল। আট ছয়ে কত হয়, বলিতে পারে না—সেই পড়াইবে কুড়ির ঘর। সন্ত্রস্ত ভাবে গিয়া সে দাঁড়াইল। চুপচাপ দাঁড়াইয়া আছে।

হল কি?

শেয়ালে কাল আমাদের হাঁস ধরে নিয়ে গেল পণ্ডিত মশায়—

তোমার মুখের বাক্যিও কি নিয়ে গেছে?

শেয়াল তাড়িয়ে বেড়িয়েছি, পড়তে পারি নি।

শ্যামকান্ত বাহিরে আসিয়া বলে, আমি পড়াই পণ্ডিত মশায়।

শ্যামকান্ত সর্দার-পড়ুয়া নয়—তারও উপরে। কসবায় গিয়া বৃত্তি-পরীক্ষা দিয়া আসিয়াছে। যতদিন ফল না বাহির হইতেছে, পাঠশালায় যাতায়াত করে, মাতব্বরি করে এই মাত্র।

মুরারি পণ্ডিত তটস্থ হইয়া বলিলেন, পড়াবে তুমি—ইচ্ছে হয়েছে? তা বেশ, পড়াও—

কীর্তিনারায়ণের দিকে এক নজর চাহিয়া তখনই আবার মুখ ফিরাইয়া বলিতে লাগিলেন, পরীক্ষায় তুমি প্রথম হবে। আমি নিশ্চয় জানি। মুখ উজ্জ্বল করবে তুমি চৌধুরি-বাড়ির।

নামতা পড়ানো শেষ হইল। তারপর শ্যামকান্ত বলে, কড়া-কুড়ি-পণ-কাঠা-সের—এ-ও তো হয় নি ক-দিন। পড়াব?

বারাণ্ডার নিচে নারিকেল-গুঁড়ি কাটিয়া ধাপ বসানো। কীর্তি নারায়ণ সে দিকে চাহিয়া আছে। তৃতীয় পৈঠায় ছায়া আসিলেই ছুটি হইয়া যায়, এখন ছায়া তারও নিচে—চতুর্থ পৈঠা অবধি নামিয়াছে। কাঠা-সের এখনো শুরুই হয় নাই। এই ভাল ছেলেগুলার জ্বালায় পড়িতে আসিয়া সুখ নাই একটু।

মাঝে মাঝে ঢাকের আওয়াজ আসিতেছে। বড় যখন বাজিয়া ওঠে, পণ্ডিত উন্মনা হন। দীননাথ হাজরাতলায় মানত-পূজা শোধ করিতে গিয়াছে। তার ছেলে কেশবের অসুখ করিয়াছিল, বিকারে দাঁড়াইয়াছিল। সারিয়াছে, তাই এ-পূজা।

কীর্তিনারায়ণকে পণ্ডিত বলিলেন, শুনছ? কি রকমটা মনে হয়?

কীর্তিনারায়ণ প্রণিধান করিয়া বলে, উঁহু, বলির বাজনা আলাদা—

পণ্ডিত ঘাড় নাড়িয়া বলেন, তা বলে নিশ্চিন্ত থাকা যায় না বাপু। বলি না বাজিয়ে যদি কেবল আরতিই বাজিয়ে যায়। বড় বজ্জাত—ও বেটা সব পারে। জানে, বাজনা শুনলেই হকদারেরা এসে পড়বে।

আবার বলেন, তুমি গিয়ে বরঞ্চ হাজির থাক ঐ জায়গায়; নইলে সরিয়ে ফেলবে। গিয়ে বলোগে, কেশব যখন এই পাঠশালার ছেলে তিনটে পাঁঠার মধ্যে অন্তত একটার মুণ্ডু আমি পাব।

কীর্তিনারায়ণ রক্ষা পাইয়া গেল। আর তিলার্ধ সে দেরি করিবে না। এক সহপাঠীর হাত ধরিয়া টানিয়া বলে, আয় রে তিনু, দু-জনে যাই—

না, তোমার যাওয়া হতে পারে না কীর্তি, হার্জিয়াতলা বউভাসির চকের ভিতর—ভিন্ন এলাকায়।

পণ্ডিত শঙ্কিত দৃষ্টিতে তাকাইলেন। দৃঢ়স্বরে শ্যামকান্ত বলিতে লাগিল, বাইরের এলাকায় তুমি হাত পেতে গিয়ে দাঁড়াবে, চৌধুরিদের তাতে অপমান হয়। যেও না।

ছোট মুখে বয়স্কদের মতো পাকা কথা শুনিয়া কীর্তিনারায়ণ সকৌতুকে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছিল। সবটুকু শুনিয়া তিনুর হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে যেমন যাইতেছিল, তেমনি বাহির হইয়া গেল। ভালোমন্দ একটা জবাব পর্যন্ত দিল না। অন্তত এই একটা ব্যাপারে একঘর ছেলেপুলে ও পণ্ডিতের সামনে শ্যামকান্তকে অগ্রাহ্য করিতে পারিয়া ভারি সে তৃপ্তি বোধ করিল।

বয়সে ছোট হইলে কি হয়—শ্যামকান্ত সকল খবর রাখে। বউভাসির ঘাটের ঐ অঞ্চলটায় আজকাল আবাদ হইয়া থাকে—বউভাসির চক নাম হইয়াছে জায়গাটার। ঐ চক লইয়া কর্তাদের ভিতর খুব মন-কষাকষি চলিতেছে। মালিক বরিশাল জেলার লোক—কি রকমের কুটুম্বিতাও আছে চৌধুরিদের সঙ্গে। জমি অত্যন্ত উর্বর—বাঁধ দিয়া নোনা ঠেকাইতে পারিলে একেবারে সোনা ঢালিয়া যায়।—কিন্তু তার চেয়ে বড় প্রলোভন—চরটা ঢালিপাড়ার ঠিক উত্তর প্রান্তে; ওটা পাওয়া গেলে মালঞ্চ চিতলমারি আর ডাকাতির বিল—এই ত্রি-সীমানার ভিতর সমস্ত জমি একলপ্তে আসিয়া যায়; বাহিরের কারও আসিয়া মাথা গলাইবার সম্ভাবনা থাকে না।

অতদূর বরিশাল হইতে জমিদার কালে-ভদ্রে আসেন, নায়েব-গোমস্তা কাজ চালাইয়া যায়। কিন্তু কার্যকালে দেখা গেল, না আসিয়াও শ্যামগঞ্জ তরফের গরজটা তাঁরা ঠিক বুঝিয়া ফেলিয়াছেন। প্রথম মাস কয়েক চিঠিপত্রে উভয় পক্ষ হইতে পরস্পরের মহিমা-কীর্তন চলিয়া অবশেষে যখন টাকার অঙ্ক প্রকট হইল, নরহরি স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

শিবনারায়ণ প্রবোধ দিলেন, থাকগে—কি হবে আর জমি-জমায়?

পাঁচ-পাঁচখানা চক—কম নয় তো। বেশি লোভ না করাই ভাল। সম্পত্তি বাড়ানো একটা বিষম নেশা ভাই। নেশার ঘোরে চলেছি আমরা।

মুহূর্তকাল স্তব্ধ থাকিয়া আবার বলিলেন, দেখ মানুষই বেঁচে থাকতে চায়—সবারই বাঁচবার অধিকার রয়েছে। একের লোভ বিশ্বগ্রাসী হলে আর দশজনেরই সর্বনাশ হয় তাতে। আমার তো মনে হয় পৃথিবীতে জায়গা-জমি যা আছে তাতে কারও অনটন হবার কথা নয়। কিন্তু মানুষের লোভ বেড়ে চলেছে—লোভের জায়গা হচ্ছে না বলেই চারিদিকে এত অশান্তি।

নরহরির এত সব শুনিবার ধৈর্য নাই। তিনি ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিয়াছেন। বলিলেন, তাই দেখ, লোভ ওদের কি রকম সীমা ছাড়িয়ে গেছে। এমন খাপছাড়া দর হাঁকবে কি জন্য? বিক্রি করবে না স্পষ্ট বলে দিলেই পারত। চক্ষু-পর্দা আছে নাকি ওদের? আবার লিখেছে—কুটুম্ব, আপনার লোক। হাত নিশপিশ করছে—নাগালের মধ্যে পেলে কুটুম্ব আর কুটুম্বর চক নোনাজলে একসঙ্গে নাকানি-চুবানি খাইয়ে ছাড়তাম।

তা নরহরি অনায়াসে পারেন, শিবনারায়ণের ইহাতে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই। জানেন, লাভ নাই—তবু বুঝাইতে লাগিলেন, লোভ হল আগুনের শিখা। লোভের বস্তু যত সংগ্রহ হবে, আগুনে ঘৃতাহুতির মতো লোভ ততই প্রখর হয়ে উঠবে। চকের পর চকের মালিক হয়ে তোমার লোভ বেড়েই যাচ্ছে। তাঁরা এর সুযোগ নিতে ছাড়বেন কেন? তোমার লোভে তাঁদেরও লোভ উদ্দীপ্ত হয়েছে—আগুনের সংযোগে ইন্ধন জ্বলে উঠবার মতন। এই লোভের হানা-হানিতেই মানুষের সমাজে এত গণ্ডগোল।

নরহরি তখনকার মতো চলিয়া গেলেন। কিন্তু মনে মনে রাগ পুষিয়া রাখিলেন, শিবনারায়ণের বুঝিতে বাকি রহিল না। আবার আজ নূতন করিয়া মনে উঠিল, এ তিনি কোথায় চলিয়াছেন ইহাদের সঙ্গে একসূত্রে আবদ্ধ হইয়া? পথের মাঝখানকার এ বন্ধন ছিঁড়িতেই হইবে, এ অবস্থায় থাকা চলিবে না।

কীর্তিনারায়ণ আর তিনু পাঠশালা হইতে বাহির হইল, কিন্তু হাজারতলার দিকেই গেল না। দায় পড়িয়াছে পণ্ডিতের প্রাপ্য মুণ্ডের ধান্দায় ঐখানে ধর্ণা দিয়া থাকিতে। তিনুকে তাড়াতাড়ি খাইয়া আসিতে বলিল। সে-ও বাড়ি গিয়া নাককাটির খালে একটা ডুব দিয়া যা হোক দু'টা ন্যাকে-মুখে গুঁজিল। আবার কি নূতন জিনিস খাইতে দিবে ভানুচাঁদের বাড়ি গেলে, পেটে জায়গা রাখিতে হইবে তো।

তিনু ছাড়া আরও দু'টি ছেলে জুটিল পথে। চারজনে ঢালি-পাড়ায় চলিল। ভানুচাঁদের বুড়ি মা তাড়াতাড়ি মাদুর পাতিয়া দিল দাওয়ার উপর। সংসারের সম্বন্ধে নানা কথা হইতে লাগিল। ভানুচাঁদ জন্মিয়াছিল সেই যেবার বড় বন্যা হয়। গাঙের জল শ্যামগঞ্জের সদর-বাড়ি অবধি উঠিবার জো করিয়াছিল। সে কি কাণ্ড! ঘরের পাশে কল-কল শব্দ। সর্দার তখন বাঁচিয়া। বউয়ের গা ঠেলিয়া বলে, ওঠো শিগ্‌গির, রক্ষে নেই—বান এয়েছে।

বৃষ্টিটা তখন বন্ধ হইয়াছে। ফুটফুট করিতেছে জ্যোৎস্না। চাহিয়া দেখে, মাঠঘাট একাকার। জল ক্রমে উঠানে আসিল। ঐ অবস্থায় সর্দার তাকে ঘরের আড়ার উপর তুলিয়া দিল। তালের আড়া, ভাল করিয়া চাঁচা নয়, হাত-পা ছড়িয়া গেল। সে আর সর্দার আড়ার উপর পাশাপাশি বসিয়া রাত্রি কাটাইল। সেই যে বড় বান আসিয়াছিল—ক-বছর হইল বল তো?

আঙুলের কর গণিয়া বুড়ি হিসাব করে। কুড়ি পুরিতে দুই কম। ছেলের তবে কত বয়স হইয়াছে, দেখ। এখন বিয়ে দিলে হয়, মেয়েও ঠিক হইয়া আছে—নরম-সরম গড়ন, এপারে—হ্যাঁ, এই পাড়ার মধ্যেই তাদের বাড়ি। দুত্তোর, বলিয়া ফেলাই যাক—রঘুনাথ সর্দারের মেয়ে যমুনা। বছর ছয়-সাতের একটি মেয়ে এক শিশুকে জাপটাইয়া উঠানে বাঁকা হইয়া দাঁড়াইয়া উহাদের দেখিতেছিল। মেয়েটিকে দেখাইয়া বুড়ি বলিল, ঐ বয়সি হবে আর কি! দেখতে অমন নয়—ওর চেয়ে অনেক সুন্দর।

আবার ঘরে গিয়া পানের বাটা লইয়া আসিল। পা ছড়াইয়া বসিয়া বুড়ি সুপারি কাটে। এত বয়স হইয়াছে, চোখেও নাকি ভাল দেখিতে পায় না। কিন্তু সুপারি কাটিতেছে কত মিহি ও চমৎকার।

ভানুচাঁদ তামাক সাজিয়া আনিল। কড়া দা-কাটা তামাক—গন্ধে চারিদিক ভরিয়া গিয়াছে। কলাপাতার ঠোঙায় কলিকা বসাইয়া একের পর এক টানিতে লাগিল। হাতে হাতে ঘুরিয়া কলিকা আসিল কীর্তিনারায়ণ অবধি। সে ঘাড় নাড়ে। না, ইহা চলিবে না। এই জন্যই এত করিয়া বলিয়াছিল ভানুচাঁদ? তামাক খাওয়ার জো তার নাই। ঘোষদের কোন এক পূর্বপুরুষ মরিবার আগে মানা করিয়া গিয়াছেন। সৌদামিনীর কাছে কীর্তিনারায়ণ গল্প শুনিয়াছে, এক শীতের রাত্রে লেপের নিচে শুইয়া ঘোষ বংশের একজন মৌজ-করিয়া তামাক খাইতেছিলেন। কখন ঘুমের আবিল আসিয়াছে, কলিকার আগুন বিছানায় পড়িয়াছে। দাউ-দাউ করিয়া মশারি জ্বলিয়া উঠিল। এক লাফে উঠিয়া দড়ি ছিঁড়িয়া মশারিটা তিনি একদিকে ছুঁড়িয়া দিলেন। বউয়ের তখন কাপড়ে আগুন লাগিয়াছে। সুন্দরী বউ, ঐ তল্লাটের অসংখ্য মেয়ে দেখিয়া তার মধ্য হইতে পছন্দ করিয়া আনা বউ। মুখ পুড়িয়া তার এমন চেহারা হইল যে দেখিলে আঁৎকাইয়া উঠিতে হয়। সারা জীবন এই বউ লইয়া ঘর করিতে হইয়াছিল। তামাক খাইতে গিয়া এই দশা করিয়াছেন, অহরহ খচ-খচ করিয়া তাঁর মনে বিঁধিত। নিজে তো কোনদিন আর তামাক খান নাই—মরিবার সময় ছেলে-পুলেদের মানা করিয়া গেলেন। ঘোষ-বংশে সেই হইতে তামাক চলে না।

এই ছেলেগুলি লুকাইয়া চুরাইয়া কালে-ভদ্রে দু-একটান টানিয়াছে। প্রকাশ্য দাওয়ায় এ রকম আড্ডা জমাইয়া তামাক খাওয়া—এ এক নূতন অভিজ্ঞতা। একেবারে বর্তাইয়া গিয়াছে তারা। একটা মিছিল শেষ হইলে. ভানুচাঁদ জুত করিয়া আবার সাজিতে বসিল।

তিনু বলে, দেখই না পরখ করে কীর্তি। কি হবে?

উঁহু—

খেলে মরে যাবে না। আমরা তো মরিনি।

তোরা আর আমরা কি এক ?

দুটো করে মাথা বুঝি তোমাদের ? দো-মহলায় থাক বলে নাকি ?

যা-যা-যা—

তাড়া দিয়া কীর্তিনারায়ণ চুপ করিয়া থাকে। তামাক খাওয়া শেষ করিয়া উহারা কলিকা রাখিয়া দিয়াছে, গল্পগুজব হইতেছে—হঠাৎ দু-হাতের চেটোয় সেই পোড়া-কলিকা তুলিয়া শোঁ-শোঁ শব্দে সে কি টান। কীর্তিনারায়ণ মরীয়া হইয়া টানিতেছে।

ভানুচাঁদ হাসিয়া বলে, কলকে ফেটে যাবে ঘোষমশায়। বড়-তামাকও মানষে এ রকম টানে না।

তিন পুরুষের নিয়ম ভাঙিয়া ফেলিল কীর্তিনারায়ণ। ক্রমে তামাকের নেশা ধরিয়া গেল। ফাঁক পাইলেই সে ঢালিপাড়ায় আসে। একা নয়—দলের দু-পাঁচ জন জুটিয়া যায়। বাড়ির ধারে চাঁদ কাঁটার জঙ্গল মারিয়া কাঠা দশেক জমিতে ভানুচাঁদ বেগুন ও ভুঁই-কুমড়া ফলাইবার চেষ্টায় আছে। বড় কঠিন ব্যবস্থা—তামাক খাইতে হইলে সেই জমি কোপাইয়া দিতে হইবে। রোদের তেজ হইয়াছে, দুপুরবেলা বাহিরে তিষ্ঠানো দায়, পা জ্বলিয়া ওঠে, মাটি কোপাইতে কোপাইতে সর্বাঙ্গে ঘামের ধারা বাহিয়া যায়। কিন্তু উপায় তো নাই! কাজে লাগাইয়া দিয়া ভানুচাঁদ তামাক সাজিতে চলিয়া যায়। ইহারা তাগিদ দেয়, কই ভাই, হল ? রান্নাঘর হইতে ভানুচাঁদের জবাব আসে, বাঁশের চেলার আগুন কিনা—কিছুতে ধরছে না। পই ধরে সীমানার আ'ল অবধি চলে যাও তোমরা। আমি ধরিয়ে নিয়ে আসছি।

সীমানা অবধি কোপানো শেষ না হইয়া গেলে কোনদিনই তামাক ধরে না। কীর্তিনারায়ণকে ভানুচাঁদ অবশ্য মুখ ফুটিয়া কিছু বলে না। কিন্তু দলের মধ্যে নিষ্কর্মা থাকিয়া সকলের শ্রমের তামাক খাইবে সে কোন্ বিবেচনায় ? কোদালি হাতে সে-ও নামিয়া পড়ে। তামাক

খাইবার পর আরও মুশকিল। তুলসীর পাতা চিবাইতে হয়, মুখে গন্ধ পাইলে মুরারি পণ্ডিত পিটাইয়া আধ-মরা করিবেন। কীর্তিনারায়ণের আবার গুরুমহাশয়ের উপরও আর দু-জন আছেন—মা ও বাবা।

(৮)

একদিন ভানুচাঁদ খবর দিল, আজকে যাত্রা আছে। অঘোর অধিকারীর দল। নূতন পালা, কলঙ্ক-ভঞ্জন—

কীর্তিনারায়ণ লাফাইয়া উঠে, কোথায় রে? কদ্দুর?

বরণডাঙায়—মাধব দাস বাবাজির আখড়ায়। দূর আর কি, খাল পার হয়ে পোয়াটাক যদি হয় বড় জোর। ওরা পারাপারের নৌকোর ব্যবস্থা করেছে, অসুবিধা কিছু নেই। কলকে-তামাক সঙ্গে নিয়ে যাব।

প্রলুব্ধ স্বরে কীর্তিনারায়ণ বলে, আমি যাব—নিয়ে যাবি?

কিন্তু উপায় কি বিশাল প্রাসাদ হইতে অত রাত্রে বাহির হইয়া যাইবার?

যাইতেই হইবে, কলঙ্ক-ভঞ্জন পালা সে শুনিবেই। নাককাটির খালে জোয়ার লাগিবে দেড় প্রহর রাত্রে। জেলেরা ভেসাল জাল তুলিয়া বাড়ি ফিরিবে। জেলেদের কথাবার্তা, বৈঠা বাহিবার সময় ডিঙির গায়ে আওয়াজ—এইসব হইবে সঙ্কেত। সেই সময় কীর্তিনারায়ণ খিড়কির দরজা খুলিয়া বাহির হইয়া আসিবে। দরজা খোলা থাকিবে, তা আর করা যাইবে কি? বরঞ্চ ফিরিবার সময় ইহাতে সুবিধাই হইবে।

ভাত খাইয়া কীর্তিনারায়ণ যথারীতি শুইতে গেল। এক বড় খাটে তার আর শ্যামকান্তর বিছানা। একটু পরেই শ্যামকান্ত ঘুমাইয়া পড়িল। কীর্তিনারায়ণ উস-খুস করিতেছে। সৌদামিনী শুইবার পূর্বে আবার মশারি গুঁজিয়া দিয়া যান। ভাবিয়া ভাবিয়া সে এক বুদ্ধি বাহির করিল; পাশবালিশটা শিয়রের বালিশের উপর শোয়াইয়া

আপাগোড়া কাঁথা দিয়া ঢাকা দিল—যেন কীর্তিনারায়ণই মুড়ি দিয়া ঘুমাইতেছে। জোয়ার আসিল কিনা, ঘরের ভিতর হইতে বুঝিবার উপায় নাই। এদিক ওদিক চাহিয়া সুড়ুৎ করিয়া এক সময় সে বাহির হইয়া গেল। পাঁচিলের ধারে গাবতলায় ক্ষণকাল উৎকর্ণ হইয়া সে জোয়ারের সাড়াশব্দ লইতে লাগিল। আবার বাড়ির দিকেও তাকাইয়া দেখিতেছে কেউ তাহাকে লক্ষ্য করিতেছে কিনা।

ভানুচাঁদ ঠিক সময়ে আসিল।

অন্ধকার রাত। কিন্তু বাঁধের শুকনো রাস্তা—চলিতে কষ্ট হইতেছে না। তামাক সাজিয়া লইয়াছে, দু-জনে পালা করিয়া টানিতেছে। এক ছিলিম শেষ হইয়া গেলে পথের ধারে বসিয়া আবার সাজিয়া লয়। খোলা মাঠের হাওয়ায় মনের আনন্দে অবাধ স্বাধীনতায় তামাকের ধোঁয়া ছাড়িতেছে। কাহাকেও সমীহ করিবার আবশ্যক নাই এখন। চিতলমারির খাল পার হইয়াও পথ ক্রোশ খানেকের কম হইবে না, কিন্তু নব-আস্বাদিত আনন্দে তারা যেন উড়িয়া চলিল।

কী তাজ্জব যে গাহিল অঘোরের দল! জুড়ির গানের ধরতা দেয় অঘোর নিজে। গেরুয়া রঙের আপাদ-লম্বিত একটা জামা পরিয়া সে আসরে নামে। আটখানা মেডেল পাইয়াছে; গলায় ঝুলানো সেই মেডেলের মালা লণ্ঠনের আলোয় ঝিকমিক করে। বুড়ো হইয়াছে, কিন্তু গলা কি মিঠা! মেডেল লোকে তাহাকে অমনি দেয় নাই।

পালা ভাঙিতে সকাল হইয়া যাইবে, আগেই তারা ফিরিল। খিড়কির দরজা খোলাই আছে, কীর্তিনারায়ণ টিপিটিপি উপরে উঠিয়া আসিল। হাত-পা ঠকঠক করিয়া কাঁপিতেছে, ধরা পড়িলে রক্ষা নাই। নিঃশব্দে সে শুইয়া পড়িল।

দু-এক বাড়ি গাহিবার পর অঘোরের দলের নাম পড়িয়া গেল। মূল-পালা শেষ হইবার পর প্রহসন হয় দু-একখানা। অঘোরের সে সময়টা আসরে কাজ নাই, সাজ ঘরে আসিয়া সাজ-পোশাক ও

চুলদাড়ি গণিয়া মিলাইয়া বাক্সবন্দি করে। প্রায়ই ডাক আসে সেই সময়।

শুনবেন একটু, অধিকারী মশায়। শনিবারের দিনটা আমাদের ওখানে। বায়না নিয়ে নেন, কাল থেকে নেমন্তন্নে লোক বেরুবে।

অঘোর বলে, শনিবারের দিন মালাধর গোমস্তা মশায়ের বাড়ি। শনিবার নয় আজ্ঞে। রবিবারেও না—সোমবার। পহর খানেকের মধ্যে পৌঁছব গিয়ে। রান্নাবান্না ওখানে—আটত্রিশ জন লোক আমার দলে।

হাসিয়া বলে, পোনামাছ খাওয়াতে হবে, মশায়। তা হলে গান কি রকম জমিয়ে দেব দেখতে পাবেন। পেটে খেলে পিঠে সয়। মূলোর শুক্তো খেয়ে কি এ্যাকটো করা যায়—বলুন।

এ-গ্রামে সে-গ্রামে প্রত্যহ গাওনা লাগিয়া আছে। কীর্তি-নারায়ণকেও নেশায় পাইয়াছে, ইতিমধ্যে দিন তিনেক চুরি করিয়া শুনিয়া গিয়াছে। একই পালা দু-তিনবার দেখিয়াও তৃপ্তি হয় না। ভানুচাঁদ সব দিন যাইতে চায় না, তখন একাই চলিয়া যায়। কোঁচার কাপড়ে মুখ ঢাকিয়া চাষাভুষা জন-মজুর ঢালি-লাঠিয়ালদের মধ্যে ঘাড় গুঁজিয়া বসে, কেউ যাহাতে চিনিতে না পারে। অঘোরের সঙ্গে আলাপও হইয়াছে। ভাল লোক অঘোর—কীর্তিনারায়ণের চেহারা দেখিয়া বলিয়াছে, সে যদি দলে আসে শিখাইয়া পড়াইয়া তাকে এমন কি বিশাখার পাঠও দিতে রাজি আছে।

একদিন এক কাণ্ড হইল। বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়াছে, শ্যামকান্ত সহসা কীর্তিনারায়ণের হাত আঁটিয়া ধরিল।

কোথায় যাও?

আমতা-আমতা করিয়া কীর্তিনারায়ণ বলে, এই—বাইরে একটুখানি। আবার এখুনি আসব।

হাত ছাড়িয়া শ্যামকান্ত তার কোঁচার খুঁট ধরিল।

রোজই তুমি চলে যাও, আমি জানি।

মিথ্যে কথা।

এখানে কেন ঘোষ মশায়? সামিয়ানার নিচে চৌকি পেতে রেখেছি তা হলে কাদের জন্যে? আসতে আজ্ঞা হোক, হুজুর। কত ভাগ্যি, অধম জনার উঠোনে হুজুরের পায়ের ধুলো পড়ল।

মালাধর নিচু হইয়া অভ্যর্থনার ভঙ্গিতে পিছু হাঁটিতেছে। শিবনারায়ণের ছেলে বিনা আহ্বানে যাত্রা শুনিতে আসিয়াছে, সকলে অবাক হইয়াছে, সরিয়া পথ করিয়া দিতেছে।

মজা লাগিতেছে কীর্তিনারায়ণের, হাসিও পাইতেছে। কতটুকু সে—মালাধর তবু তাকে 'হুজুর' 'ঘোষ মশায়' বলিয়া আহ্বান করিতেছে, আর এই রকম অতিরিক্ত বিনয় দেখাইতেছে। ধীর ভাবে গিয়া সে আসরের চৌকির উপরে বসিল, যেন এমনি ব্যাপারে সে প্রতিনিয়ত অভ্যস্ত। একটা থালা পাতিয়া রাখা হইয়াছে, লোকে পেলা দিতেছে, ঝনঝন সিকি-তুয়ানি পড়িতেছে। বউভাসির চকের একজন চাষী প্রজা সেই থালার সামনে বসিয়া। পয়সা-কড়ি গণিয়া গাঁথিয়া রাখার ভার তার উপর। লোকটা বুড়ামানুষ হইলেও গড় হইয়া কীর্তিনারায়ণকে প্রণাম করিল। দেখাদেখি আরো অনেকে প্রণাম করিল। ঢালিপাড়ায় মাঝে মাঝে সে গিয়া থাকে, কিন্তু সেখানকার লোক এমনধারা প্রণাম করে না। মালাধর ইতিমধ্যে ডিবায় করিয়া পান আনিয়াছে; রূপা-বাঁধান হুঁকায় জল ফিরাইয়া তামাক সাজিয়া আনিয়াছে। গোলমালে গান একটু বন্ধ হইয়াছিল—কীর্তিনারায়ণ হুঁকায় একটা-দু'টা টান দিতে শুরু করিলেই আবার আরম্ভ হইল।

সঙ্কোচ তবু কাটিতে চায় না। বয়স নিতান্ত কম বলিয়াই হয়তো। তবু মোটের উপর খাসা লাগিতেছে কীর্তিনারায়ণের। ভুড়ুৎ করিয়া তামাকে এক একটি টান দিতেছে, খিলির পর খিলি মুখের মধ্যে ফেলিতেছে। তাল-লয় বোঝে ছাই—তবু নরহরির অনুকরণে চৌকির উপর মৃদু আঘাত দিতেছে এক একবার। পিছন হইতে কাঁধের উপর হঠাৎ একখানা হাত আসিয়া পড়িল। আসরের লোকজন যেন জমিয়া গিয়াছে। সকলের চক্ষু গানের দিকে নয়—

এই দিকে। শিবনারায়ণ আর নরহরি এই রাত্রে চলিয়া আসিয়াছেন, নরহরি হাত রাখিয়াছেন কীর্তিনারায়ণের কাঁধের উপর।

মুহূর্তে সোরগোল পড়িয়া গেল। আজ কি হইতেছে বল তো—এ সমস্ত যে স্বপ্নের অগোচর! অভ্যর্থনার জন্ম অনেকে সসম্ভ্রমে উঠিয়া দস্তুরমতো ভিড় জমিয়া গেল ইহাদের ঘিরিয়া। পরে একটু ঠাণ্ডা হইয়া আসিলে খেয়াল হইল, কীর্তিনারায়ণ ইতিমধ্যে ফাঁক বুঝিয়া সরিয়া পড়িয়াছে।

গায়েনদের উদ্দেশ্যে নরহরি বলিলেন, তোমারা থেমে গেল কেন? গান মাটি কোরো না, চালাও—

অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও চৌকির উপর তাঁরা বসিলেন না। নরহরির আপত্তি ছিল না—কিন্তু শিবনারায়ণের দিকে চাহিয়া ইচ্ছাটা আপাতত সংযত করিতে হইল। যে গানটা চলিতেছিল, দাঁড়াইয়া তার শেষ অবধি শুনিলেন। তারপর নরহরি প্রশ্ন করিলেন, অধিকারী কোথায়? অঘোর আসিয়া নত মস্তকে পায়ের ধূলা লইল। নরহরি বলিলেন, সকাল বেলা দেখা করবে। দরকার আছে।

তারপর অলক্ষ্য অন্ধকারের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, কীর্তি এই যে এখানে ছিল, কোথায় পালল—ডেকে দাও দিকি—

না, না, কাজ নেই—আপনি যাবে, কারো তোমাদের ব্যস্ত হতে হবে না। শিবনারায়ণ নরহরির হাত ধরিয়া টানিলেন। চলো—এখানে একটা হাঙ্গামা করে এদের আসর মাটি করব না।

দোতলার অলিন্দে সৌদামিনী ইহাদের জন্ম বসিয়াছিলেন। ফিরিয়াছেন দেখিয়া নামিয়া আসিলেন। শ্যামকান্তও দরজা খুলিয়া আসিল।

পাওয়া গেল না?

শিবনারায়ণ একবার মুখ তুলিয়া চাহিয়া নিঃশব্দে নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন।

শ্যামকান্ত বলিল, আমি কথা মের করে নিয়েছিলাম বাবা। একটু

ঘুমের ভাব এসেছিল, অমনি পালিয়েছে। ঠিক ঐখানে আছে। কোথায় ঘাড় গুঁজে বসে আছে, তোমরা খুঁজে পেলে না।

নরহরি হাসিয়া বলিলেন, পেয়েছিলাম বই-কি, পিছলে সরে গেল। দেখুন দিকি বউঠান, এসে আবার ভালমানুষ হয়ে শুয়ে পড়েছে কিনা?

সৌদামিনী বলিলেন, যাই বলুন চৌধুরি মশায়, বড্ড রাগ কিন্তু আপনাদের। রাত্তিরবেলা নিজেদের যাবার গরজটা কি ছিল? কাউকে পাঠিয়ে দিলেই হত।

নরহরি বলিলেন, ভাষায় কথা বলতে পারি নে—আমি গিয়েছিলাম কিন্তু রাগ করে নয়। শুনবার লোভ ছিল, কি এমন গান—যার জন্য কীর্তি রোজ রোজ পাগল হয়ে বেরিয়ে যায়। এখন রাগ হচ্ছে। এই শুনবার জন্য এত?

কীর্তিনারায়ণ আর আসরের মধ্যে আসে নাই। অন্ধকারে বসিয়াছিল, গান ভাঙিলে লোকজন চলিয়া গেলে আসিল। বয়সের বিস্তর তফাৎ সত্ত্বেও অঘোর ইতিমধ্যে অভিন্নহৃদয় বন্ধু হইয়া উঠিয়াছে; তার সঙ্গে পরামর্শের প্রয়োজন। অঘোরও বিশেষ ভাবনায় পড়িয়াছে, নরহরি তাকে ডাকিয়া গেলেন কেন? কীর্তিনারায়ণ নিজে চলিয়া আসে, সে তো কখনো বাড়ি হইতে ডাকিতে যায় না। তার উপর আক্রোশ কেন তবে? নরহরি চৌধুরি নিজে আসিয়া ডাকিয়া গিয়াছেন, না গিয়া কোনক্রমে উপায় নাই। সাব্যস্ত হইল কাল সকালে দু-জনে কিছু আগ-পাছ হইয়া যাইবে। যদি কীর্তিনারায়ণকে বাড়ি থেকে দূর করিয়া তাড়াইয়া দেন, অঘোরের সঙ্গেই সে চলিয়া যাইবে; দেশ-বিদেশে যাত্রা গাহিয়া বেড়াইবে। জায়গার অভাব কি পৃথিবীতে?

যাত্রাওয়ালাদের সঙ্গে ডাল-ভাত খাইয়া উহাদের সতরঞ্চির একপাশে শুইয়া কীর্তিনারায়ণ রাত কাটাইল। রোজ সৌদামিনী বারম্বার উঠিয়া তাদের মশারি গুঁজিয়া দিয়া যান, যাহাতে মশা

ঢুকিয়া গায়ে বসিতে না পারে। আজ একা শ্যামকান্ত ঘুমাইতেছে। অভ্যাসমতো সেই ঘরে আসিয়া সৌদামিনী স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন, তারপর ধীরে ধীরে শয্যাপ্রান্তে বসিয়া পড়িলেন। দশমীর চাঁদ ডুবিয়া চারিদিক অন্ধকার হইল। নিঃশব্দে তিনি বসিয়া রহিলেন।

অনেক রকম যুক্তি আঁটিয়া অঘোরকে লইয়া কীর্তিনারায়ণ বাড়ি ঢুকিল। নিজে দরজার কাছে দাঁড়াইল, অঘোর আগাইয়া গেল। নরহরি মুখ তুলিয়া অঘোরের দিকে চাহিলেন।

তোমার সঙ্গে আগে মিটিয়ে নিই। বোসো—

শিবনারায়ণ সদর-উঠান দিয়া যাইতেছিলেন। কীর্তিনারায়ণকে দেখিয়া দ্রুত পায়ে আসিয়া তাহার হাত ধরিলেন।

এসো—

নরহরি অনুনয়ের সুরে বলিলেন, একদিন একটা অন্যায় করে ফেলেছে—মারধোর কোরো না ওকে।

শিবনারায়ণ হাসিয়া ফেলিলেন।

মেরে মনের মোড় ফেরানো যায় না—আমি জানি, নরহরি। পালিয়ে যাব ভাবছি একে নিয়ে।

ছেলেকে এক রকম টানিয়া লইয়া শিবনারায়ণ অন্দর-বাড়ির দিকে চলিয়া গেলেন।

নরহরি ক্ষণকাল সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁরও দু-একটা কথা ছিল কীর্তিনারায়ণের সঙ্গে। এই গান শুনিতে সে কষ্ট করিয়া যায়—রুচির জঘন্যতা লইয়া গালিগালাজ করিবেন, ভাবিয়াছিলেন। আপাতত তাহা হইল না।

মুখ ফিরাইয়া তারপর বলিলেন, দাঁড়িয়ে রয়েছ কেন? বোসো অধিকারী—বসিবে কি, কথাবার্তার ধরনে অঘোর অবাক হইয়া গিয়াছে। কি মিটাইয়া লইবেন, মিটাইবার মতো ইতিমধ্যে কি ঘটিয়াছে চৌধুরি মশায়ের সঙ্গে?

নরহরি বলিলেন, তোমাকে খুন করা উচিত।

অঘোর ঘামিয়া উঠিয়াছে। বলে, আজ্ঞে—

ও-রকম পালা গাও কেন?

বেকুবের মতো অঘোর চাহিয়া আছে। নরহরি বলিলেন, গান গাওয়া নয়, ও হল সরস্বতীর মাথায় মুগুর মারা। তোমার দলের নাম শুনে গিয়েছিলাম, টিকতে পারলাম না।

অঘোর বলিল, বাঁধনদার যেমন বেঁধে দিয়েছে, হুজুর।

পালা না বেঁধে ভুঁয়ে কোদাল মারতে বোলো তাকে।

এত নামডাক অঘোর অধিকারীর, তার সম্বন্ধে এই মন্তব্য। নরহরি বলিতে লাগিলেন, পালার বিষয়টা হল কি—নাক-কাঁদুনি আর বেয়াড়া ভালবাসাবাসি। মানুষের মাথা খারাপ করে দিচ্ছ, এমন গাওনা বন্ধ করে দাও।

একটু অভিমানের সঙ্গে অঘোর বলে, একটা ভাল পালা আপনি যদি বেঁধে দেন চৌধুরী মশায়—

তাই ভেবেছি আমি কাল সমস্ত রাত। ছড়া নয়—পালা বাঁধব এবার থেকে।

একটুখানি ভাবিয়া বলিলেন, আগামী অমাবস্যায় মন্দির-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছে করছি। নির্বিঘ্নে যদি সমাধা হয়ে যায়, তারপর কাজকর্ম কিছু নেই—শিবনারায়ণের দাপে অঢেল ছুটি। পালা-ই বাঁধব, ঠিক করলাম, শুম্ভ-নিশুম্ভ বধ—ভয়ঙ্করা নৃত্যপরা দিগম্বরী মা জননী, এক হাতে রক্তমাখা খাঁড়া আর এক হাতে ছিন্নমুণ্ড অসুর। গায়ের রক্ত গরম হয়ে ওঠে, কি বল অধিকারী?

ভাবাবেগে উঠিয়া আসিয়া নরহরি অঘোরের হাত জড়াইয়া ধরিলেন। বলিলেন, আমি বলি কি, কৃষ্ণ-যাত্রা ছেড়ে দিয়ে তুমি বরঞ্চ কালী-কীর্তন শুরু করে দাও। ও গানের তুলনা নেই।

শিবনারায়ণ সৌদামিনীকে বলিতেছিলেন, পালাতে হবে বড়বউ। এরা ভিন্ন ধাতুতে গড়া, এ জায়গা আমাদের নয়। ছেলের

কচি বয়স, নমনীয় মন—এদের সঙ্গে পড়ে বিষম উচ্ছৃঙ্খল হয়ে যাচ্ছে।

সৌদামিনী বলিলেন, কিন্তু শ্যামকান্তকে দেখ—কেমন শান্ত-শিষ্ট! অথচ খোদ চৌধুরি মশায়েরই তো ছেলে!

শিবনারায়ণ চুপ হইয়া গেলেন, চোখের উপর এত বড় দৃষ্টান্ত থাকিতে সত্যই বলিবার কিছু নাই।

সৌদামিনী বলিতে লাগিলেন, তোমার সেই সব দিনের কথা মনে কর। ছেলের রক্তের মধ্যে আগুন রয়েছে, অন্যের নামে দোষ দিলে হবে কেন?

শিবনারায়ণ বলিলেন, তা-ই যদি হয়—নেভাতে হবে সে আগুন। নয় তো যে দিনকাল আসছে, নিজেই পুড়ে মারা যাবে। আর নরহরি যে রকম বাতাস দিচ্ছে, এখানে থেকে তা সম্ভব হবে না। মালতীকে পাত্রস্থ না করা পর্যন্ত টিকে থাকব ভেবেছিলাম, কিন্তু ততদিন অপেক্ষা করা আর সঙ্গত বলে মনে হচ্ছে না।

স্নিগ্ধহাস্যে সৌদামিনী বলিলেন, মালতীর ভাবনা ভাবতে হবে না আর তোমার।

কেন? একথা বলছ কেন বড় বউ? বিয়ের কথাবার্তা তুমি কি বলেছ কারো সঙ্গে?

রহস্যপূর্ণ ভাবে চাহিয়া সৌদামিনী বলিলেন, শ্যামঠাকুরই জুড়ে গেঁথে দিচ্ছেন। জানেন, তাঁকে ছাড়া আর কোন দিকে তোমার মন দেবার ফুরসৎ নেই—তাই কন্যাদায় থেকে মুক্তি দিয়ে দিচ্ছেন আমাদের।

শিবনারায়ণের মনে সহসা একটি মনোরম সম্ভাবনার উদয় হইল। একদিন মালতী আর শ্যামকান্তকে একত্র দেখিয়া মুহূর্তের জন্য কথাটি ভাবিয়াছিলেন। তারপর আর মনে ছিল না। সংসারের কোন বিষয়েই স্থিরলক্ষ্য হইয়া তিনি ইদানীং কিছু করিতে পারেন না। যে কাজগুলো কাঁধে আসিয়া পড়ে, যন্ত্র-চালিতের মতো নিতান্ত দায়সারা ভাবে তাহা সমাধা করিয়া যান—এই পর্যন্ত। আর

এমনি বাজে কাজ করিতে হয় বলিয়া এক মুহূর্তও মনে শান্তি বোধ করেন না।

আজ তাঁর সত্যই আনন্দ হইল। অজ্ঞাতে কাঁধের বোঝা এত লঘু হইয়া গিয়াছে, জানিতে পারিয়া স্বাচ্ছন্দ্যের নিশ্বাস ফেলিলেন। শ্যামকান্ত ছেলেটিকে তাঁর বড় পছন্দ।

নরহরি আসিয়া বলিলেন, মন্দির আর দীঘি তো শেষ হয়ে গেল। আগামী অমাবস্যায় প্রতিষ্ঠা করব, মনস্থ করেছি।

বলিতেছেন আর তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে শিবনারায়ণের মুখ-ভাব নিরীক্ষণ করিতেছেন। বলিলেন, কিন্তু তোমার আপত্তি থাকে তো বল, উৎসব আমি বন্ধ করে দেব।

শিবনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন, ধুমধাম করে তুমি তোমার ইষ্টদেবীর পূজা করবে, আমি কেন আপত্তি করতে যাব ভাই?

কথা লুফিয়া লইয়া নরহরি বলিলেন, ঠিক কথা। যে কালী, সেই তো কৃষ্ণ। তবু তুমি চলে যেতে চাচ্ছ।

এ জন্য নয় হরি-ভাই। ছেলে খারাপ হয়ে যাচ্ছে। অহরহ মনে হয়, আমার পিতৃকৃত্যে অপরাধ ঘটছে। আর তোমাদেরও অসুবিধার কারণ হয়ে উঠছি দিন দিন।

নরহরি রাগ করিয়া বলিলেন, তোমার কানে কে এইসব মিথ্যেকথা ঢোকায় বল তো? সৌভাগ্য উছলে পড়ছে, শ্যামশরণের আমল ফিরে আসছে শ্যামগঞ্জে—আর অসুবিধার কারণ হলে তোমরা?

মিথ্যে আশা—শ্যামশরণের দিন আর ফিরবে না, অতীত কখনো ফিরে আসে না, হরি-ভাই।

কিন্তু যেটা আসল আপত্তি বলিয়া নরহরির বিশ্বাস, ঘুরিয়া ফিরিয়া আবার সেই প্রসঙ্গে তিনি আসিলেন। তোমার শ্যামঠাকুরের জন্যও নূতন মন্দির গড়ব এর পর। হাসছ কেন ভাই, আমি সেখানেও অঞ্জলি দেব, দেখো।

শিবনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন, খবরদার, ঐটি কোরো না।

শ্যামঠাকুরের অঞ্জলির মন্ত্র পড়বার সময় তোমার মনে আর মুখে অমিল হবে। ভাবের ঘরে চুরি করতে যেও না।

একটু থামিয়া আবার বলিলেন, ঐ যদি সত্যি সত্যি মনের ইচ্ছে, আপাতত তবে সড়কিওয়ালাগুলোকে বিদেয় কর দিকি। ওদের আর রেখেছ কেন?

আজকে দরকার হচ্ছে না—কিন্তু কোনদিন দরকার হবে না, তাই কি কেউ বলতে পারে?

শিবনারায়ণ বলিলেন, শ্যামঠাকুরের মন্দির গড়াতে চাচ্ছ, কিন্তু চকচকে ফলা দেখে প্রেমের ঠাকুর এ বাড়ির দেউড়ি দিয়ে ঢুকতে ভরসা পাবেন না যে।

নরহরি একটা নিশ্বাস ফেলিলেন। সেই প্রথম পরিচয়-দিনের লাঞ্ছনা এখনো তিনি ভুলিতে পারেন নাই। বলিলেন, আর তোমার লাঠি? সে যে বিশটা সড়কির মহড়া নেয়, ভাই। তুমি যখন লাঠি চালাও, ঠাকুর ভাবেন বুঝি ফুল ছড়ানো হচ্ছে?

মধুর হাসিয়া শিবনারায়ণ বলিলেন, কোথায় লাঠি? লাঠি তারপর আমি মালঞ্চে ভাসিয়ে দিয়েছি। কুড়িয়ে নিয়ে ঠাকুর বাঁশী করেছেন। সেই বাঁশী বাজিয়ে বাজিয়ে তিনি ডাকেন।

নরহরি বিস্মিত চোখে শিবনারায়ণের দিকে খানিকক্ষণ তাকাইয়া রহিলেন। দূরের মানুষ অনেক করিয়া কাছে বাঁধিয়া রাখিয়াছেন, আবার তিনি দূরবর্তী হইতেছেন—ঐ দৃষ্টিতে আর কথার সুরে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। কাতর কণ্ঠে নরহরি বলিলেন, তোমার কোথাও যাওয়া হবে না বন্ধু, যেতে আমি দেব না। তোমার যখন ইচ্ছে নয়, কীর্তির সঙ্গে কথাই বলব না আর আমি। তোমার ছেলে—যা-ই আমার ইচ্ছে হোক, আমার পথে আমি তাকে নিতে যাব কেন?

ইহার পর নরহরি একটিমাত্র কথা বলিয়াছিলেন কীর্তিনারায়ণের সঙ্গে। ভায়া আমাদের ছেড়ে যাবে যাবে করছে। তুমি বাপু মন দিয়ে পড়াশুনা কর। আর কখনো আমার কাছে এসো না।

বলিতে বলিতে কণ্ঠস্বর ভারি হইয়া উঠিল। চোখে কখনো জল আসে না নরহরি চৌধুরির। আর একদিকে চাহিয়া সহসা তিনি স্তব্ধ হইয়া গেলেন।

(৯)

ইহার পর দিনকতক কীর্তিনারায়ণ পড়াশুনায় খুব মনোযোগ দিল। নিয়মিত পাঠশালায় যাইতেছে, সন্ধ্যার পর রেড়ির তেলের দীপের সামনে যথারীতি পাঠ অভ্যাস করে। অঘোরের দলও অঞ্চল ছাড়িয়া বিদায় হইয়াছে, রাত্রে বাহির হইবার আপাতত কোন উপলক্ষ নাই।

মুরারি পণ্ডিতের তামাক সাজার ভারটা সম্পূর্ণ বর্তাইয়াছে কীর্তিনারায়ণের উপর। তিমু প্রভৃতি আরও দু-একজন প্রত্যাশী আছে, কিন্তু কীর্তিনারায়ণের সঙ্গে পারিয়া উঠে না। পণ্ডিতের মুখের আদেশের সবুর সয় না, ইসারা করিলেই—অনেক সময় ইসারা না করিতেই, কলিকা লইয়া সে ছুটিয়া বাহির হয়।

একদিন দু-টান দিয়া বড় রাগে পণ্ডিত কলিকাটা উপুড় করিয়া ঢালিলেন। গালি দিতে শুরু করিলেন, শেষটা বকুনি প্রায় কান্না হইয়া দাঁড়াইল।

দেখ্ তো বাবা, চেয়ে দেখ্—একটু তামাক আছে নাকি? পুড়িয়ে কয়লা করে আনলি?

কীর্তিনারায়ণ বড় অপ্রতিভ হইয়া গিয়াছে। বলে, তামাক নিতে মনে ছিল না পণ্ডিত মশাই। খাওয়া-কলকের আগুন তুলে এনেছি।

তা বই-কি! কতকটা স্বগতভাবে পণ্ডিত গজ-গজ করেন। উচ্ছিষ্ট খাওয়াচ্ছিস—নরকে জায়গা হবে না, বুঝলি? তা-ও যদি একটু কিছু থাকতে এনে দিস। বাপরে বাপ—টানের চোটে কলকে ফাটে নি, সেই রক্ষে।

এদিকে যা হোক এক রকম চলিতেছে, কিন্তু বড় দায় ঠেকিয়াছে শুভঙ্করী লইয়া। কিছুতে রপ্ত হয় না। মণকষা কষিতে গিয়া

কাঠাকালির আর্যা আওড়াইতে থাকে। শুভঙ্করীর সে নাম দিয়াছে ভয়ঙ্করী। এ ভাবে ধস্তাধস্তি করিয়া আর চলে না। বাপ রাগ করুন আর যা-ই করুন, নরহরি যতই বোঝান, অতঃপর ইস্তফা না দিয়া আর উপায় নাই।

কিন্তু ভূগোলশাস্ত্রটা শুনতে বড় কৌতুক লাগে। কীর্তিনারায়ণ নিজে পড়ে না—এখনো তার সময় হয় নাই। কোনদিন যে আসিবে, সে বিষয়ে দস্তুরমতো সন্দেহ—অন্তত পণ্ডিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তো সজোরে ঘাড় নাড়িবেন। কিন্তু বৃত্তি-পরীক্ষা দিবে, এমন ভাল ছাত্রও দু-পাঁচ জন আছে। তাদের কাছে মুরারি যখন ভূগোল বুঝাইতে শুরু করেন, প্রতিটি কথা কীর্তিনারায়ণ যেন হাঁ করিয়া গিলে। গ্রামের সামান্য পাঠশালা—সাকুল্যে দু-খানা মানচিত্র, পৃথিবী ও ভারতবর্ষ—তাহাতেই কাজ চলিয়া যায়। পণ্ডিত ভারতবর্ষের কথা বলেন, এক একদিন এক একরকম পরিচয় দেন, ইতিহাসের প্রসঙ্গ ওঠে কখনো কখনো। রাজরাজড়ার উত্থান পতনের কাহিনী নিতান্ত নিরাসক্ত ভাবে কীর্তিনারায়ণ শুনিয়া যায়। এই শ্যামগঞ্জ হইতে নৌকাযোগে কসবা যাইতে পুরা একটা দিন লাগিয়া যায়। রেলগাড়ির নাম শুনিয়াছে—কিন্তু চোখে দেখার ভাগ্য অদ্যাপি হইয়া উঠে নাই। অনেক দূরের দিল্লী নগরীর ঐ নব রাজকীয় জয়-পরাজয়ের সহিত এই শ্যামগঞ্জ এই পাঠশালা ঢালিপাড়া তার নিজের বাড়ি অঘোরের দলের গায়েনরা—ইহাদের কোন প্রকার যোগাযোগ আছে, বালকের তাহা ধারণায় আসে না। কিন্তু সে চেষ্টা করে ইতিহাসের কাহিনী আর ভূগোলের নিসর্গ-বৈচিত্র্য জুড়িয়া গাঁথিয়া ভারতবর্ষের সমগ্রতা উপলব্ধি করিতে। পণ্ডিত বলেন, সোনার দেশ নাকি এই ভারতবর্ষ, আমাদের জন্মভূমি। কত পাহাড়-পর্বত নদ-নদী সমুদ্র-মরুভূমি হ্রদ-প্রান্তর শহর-গ্রাম এখানে। কত বিচিত্র ধরনের মানুষ।

ভাঁটির দেশের ছেলে, নদ-নদী তার অজানা নয়। পাহাড়-পর্বত? দীঘির পাড় উঁচু; আরও অনেক—অনেক উঁচু ও বহুদূরব্যাপী হইলেই

পাহাড় হইয়া দাঁড়াইত। আর দীঘিটা এমনই তো প্রায় একটা হ্রদ। ধান কাটিয়া লইয়া যাইবার পর শীতের শেষাশেষি চিতলমারি ও নাককাটির খালের মাঝামাঝি চকগুলা একেবারে শুকাইয়া যায়, নিঃসীম মাঠ খাঁ-খাঁ করে, ইহাই তো মরুভূমি। আবার ভরা বর্ষায় চেহারা দেখ গিয়া ঐ সব চকের—মরুভূমি তখন সাগর হইয়া গিয়াছে। সমস্ত ভারতবর্ষকে কীর্তিনারায়ণ তাদের ছোট শ্যামগঞ্জ বরণডাঙা ও আশপাশের দু-চারটা গ্রামের মধ্যে কল্পনা করিতে চায়। ভারতবর্ষকে সে চেনে না জানে না। ম্যাপের উপর নানা রং ও রেখা দেখিয়া বিশেষ কিছু ধারণায় আসে না তার।

একদিন পণ্ডিতকে ধরিয়া বসিল, ভারতবর্ষের কোথায় তাদের এই শ্যামগঞ্জ—মানচিত্রে দেখাইয়া দিতে হইবে। মুরারি জানেন, একেবারে পণ্ডশ্রম। তাছাড়া কীর্তিনারায়ণ হেন ছাত্রের এ ব্যাপারে আগ্রহ দেখিয়া তিনি কিছু অবাক হইলেন। একেবারে নাছোড়বান্দা —তার হাত কিছুতে এড়ানো গেল না। পণ্ডিত মানচিত্র খুলিলেন। গ্রাম তো পাওয়াই যাইবে না, থানা খুঁজিতে লাগিলেন। নাই। মহকুমা? তাহাও নাই। অনেক কষ্টে অবশেষে ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে পাওয়া গেল জেলার নামটি—স্পষ্ট নয়, প্রায় আন্দাজে পড়িতে হয়।

সহস্র যোজনব্যাপ্ত ভারতবর্ষের মধ্যে এত ছোট এবং সামান্য তাদের অঞ্চলটা!

মন্দির প্রতিষ্ঠায় বাধা পড়িয়া গেল। শ্যামকান্তর জন্মের সুদীর্ঘ-কাল পরে নরহরির স্ত্রী সন্তান-সম্ভবা হইয়াছিলেন। একটি মেয়ে প্রসব করিয়া আঁতুড়ঘরে তিনি মারা গেলেন। মেয়েটি বাঁচিয়া রহিল—ফুটফুটে চমৎকার মেয়ে।

শ্রাদ্ধ-শান্তি মিটিল। আরও কিছুকাল পরে সৌদামিনী একদিন শিবনারায়ণকে বলিলেন, পালাব-পালাব কর—পায়ে কেমন কড়া-বেড়ি পড়ে গেল দেখ। মেয়ে কার উপর ফেলে চলে যাই এখন? কে আছে ওদের?

শিবনারায়ণ নিশ্বাস ফেলিয়া বলেন, বুঝি না ঠাকুরের কি অভিপ্রায়।

নরহরিকে আবার বিয়ে করার জন্ম সৌদামিনী ধরিয়া পড়িলেন।

নরহরি বলেন, কেন বউঠান পরের মেয়ের শাপমন্যি কুড়োব আবার? একবার বিয়ে করাই কি উচিত হয়েছিল আমার পক্ষে? একজনকে কি সুখী করতে পেরেছিলাম? ঘর-সংসার করা ধাতে আমার সয়? বলুন, আপনি বলুন।

ইহার সত্যতা এক বাড়ির মধ্যে থাকিয়া সৌদামিনীর চেয়ে কে বেশি জানে? তিনি আর কিছু বলিলেন না। ইহাই হয়তো নিয়ম। বাহিরে যে প্রতিভা দশের মধ্যে প্রতিপত্তির আসন করিয়া লইতেছে, ঘরের ভিতর সন্ধান লইয়া দেখ—অশ্রুর প্রবাহ বহাইতেছে তাহাই। মালঞ্চের মতো—যখন এক কূল গড়িয়া উঠিতেছে, নিশ্চিত জানিবে অপর কূলে ভয়াবহ ভাঙন লাগিয়াছে। চৌধুরি-বাড়ির অতিকায় থাম-খিলান, বড় বড় কক্ষ, জনবহুল সুবৃহৎ সংসারের ভিতর ক্ষীণদেহ শান্তমুখ একটি বধূ নিঃশব্দে ঘুরিয়া বেড়াইত, কারও ভাল করিয়া নজরেই পড়িত না—নরহরিরও না। সে যখন মরিয়া গেল, এতটুকু ফাঁক হইয়া যায় নাই কোন খানে—দু-দিনের মধ্যে সকলের মন হইতে সে নিঃশেষে বিলুপ্ত হইয়া গেছে।

নরহরি আবার বলিলেন, তা ছাড়া চুলে পাক ধরে এসেছে যে বউঠান। স্বার্থ রয়েছে বলে সে দিকটায় একেবারে চোখ বুজে থাকবেন না।

সৌদামিনী বলিলেন, কিন্তু একলা আমি এত বড় সংসার কেমন করে আগলে বেড়াই বলুন?

শ্যামকান্তর বিয়ে দিয়ে দিন। বয়স কম—কিন্তু উপায় কি? আপনার নয়—প্রয়োজন আমারও। একটা কিছু না করা পর্যন্ত সোয়াস্তি পাচ্ছি নে। দেবী-প্রতিষ্ঠা করে তারপর সংসারেও ছোট্ট মা'র প্রতিষ্ঠা করব, মনে মনে ঠিক করে রেখেছি।

অবশেষে মন্দির-প্রতিষ্ঠা হইয়া গেল, নরহরির অনেকদিনের সাধ মিটিল। সমস্ত দিন নরহরি নির্জলা উপবাস করিয়া আছেন। কাজকর্ম চুকিয়া গেছে, শ্রান্ত সকলে অঘোরে ঘুমাইতেছে।

রাত্রির শেষ-যামে শিবনারায়ণের হাত ধরিয়া নরহরি মহাকালী বিগ্রহের সামনে দাঁড়াইলেন। উজ্জ্বল ঘৃতপ্রদীপ জ্বলিতেছিল।

গভীর কণ্ঠে নরহরি বলিলেন, বন্ধু, তোমায় আমায় নিত্যসম্বন্ধ স্বীকার করবে কি না? মা সব দেখছেন, ওঁর সামনে বুকে হাত দিয়ে বল।

শিবনারায়ণ হাসিয়া ঘাড় নাড়িলেন।

সৌদামিনী একপাশে ছায়ার মতো বসিয়া তুলার সলিতা পাকাইয়া পাকাইয়া দীপের পাশে রাখিতেছিলেন। মালতী চোখ বুঁজিয়া মায়ের গায়ে ঠেস দিয়া বসিয়াছিল। সেই দিকে লক্ষ্য করিয়া নরহরি সস্নেহে বলিলেন, কত কষ্ট হচ্ছে আমার মা-জননীর! শুতে দিইনি, বসিয়ে রেখেছি এমনি করে। শ্যামকান্তটাকেও ডাকতে পাঠিয়েছি, আজ একটা হেস্তনেস্ত হবে। শ্যামঠাকুর কেমন করে তোমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যান, না দেখে আমি কিছুতে ছাড়ছি নে।

শ্যামকান্তকে খবর দিয়ে পাঠান হইয়াছে, এখনো আসিতেছে না। শেষে সৌদামিনী নিজে চলিলেন তাকে আনিবার জন্য। চোখ মুছিতে মুছিতে শ্যামকান্ত আসিল। বিশেষ-কিছু সে বেচারি বুঝিতে পারে নাই, বাপের দিকে ফ্যাল-ফ্যাল করিয়া চাহিয়া রহিল। কোন-রকমে কাজ শেষ করিয়া চলিয়া যাইতে পারিলে বাঁচে।

নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, কোথায় ছিলি রে?

ঘুমুচ্ছিলাম।

হুঁ, ঘুমোবার আর দিন পেলি না? বাড়িতে আজ এত উদ্যোগ-আয়োজন এত লোকজন, খাওয়া-দাওয়া। নরহরি ভ্রূকুটি করিলেন। আমি এদিকে ছটফট করে মরছি – তা কোন দিকে কিচ্ছু তোমার খেয়াল নেই।

শিবনারায়ণ হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আমার পাগল ভাইটি

আজ ক্ষেপে গিয়েছে রে। আমাদের নিত্যসম্বন্ধ—সেইটের পাকা বন্দোবস্ত না করে ছাড়বে না। যা বলে সেই রকম করে তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়োগে, বাবা।

নরহরি হুঙ্কার দিয়ে উঠিলেন। শুধু মুখে বললেই শুনব নাকি? দেবীর পা ছুঁয়ে বল্। ঐ মা-লক্ষ্মীটিকে আমি তোর জেঠার কাছ থেকে চেয়ে নিয়েছি। মা যা হুকুম চালাবেন—বল্, ঘাড় হেঁট করে সারাজীবন তাই মেনে চলবি—

হো-হো করিয়া উঠিলেন। শিবনারায়ণের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কেমন বন্ধু, শ্যামঠাকুর তোমাদের ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি বুঝতে পারছিলাম। এবার কেমন বাঁধনে বেঁধে ফেললাম, বল!

শ্যামকান্ত ঘুমে আর দাঁড়াইতে পারিতেছে না। কি-ই বা বয়স! বাবা যা বলেন, তাড়াতাড়ি কোন রকমে আবৃত্তি করিয়া সে পলাইয়া বাঁচিল।

নরহরি বাকি রাতটুকু মনের আনন্দে মন্দিরের চাতালে শ্যামা-সঙ্গীত গাহিয়া কাটাইয়া দিলেন।

(১০)

আরও মাসকয়েক কাটিল। প্রতি অমাবস্যায় মহাকালীর পূজা হয়। শ্যামঠাকুরের মন্দির তৈয়ারির প্রসঙ্গ আপাতত চাপা পড়িয়া গিয়াছে। নরহরি মন-রাখা কথা মাত্র বলিয়াছিলেন, শিবনারায়ণ তাহা জানেন। ইহা লইয়া তাই উচ্চবাচ্য করেন না।

নরহরি লক্ষ্য করিয়াছেন, দেবীর পূজার সময় শিবনারায়ণ উপস্থিত থাকেন না। খুঁজিয়া-পাতিয়া যদিই বা ডাকিয়া আনেন, বলির সময় তিনি চোখ বোজেন, দু হাতে কান চাপিয়া ধরেন।

নরহরি বলেন, ছি—ছি!

শিবনারায়ণ বলেন, কি করব ভাই, ঢাকের বাজনা সহ্য করতে পারি না—মাথার ভিতর কেমন করে ওঠে।

নরহরি ব্যথিত কণ্ঠে বলেন, শ্যামের বাঁশী তোমার মাথা খেয়ে দিয়েছে।

এক রাত্রে পূজার সময় সমস্ত বাড়ি পাঁতি-পাতি করিয়া খোঁজা হইল। শিবনারায়ণ নাই। অনেক কথা নরহরির কানে আসিয়াছে। তিনি আর অঞ্জলির মন্ত্র পড়িয়া উঠিতে পারেন না, চোখে জল আসিবার মতো হয়, গলা আটকাইয়া যায়। পূজা-শেষে তখনো অল্প রাত্রি আছে। কাহাকেও কিছু বলিলেন না, নিঃশব্দে তিনি চিত্রমারির খালের ধারে গিয়া দাঁড়াইলেন। হাঁ—মৃদঙ্গের আওয়াজ আসিতেছে বটে। কিছুদিন ধরিয়া যাহা শুনিতেছেন, তাহাতে আজ নিঃসন্দেহ হইলেন।

জলের উপর ঝুঁকিয়া-পড়া কেওড়া-ডালের সঙ্গে খেয়া-নৌকা বাঁধা আছে। তাহাতে চড়িয়া বৈঠার অভাবে দু-হাতে জল কাটিয়া অনেক কষ্টে বরণডাঙার পারে নামিলেন। হনহন করিয়া মাধবদাস বাবাজির আখড়ার দিকে চলিলেন।

গিয়া দেখিলেন—এতখানি তিনি কল্পনা করিতে পারেন নাই। অঙ্গনে সংকীর্তন হইতেছে—শ্যাম-রাধিকার নৌকাবিলাস। শিবনারায়ণের চোখে দরদর ধারা, সম্বিৎ নাই, আকুল হইয়া গায়ককেই এক-একবার আলিঙ্গন করিতেছেন। নরহরির চোখ জ্বলিয়া উঠিল। বজ্রকণ্ঠে ডাকিলেন, বন্ধু।

সে ডাক শিবনারায়ণের কানে গেল না। মাধবদাস বাবাজি তাকাইলেন। তটস্থ হইয়া তাড়াতাড়ি তিনি অভ্যর্থনা করিলেন, বসতে আজ্ঞা হোক চৌধুরি মশায়—

না।

সকল অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া তখনই অন্ধকার পথে নরহরি ফিরিলেন।

পরদিন সমস্তটা দিন কাটিয়া গেল, দুই বন্ধুতে কথাবার্তা নাই। দেখা হইলে নরহরি মুখ ফিরাইয়া চলিয়া যান। বিকালবেলা কাঁধে চাদর ফেলিয়া শিবনারায়ণ বাহির হইয়া গেলেন। নরহরি চাহিয়া দেখিলেন, দেখিয়া গুম হইয়া রহিলেন।

আগে সঙ্কোচ যদিই বা কিছু ছিল, ক্রমশঃ তাহা দূর হইয়া গেল। শিবনারায়ণ শুধু রাত্রিটা নয়—সকালে অঁনেক বেলা অবধি আখড়ায় পড়িয়া থাকেন। প্রজাপাটক দেখা পায় না, কাছারি বাড়িতে ক্রমশ তিনি দুর্লভ হইয়া উঠিতেছেন।

এক সন্ধ্যায় রওনা হইতেছেন, দেখিলেন বাহির হইতে দরজা বন্ধ। সবিস্ময়ে শিবনারায়ণ প্রশ্ন করিলেন, কে আছ?

দশ-পনের জন ঢালি জানলার কাছে মাথা নিচু করিয়া আসিল। ঢাল-সড়কি হাতে বাহিরে বসিয়া তাহারা পাহারা দিতেছে। শিবনারায়ণ খুব হাসিতে লাগিলেন, যেন কত বড় একটা মজার ব্যাপার। বলিলেন, আমাকে তোমরা কয়েদ করে রাখলে নাকি?

রঘুনাথ জিভ কাটিয়া সরিয়া গেল; চিন্তামণি উদ্দেশে বাহির হইতে গড় হইয়া প্রণাম করিল। বলিল, আমরা কিছু জানি নে কর্তা। চৌধুরিমশায় বলে দিলেন এখানে বসে থাকতে, তাই—

শিবনারায়ণ তেমনি হাসিতে লাগিলেন। মধুর স্নিগ্ধকণ্ঠে বলিলেন, চৌধুরিমশায় তো তোমাদের একলা মনিব নন, ওস্তাদ।

চিন্তামণি জিজ্ঞাসা করিল, খুলব দরজা?

শিবনারায়ণ গম্ভীর হইলেন। মুহূর্তকাল ভাবিয়া বলিলেন, না—সে হয় না। হুকুম আমাদের মধ্যে যে দেবে, রদ করতে পারে সে-ই। নরহরির হুকুম আমি ভাঙতে বলি কি করে? তোমরা সব বসে থাক, যেমন আছ।

রাত্রি নিষুপ্ত হইল। মালঞ্চে জোয়ার আসিয়াছে, তার মৃদু কল্লোল শোনা যাইতেছে। উহার চেয়েও মৃদুতর হইয়া বাতাসের সঙ্গে এক-একবার বরণডাঙার পার হইতে মৃদঙ্গ ও রামশিঙার আওয়াজ আসিতেছে। উজান বাহিয়া-যাওয়া যমুনার তটভূমিতে কেলিকদম্বের তলে শ্যামসুন্দর বুঝি নিশিরাত্রে বাঁশী বাজাইতেছেন। দরজা বন্ধ—সেখানে ছুটিয়া যাইবার উপায় নাই। শিবনারায়ণ বৃথাই বড় বড় পেরেক-আঁটা জানালায় হাত চাপড়াইয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

সকালবেলা শিবনারায়ণ নরহরিকে আর পাশ কাটাইতে দিলেন

না। বলিলেন, নরহরি ভাই, পাঁচখানা চকের সমস্ত প্রজা শাসিত হয়ে গেছে—এবার কি আমার পালা ?

গম্ভীরকণ্ঠে নরহরি বলিলেন, না, মাধবদাসের।

শিবনারায়ণ শিহরিয়া তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়িলেন।

না—না, স্বপ্নেও অমন কল্পনা কোরো না মহাপুরুষ।

নরহরির গর্বদৃপ্ত মুখে এক মুহূর্তে কাতর অসহায় ছবি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, মহাপুরুষ বই-কি! জোলো-ডাকাত—ঘরদোর সাজিয়ে দশজনের একজন হতে যাচ্ছি, মহাপুরুষ আমার সোনার ঘর পুড়িয়ে ছাই করে দিচ্ছেন, আমার সাধ-বাসনা ডুবিয়ে দিচ্ছেন—

ইদানীং নরহরির মনের জোর যেন কমিয়া যাইতেছে। যৌবন গিয়া প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছিয়াছেন, সেই কথা প্রায়ই মনে আসে। গলা ধরিয়া আসিল। চোখে পাছে জল আসিয়া যায়, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি সরিয়া গেলেন।

সে রাত্রিতেও শিবনারায়ণ তেমনি দোতলার ঘরে জানালার গরাদ ধরিয়া আকুলি-বিকুলি করিতেছিলেন। নিশীথে চারিদিক নিস্তব্ধ হইয়া গেলে তিনি কান পাতিয়া রহিলেন। কিন্তু মৃদঙ্গের আওয়াজ আসে না। কতক্ষণ তিনি জানালা ধরিয়া রহিলেন। সহসা দেখিতে পাইলেন, ওপারের আকাশ রক্তবর্ণ হইয়া গিয়াছে, রাত্রির গাঢ় অন্ধকার বিমথিত করিয়া আগুনের শিখা লকলক করিয়া জ্বলিতেছে। লোহার গরাদে আর তাঁকে ঠেকাইয়া রাখিতে পারে না, উন্মাদের মতো দরজায় লাথি মারিয়া ঘর ফাটাইয়া তিনি বারম্বার চিৎকার করিতে লাগিলেন, কে আছে—দুয়োর খোল। খোল—খোল—খুলে দাও শিগগির। নইলে ভেঙে ফেললাম।

খট করিয়া শিকল খুলিয়া গেল। কপাট খুলিয়া দিয়া মুখোমুখি দাঁড়াইয়া—আর কেহ নয়, স্বয়ং নরহরি। শিবনারায়ণের তিনি হাত ধরিয়া ফেলিলেন। হাত ছাড়াইয়া শুধু একটা কঠোর দৃষ্টি হানিয়া শিবনারায়ণ দ্রুত পায়ে নামিয়া গেলেন।

ভাব দেখিয়া নরহরির আতঙ্কের সীমা রহিল না। তিনি পিছু-পিছু ছুটিলেন।

কোথায় যাও?

শিবনারায়ণ অনেক দূর আগাইয়া গিয়াছেন। বারম্বার নরহরি ডাকিতে লাগিলেন, ফেরো বন্ধু, যেও না—

ঘাটে যে নৌকা সামনে পাইলেন, শিবনারায়ণ উঠিয়া বসিলেন। নজর শুধু ওপারের অগ্নিশিখার দিকে। কেমন করিয়া খাল পার হইলেন, কেমন করিয়া মাঠ ভাঙিয়া ছুটিয়া আখড়ায় পৌঁছিলেন, বলিতে পারেন না। গিয়া দেখিলেন, মাধবদাস বাবাজি অভিভূতের মতো দাঁড়াইয়া ধ্বংসলীলা দেখিতেছেন। আগুন লক্ষ নাগিনীর মতো ফুঁসিয়া বেড়াইতেছে। মাধবীকুঞ্জ গিয়াছে, মণ্ডপের চিহ্নমাত্র নাই, মন্দিরের খোড়ো-চাল চাঁচের বেড়া দাউ-দাউ করিয়া জ্বলিতেছে। তারই আলোয় অনতিস্ফুট দেখা যায়, অলঙ্কার ও পট্টবাসসজ্জিত হাস্যোদ্ভাসিত-শ্রীমুখ শ্যামসুন্দর-রাধারাণীর যুগল বিগ্রহ। হুড়মুড় করিয়া আড়া ভাঙিয়া পড়িল, বিগ্রহের কাপড়-চোপড় জ্বলিয়া উঠিল। মাধবদাস বুক চাপড়াইয়া আর্তনাদ করিয়া উঠিলেন, পুড়ে মরল, ঐ কাঁদছে ওরা—কাঁদছে, কাঁদছে—তোমরা এসো, বাঁচাও—

লেলিহান আগুনের মধ্যে অশীতিপর বাবাজি ঝাঁপ দিলেন, শিবনারায়ণ ঝাঁপ দিলেন, আরও অনেকে দিল। শ্যামঠাকুরের বিগ্রহ কোলে লইয়া শিবনারায়ণ দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন। ঠিক সেই মুহূর্তে মন্দিরের চাল ভাঙিয়া-চুরিয়া করাল অগ্নিগর্ভে গড়াইয়া পড়িল। শিবনারায়ণ এক লাফে উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলেন—দাঁড়াইতে পারিলেন না, ভূমিতে পড়িয়া গেলেন। অগ্নিদগ্ধ সর্বাঙ্গে বিষম জ্বালা করিতেছে, এতক্ষণে শিবনারায়ণের অনুভব হইল।

কলসি কলসি জল ঢালিয়া অনেক কষ্টে আগুন নেভানো হইল। তখন সকাল হইয়া গেছে। ছাই ঠেলিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে পাওয়া গেল দগ্ধাবশেষ মাধবদাসের গলিত মাংসপিণ্ড। রাধারাণীর প্রতিমা

শতখণ্ড হইয়া গিয়াছে। বাবাজি মরিয়া গিয়াও তার একটি টুকরা ফেলেন নাই, প্রাণপণে আঁকড়াইয়া আছেন।

সেদিন শিবনারায়ণ আর শ্যামগঞ্জে ফিরিলেন না। পর দিন না, তার পরের দিনও না। নক্ষত্র-খচিত আকাশের নিচে অন্যান্য ভক্তের সঙ্গে পাশাপাশি শুইয়া রাত কাটাইলেন।

ক্রমে নরহরির রাগ পড়িয়া আসিল। তিনি লোক পাঠাইলেন, লোক ফিরিয়া গেল। তারপর নিজে চলিয়া আসিলেন। ছলছল চোখে কাতর হইয়া ডাকিলেন, বন্ধু, বাড়ি এসো—

চলো—

খাল পার হইয়া নরহরির পিছু-পিছু নিঃশব্দে বাড়ি ঢুকিলেন। দু'টা দিন কাটিয়াছে, ইহারই মধ্যে আগেকার সে শিবনারায়ণ নাই—অনেক দূরের লোক হইয়া গিয়াছেন। বাপের দশা দেখিয়া মালতী অবধি ফোঁপাইয়া কাঁদিতে লাগিল। নরহরিও যেন তাঁর মুখের দিকে চাহিবার ভরসা পান না।

শিবনারায়ণ বলিলেন, নরহরি ভাই, আমার শ্যামঠাকুর গৃহহীন। রাধারাণী ভয় পেয়ে বাবাজির সঙ্গে পালিয়ে গেছেন। লোকে বলে, তোমার কাজ।

নরহরি অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন। মুহূর্ত পরে বলিলেন, মহাকালীর অভিসম্পাত, বন্ধু। রক্তজবা পেলে মা খুশী হন, তোমার ঐ বোষ্টমেরা ঠাট্টা করে সেই জবার নাম দিয়েছে ওড়ফুল। আর মাকে ওরা কি বলে শুনেছ তো?

চোখাচোখি হইল। ইষ্টদেবীর অপমানের কথা উল্লেখ করিতে নরহরির মুখে-চোখে আগুন ঠিকরিয়া পড়িতেছে। বলিতে লাগিলেন, ঘৃণায় ওরা মায়ের নামটাও উচ্চারণ করে না। মহাকালীর নাম দিয়েছে মহাভূষা—

শিবনারায়ণ বলিলেন, অন্যের ঘাড়ে দোষ চাপাচ্ছ কেন? নিজের ঘর পুড়িয়ে আর একদিন বেরিয়ে এসেছিলে। ঘর পোড়ান তোমার স্বভাব।

তারপর দৃঢ় অথচ উত্তেজনাবিহীন কণ্ঠে বলিতে লাগিলেন, রাধারাণীর আমি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করব, আর শ্যামঠাকুরের মঠ-বাড়ি তৈরি করে দেব ঠিক ঐ রকম—

মহাকালীর বিশাল মন্দিরের দিকে আঙুল নির্দেশ করিয়া শিবনারায়ণ চুপ করিলেন।

মায়ের মন্দিরের মতো হবে স্যাড়ানেড়ির মঠ?

অসহ্য উত্তেজনায় নরহরির মুখে কথা ফোটে না। ক্ষণপরে হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন, আর তুমি বোধ হয় কণ্ঠি পরে ভিক্ষের ঝুলি নিয়ে 'জয় রাধেকৃষ্ণ' বলে বেরিয়ে পড়বে। এই স্থির করেছ, বন্ধু?

দুই অঞ্চলের দু'টি মানুষ এক রাত্রে মালঞ্চের উপর কোলাকুলি করিয়াছিলেন। তারপর শ্যামগঞ্জের প্রাচীন পাষাণ-অলিন্দে পাশা-পাশি তাঁদের কত দিন-রাত্রি কাটিয়াছে। চক বন্দোবস্তের সময়, চক হাসিলের মুখে, মাঠে-ঘাটে জলে-জঙ্গলে নরহরি কত সাধ-বাসনার গল্প করিয়াছেন শিবনারায়ণের সঙ্গে, দু'টি আত্মার নিত্যসম্বন্ধের গর্ব করিয়াছেন। মাধবদাসের আখড়া পুড়িবার মাস ছয়-সাতের মধ্যে সব-কিছুরই মীমাংসা হইয়া গেল। পাঁচখানা চকের মধ্যে দু'খানা আর নগদ কিছু অর্থ শিবনারায়ণের ভাগে পড়িল। তাই লইয়া একদিন খুব সকালে তিনি চিতলমারি খাল-ধারে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

পরবর্তীকালে শিবনারায়ণের পৌত্র দেবনারায়ণ তার বন্ধু-বান্ধব মহলে এই ঘটনা লইয়া অনেক হাসাহাসি করিয়াছে। কালী ভজিব কি কৃষ্ণ ভজিব—এই লইয়া মানুষ মারাত্মক বিরোধ করিয়াছে, পাথরের দেবতারা এমন জীবন্ত ছিলেন সেই সাবেক আমলে!

শিবনারায়ণ খেয়াঘাটে আসিয়া দাঁড়াইলেন। নরহরি পিছন হইতে ডাক দিলেন, আর তোমার মেয়ে মালতী যে ঘুমুচ্ছে—তাকে ডেকে তুললে না?

শিবনারায়ণ হাসিয়া বলিলেন, তুমি তাকে চেয়ে নিয়েছ, তোমার

কাছেই থাকুক। আমার ঘর-বাড়ি নেই, চৌধুরি-বাড়ির বউকে কোথায় নিয়ে তুলব? শ্যামকান্তর বিয়ের দিন নেমন্তন্ন কোরো—এই একটা কেবল অনুরোধ রইল হরি-ভাই।

কালীর কিঙ্কর নরহরি চৌধুরি। সহসা কি বুঝি চোখে আসিয়া পড়িল, কোঁচার খুঁট খুলিয়া নরহরি চোখ মুছিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, ন্যাড়ানেড়ির মেয়ে চৌধুরী-বাড়ির বউ হবে—ক্ষেপেছ তুমি?

খেয়াল ছিল না, শিবনারায়ণ একা নন—সঙ্গে সৌদামিনী আর কীর্তিনারায়ণ। ভাঁটা সরিয়া গিয়া তখন বালুচরের অনেকখানি অনাবৃত হইয়া গিয়াছে—খেয়াল হয় নাই, সেই বালুচর ভাঙিয়া পিছন দিকটায় সদ্য-নিদ্রোত্থিত মালতী ও শ্যামকান্ত চলিয়া আসিয়াছে। ফিসফিস করিয়া মালতী কি বলিতেছিল শ্যামকান্তকে। নরহরি গলা খাটো করিয়া আস্তে বলেন না তো কোন কথা—

ন্যাড়ানেড়ির মেয়ে হবে চৌধুরি-বাড়ির বউ?

মালতী মুখ ঘুরাইয়া শ্যামকান্তকে পিছন করিয়া দাঁড়াইল। এই সময়ে অকস্মাৎ ঘোমটা খসিয়া পড়িল সৌদামিনীর। মুখের উপর যেন আগুন জ্বলিতেছে। নিজের ঘরে আগুন ধরাইয়া যে রকম অগ্নিশিখা নরহরি একদিন মুখ ফিরাইয়া দেখিয়া আসিয়াছিলেন, খালের এপারে দাঁড়াইয়া মাধবদাস বাবাজির আখড়া পুড়িবার সময় যে রকম আলো দেখিয়াছিলেন।

দৃঢ় পায়ে আগাইয়া আসিলেন সৌদামিনী; মালতীর হাত ধরিয়া তাকে নৌকার উপর তুলিলেন। খেয়ানৌকা ধীরে ধীরে খালের উপর দিয়া তাঁহাদিগকে বরণডাঙার পারে তুলিয়া দিল।

বুড়া চিন্তামণি কোথায় যেন গিয়াছিল আগের দিন। সে এসব কিছুই জানে না। দিন তিনেক পরে শ্যামগঞ্জে ফিরিয়া সেখান হইতে ধূলি-পায়ে একেবারে বরণডাঙায় চলিয়া আসিল।

শিবনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিলেন, খবর কি ওস্তাদ?

ফাঁকি দিয়ে এলে ছাড়ছি না হুজুর। এখনো অনেক বাকি—

লাঠি আর শেখাব না; সবাইকে ভুলে যেতে বলি। যা জানো সে সমস্ত ভুলে যাবে কিন্তু আমার এখানে এসে থাকলে।

অনেক বারই এ কথা হইয়াছে, কিন্তু চিন্তামণি একবর্ণ বিশ্বাস করে না। গুণীন লোক সহজে কিছু দিতে চায় না ইহা সে আবাল্য দেখিয়া আসিতেছে। অনেক মিথ্যাভাষণ শুনিতে হয়, লাঞ্ছনা সহিতে হয় খাঁটি-বস্তু কিছু আদায় করিতে গেলে। চিন্তামণি বলিল, একলব্য আঙুল কেটে গুরুদক্ষিণা দিয়েছিলেন। আপনার যদি ইচ্ছে হয়—গোটা হাতখানা কেটেই আমি না হয় দক্ষিণা দেব। লাঠি তো হাত আমাদের—লাঠি ছেড়ে দেওয়া মানে ডান-হাত কেটে ফেলে দেওয়া। হুকুম করেন তো তা-ও করব।

ষাট বছরের বুড়ো ওস্তাদ নূতন পাঠ লইবার জন্য শিবনারায়ণকে গুরুমান্য দিয়া ছায়ার মতো সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে। এত কাল সাগরেদি করিয়া কি পাইয়াছে, সে-ই বলিতে পারে। কিন্তু ভরসা তিলমাত্র শিথিল হয় নাই। অমূল্য বিদ্যার ভাণ্ডারী শিবনারায়ণ সদয় একদিন হইবেনই, দেশ-বিদেশে কেউ যাহা জানে না—লাঠির সেই কৌশল তিনি শিখাইয়া দিবেন, চিন্তামণি ধন্য হইয়া যাইবে।

(১১)

পরবর্তী বছর কয়েকের ভিতর পর পর কতকগুলি ঘটনা ঘটিয়া শ্যামগঞ্জ-বরণডাঙার দুই পরিবারের মধ্যে ব্যবধান আরও বাড়িয়া গেল।

হঠাৎ একদিন নরহরি খবর পাইলেন, শিবনারায়ণ মারা গিয়াছেন। শ্যামঠাকুরের বিগ্রহ উদ্ধার করিতে গিয়া অগ্নিদগ্ধ হইয়াছিলেন, সর্বাঙ্গ জুড়িয়া ঘা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। শেষাশেষি শয্যাশায়ী হইয়া পড়িয়াছিলেন, প্রবল জ্বরে অবিরাম আর্তনাদ করিতেন,—এত কষ্ট পাইয়া গিয়াছেন যে অতি-বড় শত্রুর জন্যও মানুষ যেন সে কামনা না করে। প্রলাপের ঘোরে মালতীর বিয়ের কথা তুলিতেন, কাহাকে যেন সান্ত্বনা দিতেন—দুঃখ কোরো না,

জোলো-ডাকাতের ঘরে না গিয়ে রাজঘরণী হবে ও মেয়ে, আলো জ্বেলে বাজনা বাজিয়ে চতুর্দোলায় চড়ে রাজার ছেলে আসবে। কখনো কখনো নূতন মঠ গড়িবার কথা বলিতেন, বলিতে বলিতে মুমূর্ষুর চোখের সামনে যেন সদ্যসমাপ্ত অপরূপ এক মঠবাড়ির ছবি ভাসিয়া উঠিত। গৃহহারা শ্যামঠাকুর নূতন বেদিতে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, বিচূর্ণিত রাধারাণীর বিগ্রহ স্বর্ণমণ্ডিত হইয়া পাশে সমাসীন। মুখ উদ্ভাসিত হইত, চোখের তারা জ্বল জ্বল করিত, সকল রোগযন্ত্রণা যেন এক মুহূর্তে বিস্মৃত হইয়া বিপুল আনন্দে মাতিয়া উঠিতেন।

এ সমস্ত নরহরির লোক-মুখে শোনা। শিবনারায়ণ সেই যে চলিয়া গিয়াছিলেন, আর দেখা হয় নাই। অসুখ ইতিমধ্যে মারাত্মক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, এত কষ্ট পাইয়া গেছেন—কিন্তু ঘোষ-গিন্নির এমন পরিপাটি বন্দোবস্ত যে মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত কাকপক্ষীর মুখেও এতটুকু খবর শ্যামগঞ্জের এ-পারে পৌঁছে নাই। মৃত্যুর পরেও নয়। মালঞ্চের কূলে চিতায় যখন আগুন ধরাইয়া দিয়াছে, সেই সময় নরহরি কাহার মুখে যেন কথাটি শুনিলেন—ঘোষ-গিন্নি খবর দেন নাই। এমন সময়ে খবর পাইলেন যে একবার চোখের দেখা দেখিবারও উপায় নাই। বৈষ্ণবের স্ত্রী হইয়াও ঘোষ-গিন্নির চালচলন কঠিনতম শাক্তের মতো। নরহরিও কান পাতিয়া খবরটা লইলেন মাত্র, জিজ্ঞাসাবাদ করিয়া দুটো অতিরিক্ত কথা জানিয়া লইবার আর তাঁর প্রবৃত্তি হইল না।

আবার একদিন নৌকাপথে যাইতে নজর পড়িল, মালঞ্চের বালুচরের উপর যেখানে মাধব দাস বাবাজির সমাধি, তারই চারি-পাশে নানা আয়তনের অসংখ্য ঘর উঠিয়াছে। নরহরির ঢালিপাড়ার ঠিক উল্টা পারে। চিন্তামণি ইতিমধ্যে ছোটখাটো একটি দল জুটাইয়াছে, তাদের বসতি হইবে নাকি এই জায়গায়। কেন্দ্র-স্থলে নূতন মঠবাড়ি হইবে, শ্যামঠাকুর আর রাধারাণীর প্রতিষ্ঠা হইবে। শিবনারায়ণ মনের যে সাধ পূরণ করিয়া যাইতে পারেন নাই, সাধ্বী স্ত্রী তাহা সমাধা করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন। ভাল কথা

—কিন্তু আখড়া আগে যে জায়গায় ছিল, সেইখানে হওয়াই তো স্বাভাবিক—এত দূরে নদীর ধারে সরিয়া নূতন করিয়া পত্তন করিবার অর্থ কি? এক হইতে পারে, চিন্তামণি দলবল লইয়া পাহারা দিবে—বাহির হইতে আসিয়া পড়িয়া কেহ যাহাতে আর কখনো অনিষ্ট করিতে না পারে। সৌদামিনী লাঠির জোরে ঠাকুর ও ভক্তদের ঠেকাইবেন—এইখানে তাঁর তফাৎ দেখা যাইতেছে শিবনারায়ণের সঙ্গে।

আর একটা সন্দেহ নরহরির মনে উঠিল। ঐখানে সমারোহে সঙ্কীর্তন চালাইয়া তাঁকে জ্বালাতন করিবার মতলব নাই তো? সঙ্কীর্তন ভাল রকম তোড়জোড় করিয়া শুরু করিলে নরহরির এবার বাড়ি বসিয়াই কানে আসিবে, আন্দাজ হইতেছে। শুনিতে শুনিতে তিনি হয়তো একদিন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিবেন, ঢালিরা হয়তো খাল ঝাঁপাইয়া ঢাল-সড়কি লইয়া পড়িবে তাঁর ইঙ্গিত পাইয়া। ঘোষ-গিন্নি সত্য সত্যই একটা হাঙ্গামা বাধাইতে চান নাকি? নরহরি চান না। শিবনারায়ণ নাই, কীর্তিনারায়ণ নাবালক, আর সৌদামিনী যতই দেমাক করিয়া বেড়ান—অবলা নারী ছাড়া কিছু নন। উপযুক্ত প্রতিপক্ষ বরণডাঙায় কে আছে?

এপারে চিতলমারি ও মালঞ্চের মোহানায় নরহরির ঢালিপাড়া ইতিমধ্যে জাঁকিয়া উঠিয়াছে। শিবনারায়ণ নাই, বাধা দিবার আর কেহ নাই। এই দিক দিয়া নিরঙ্কুশ হইয়া নরহরি অনেকখানি সোয়াস্তি পাইয়াছেন। দিনের অধিকাংশ সময় তিনি ঢালিপাড়ায় থাকেন। মালঞ্চের উপর—বয়স হইয়াছে বলিয়া এবার নিজে তত বেশি নন—তাঁর ঢালির দল আবার ঘোরাফেরা শুরু করিয়াছে। শিবনারায়ণের খাতিরে এ পথ ছাড়িয়া দিয়াছিলেন, কিন্তু ভিতরের আগুন নেভে নাই—আগ্নেয়গিরির মতো প্রচ্ছন্ন ছিল, বাধা-বিমুক্ত হইয়া আবার ভয়ঙ্কর হইয়াছে। এ-অঞ্চলে তাঁকে কেহ আর এখন নরহরি চৌধুরি বলে না, নূতন নামকরণ হইয়াছে বাঘাহরি, সংক্ষেপে বাঘা চৌধুরি।

চৌধুরির ঢালা হুকুম, ঢালিপাড়ায় সম্বৎসরে যত ধান লাগে সমস্ত আসিবে তাঁর সদরবাড়ির গোলা হইতে। আট-দশখানা সাঙড়-বোঝাই ধান আসিয়া খালের মুখে লাগে। দিন পাঁচ-সাত ধরিয়া ধীরে সুস্থে ধামা-ভরতি ধান নামানো চলিতে থাকে। ওপারে চিন্তামণির দলবল লুব্ধ চোখে তাই তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে। কোনরূপ গোপন কথাবার্তা রঘুনাথের সঙ্গে হইয়াছে কিনা বলা যায় না—ক্রমশ দেখা গেল, একজন দু-জন করিয়া খাল পার হইয়া এপারে ঘর বাঁধিতেছে। খবর শুনিয়া নরহরির উৎসাহ আরও বাড়িল। আগে ধানের নৌকা আসিত বছরে একবার, এখন যখন-তখন আসিয়া ভিড়িয়া থাকে। ওপার শূন্য হইয়া এপারে ঘরের সংখ্যা বাড়িতে লাগিল; তিন চার 'শ ঘর হইয়া দাঁড়াইল। নরহরি নিজে আসিয়া কোথায় কোন নূতন ঘর বাঁধা হইবে তদারক করিয়া যান। অনেকেই আসিল, আসিল না সেই একটা লোক—বুড়া ওস্তাদ চিন্তামণি। আর আসিল না, নিতান্তই যাদের চিন্তামণিকে ছাড়িয়া আসার উপায় নাই।

মেয়েদের কাজ, ধান ভানিয়া কুটিয়া সিদ্ধ করা। আর ভীমরুলের ডিমের মতো বাঘা চৌধুরির সেই মোটা মোটা রাঙা ভাত খাইয়া জোয়ানগুলার বুকের মধ্যে টগবগ করিয়া রক্ত ফোটে, গাঙের ধারে ধারে হাল্লা করিয়া পাঁয়তাড়া কষিয়া বেড়ায়, চরের উপর বিশ-পঞ্চাশ জনে কুস্তি লড়ে, ঢাল-সড়কির খেলা করে, হাতের তাক কেমন হইল তাই পরীক্ষা করে কখনো বাদার বুনো-হাঁস কখনো বা বোঝাই নৌকার উপর। লকগেট-ওয়ালা নূতন এক খাল হইবে, তার জন্য জমি জরিপ হইয়া গিয়াছে। খাল কাটা হইয়া গেলে খুব সুবিধা হইবে, কিন্তু আপাতত মালঞ্চ ছাড়া ব্যাপারি-নৌকার আর যাইবার পথ নাই।...দিব্য দাঁড় ফেলিয়া সারি গাহিতে গাহিতে নৌকা চালিয়াছে, হঠাৎ বোঁও—বোঁও—শব্দে মাঝিমাল্লার উপর পোড়া-মাটির গুলি-বৃষ্টি, আর সঙ্গে সঙ্গে মোহানার দিক দিয়া বিকট অট্টহাসি। অচৈতন্য দেহ গলুই হইতে জলে পড়িয়া টানের মুখে

পাক খাইয়া অদৃশ্য হইয়া যায়, অমনি চরের উপর হইতে দশ-বিশ জন ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সাঁতরাইয়া খালে খালে নৌকা লইয়া কোথায় যে উড়িয়া চলে, সে নৌকার আর কোন সন্ধান হয় না।

শিবনারায়ণ বলিতেন, দিনকাল বদলাইয়াছে। কিন্তু নরহরি বিগত দিনের মুখে রশি পরাইয়া টানিয়া হিচড়াইয়া ফিরাইয়া আনিবেনই। শ্যামশরণের আমল আবার আসিবে।

ইহারই মধ্যে ঢোলের বাজনা শুনিয়া নরহরি খবর লইলেন, মালতীর বিয়ে। সৌদামিনী যেন মন্ত্রবলে সমস্ত করিয়া যাইতেছেন— অন্তঃপুরিকা নারীর পক্ষে কি করিয়া ইহা সম্ভব হয়, নরহরি ভাবিয়া পান না। এক বিপুল শক্তি দৈত্য যেন তাঁর আজ্ঞাবহ, মুখের কথা মুখে থাকিতেই ঈপ্সিত বস্তু জুটাইয়া আনিয়া দেয়। দৈত্যটি চিন্তামণি—বুড়া বয়সে সে নব-যৌবন ফিরিয়া পাইয়াছে নাকি? ঐ ক'বছরের মধ্যে শিবনারায়ণের কাছ থেকে কি পাইয়াছে—যে জন্য তার কৃতজ্ঞতার অবধি নাই?

সৌদামিনীর সম্বন্ধেও আশ্চর্য খবর আসে। শ্যামগঞ্জে থাকিতে তিনি ঘরের কাজকর্ম লইয়া থাকিতেন, অন্দরবাড়ি হইতে তাঁকে একদিনের জন্য কেউ বাহির হইতে দেখে নাই। এখন নাকি বরণডাঙায় নূতন কাছারি-ঘরের একদিকে চিক টাঙানো হইয়াছে, সকালে স্নান-আহ্নিক সারিয়া প্রতিদিন সেইখানে আসিয়া বসেন। যে ছ-খানা চক বরণডাঙার ভাগে পড়িয়াছে, তার প্রত্যেকটি জমার পাই-পয়সার হিসাব পর্যন্ত তাঁর নখাগ্রে। সম্পত্তি-ঘটিত সমস্ত খুঁটিনাটি কাজ তাঁকে নিজে করিতে হয়। তাছাড়া করিবেই বা আর কে? এইসব সমাধা করিয়া তারপর আবার স্নান করিয়া আসিয়া নিজের হবিষ্যান্ন চাপান। খাওয়া-দাওয়া শেষ হইতে এক একদিন একেবারে বেলা পড়িয়া যায়।

মালতী এমন কি অরক্ষণীয়া হইয়া উঠিয়াছে যে শিবনারায়ণের বার্ষিক শ্রাদ্ধ চুকিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গেই পাত্র জুটাইয়া আনা হইল?

নরহরির উপর আক্রোশে নিশ্চয়ই। কিন্তু নরহরি কি জানিতেন, মাধবদাসের জলন্ত আখড়ার মধ্যে শিবনারায়ণ ঢুকিয়া পড়িবেন? শিবনারায়ণের মৃত্যুর কারণ তাঁর নিজেরই হিতাহিত-জ্ঞানশূন্যতা। অথচ সৌদামিনী ঠাকরুন নরহরিকে এতবড় শত্রু ঠাওরাইয়াছেন যে মেয়ের বিয়ের লৌকিক নিমন্ত্রণটা পর্যন্ত করিলেন না। করিলেও যাইতেন না অবশ্য—তাঁকে অপমান করার জন্যই তাড়াতাড়ি এই অনুষ্ঠান, ইহার মধ্যে হাস্যাস্পদ হইতে কেন যাইবেন? যারা জানে, চোখ ঠারিয়া নিজেদের মধ্যে বলাবলি করিবে—আর আজকাল তো নরহরির মন-মেজাজের ঠিক নাই, রাগের বশে শুভ ক্রিয়া-কর্মের মধ্যে হঠাৎ কোন বিপর্যয় ঘটাইয়া বসা অসম্ভব নয় তাঁর পক্ষে। ঘোষ-গিন্নি নিমন্ত্রণ করেন নাই—চমৎকার করিয়াছেন, অতি উত্তম কাজই করিয়াছেন—নরহরিকে আর চক্ষুলজ্জার দায়ে ঠেকিতে হইল না।

মালঞ্চ বাহিয়া বরণডাঙ্গার ঘাটে খানচারেক নৌকা লাগিল—বর ও বর যাত্রীরা আসিয়াছেন। সকাল সকাল আসিয়া পড়িয়াছেন—সন্ধ্যা না হওয়া পর্যন্ত নৌকায় বসিয়া থাকিবেন, নামিবেন না। সন্ধ্যার পর ঘন ঘন গেঁটেবন্দুক ফুটিতে লাগিল, বারোটা ঢোল-কাঁসির সমবেত বাজনা, চরকিবাজি হাউইবাজি আর পল্তার আলোয় চারিদিক মাত করিয়া তুলিল। বরণডাঙার ঘোষ-বাড়ি ঘাট হইতে রশিটাক মাত্র, তবু পালকির ব্যবস্থা হইয়াছে বর ও বিশিষ্ট বরযাত্রীদের জন্য। এইটুকু পথ এক দণ্ডে ফুরাইয়া যায়, সেজন্য মালঞ্চ আর চিতলমারির কূলে কূলে ক্রোশ দুই পথ ঘুরিয়া প্রহরখানেক রাত্রে মিছিল বিয়ে-বাড়ি পৌঁছিল।

সমস্ত ঢালিপাড়া খাল-ধারে ভাঙিয়া আসিয়াছে; দু-চোখ মেলিয়া ওপারের বাজি বাজনা দেখিতেছে। মিছিল চলিয়া গিয়াছে, তখনও তারা দাঁড়াইয়া আছে। নরহরি পিছন দিক হইতে আসিয়া রঘুনাথের গা ঘেঁসিয়া দাঁড়াইলেন। রঘুনাথ চমকিয়া ফিরিতে তিনি বলিলেন, এপারে আমরাও করব সর্দার, ওর বিশগুণ করতে হবে—তুমি সেই যোগাড়ে লেগে যাও।

রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করিল, সম্বন্ধ ঠিকঠাক হয়ে গেল নাকি চৌধুরি মশায় ?

হয়নি। কিন্তু আর বাছাবাছি করব না—কাল তোমাকে কসবায় যেতে হবে। শশিশেখর উকিলের নামে চিঠি দিয়ে দেব, ওরা এসে পাকাদেখা দেখে যাক।

কন্যাপক্ষ-বরপক্ষ সহসা স্তম্ভিত হইয়া গেল—চোখে দেখিয়াও বিশ্বাস হইতে চায় না—নরহরি চৌধুরি। গলবস্ত্রে সাধ্য-সাধনা করিয়া যাঁকে পাওয়া যায় না, উপযাচক হইয়া তিনি বরণডাঙায় চলিয়া আসিয়াছেন।

কীর্তিনারায়ণ আসিয়া আহ্বান করিল, ঘরে এসে বসুন।

নরহরি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তার আপাদ-মস্তক চাহিয়া চাহিয়া দেখিতেছেন। বলিলেন, মাথায় টিকি গলায় কণ্ঠি কই, বাবা ? মানাচ্ছে না যে।

হঠাৎ তার ডান হাত টানিয়া লইয়া আগেকার একদিনের মতো টিপিয়া টিপিয়া দেখিলেন। প্রশ্ন করিলেন, খুব খোল বাজাচ্ছ বুঝি মঠে ? লাঠি ধরলে বাপকে ছাড়িয়ে উঠতে পারতে, তা শুধু খোল বাজিয়েই কচি হাতে কড়া পড়ে গেল।

নিশ্বাস ফেলিয়া নরহরি চুপ করিলেন। কীর্তিনারায়ণ হাত ছাড়াইয়া লইল। বাপের মৃত্যুর পর হইতে সে-ও এখন আর ভাল চোখে দেখিতে পারে না নরহরিকে।

কীর্তিনারায়ণ বলিল, ঘরে আসুন। মা ঐ দাঁড়িয়ে রয়েছেন। তিনি আসতে পারেন না তো, আমায় পাঠিয়ে দিলেন।

ঘরের ভিতর সৌদামিনী অপেক্ষা করিতেছিলেন ; নরহরি গিয়া ম্লান হাসিয়া ছড়া কাটিলেন, সেধে এসে পাতলাম পাত—কোন বেহায়া না দেবে ভাত ? বিনি-নেমন্তন্নে চলে এসেছি ঘোষ-গিন্নি, ভাত দেবেন না চিন্তামণিকে লেলিয়ে দেবেন বলুন ? তবে বোষ্টম-লেঠেলের আর যাই থাক, হাতে লাঠি থাকবে না—এই ভরসায় একা একা চলে এসেছি।

চিন্তামণি তটস্থ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, তার দিকে বক্রদৃষ্টিতে চাহিয়া নরহরি কথা শেষ করিলেন। এতদিন তিনি বউঠান বলিয়া ডাকিতেন, আজ ঘোষ-গিন্নি বলিয়া সম্পর্কহীনতা প্রকট করিতে চান। সৌদামিনী ইহা যেন কানেই নিলেন না—সহজভাবে বলিলেন, অনুগ্রহ করে যখন এসেছেন, দেখে শুনে শুভকর্ম সমাধা করে দিয়ে যেতে হবে।

নরহরি তিক্ত কণ্ঠে বলিলেন, সোনার মেয়ে হাত-পা বেঁধে জলে ফেলে দিচ্ছেন, আমি দেখব শুনব বলে কিছুই তো বাকি রেখে দেন নি।

সৌদামিনী কঠিন দৃষ্টিতে এক পলক তাকাইলেন, কিন্তু কণ্ঠস্বর তেমনি শান্ত ও স্বাভাবিক। বলিলেন, জামাই দেখেছেন আপনি?

দেখতে খারাপ বলি কি করে—রাঙা-মূলো। কিন্তু বয়সের যে গাছ-পাথর নেই! এ হচ্ছে ঘোষ-গিন্নি, শিবের হাতে গৌরী সমর্পণ করা।

সৌদামিনী বলিলেন, গৌরীর ভাগ্য—শিব আসছেন তার অদৃষ্টে।

তারপর গলা খাটো করিয়া বলিলেন, যে যাই হোক—মেয়ে ঐ পাশের ঘরে কনে-পিঁড়িতে বসে। তার ভাবি-স্বামীর সম্বন্ধে এসব আলোচনা এখানে হওয়া উচিত নয়। বাইরে গিয়ে আপনি অতিথিদের দেখাশুনা করুনগে চৌধুরি মশায়।

অর্থাৎ যতক্ষণ আছি, বাইরে বাইরেই থাকতে হবে?

মালতীর বাপ নেই, বাপের বন্ধু হিসাবে তা-ই তো উচিত। ভিতর সামলাতে হিমসিম হচ্ছি, আপনি ওদিককার ভার নিলে নিশ্চিন্ত হতে পারব।

বলিয়া তিলমাত্র বিলম্ব না করিয়া সৌদামিনী চলিয়া গেলেন। হতভম্বের মতো মুহূর্তকাল চাহিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে নরহরি বাহির হইয়া গেলেন। অন্ধকারে খাল পার হইয়া চুপি-চুপি শ্যামগঞ্জে ফিরিলেন।

শ্যামগঞ্জেও বিয়ের বাজনা বাজিয়া উঠিল মাস দুয়েকের মধ্যে। বধূর নাম সরস্বতী—কসবার শশিশেখর মজুমদার উকিলের বোন। বিপুল সমারোহে বর-বউ শ্যামগঞ্জে ফিরিল। বরণডাঙার পারে কিন্তু একটা লোক দাঁড়াইয়া নাই। সন্ধ্যার পর বিশেষ করিয়া আজিকার দিনটায় ঘরে ঘরে মানুষ যেন ঝাঁপ আঁটিয়া বসিয়াছে। ছেলের বিয়ে দিয়া বউ লইয়া বাড়ি ফিরিবার সময় নরহরির মন দুঃখে ভরিয়া গেল। এত আয়োজন ওপারের কেউ একটা বার তাকাইয়া দেখিল না। এই ব্যাপারেও যেন পরাজয় ঘটিল তাঁর।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(১)

বড় বর্ষা। মালঞ্চ উন্মত্ত ঢেউ ভাঙিতেছে। ঢেউ অবিশ্রান্ত পড়িতেছে বউভাসির চকের নূতন বাঁধে। বাঁধ ঠেকাইয়া রাখা দায়। মাটি কাটিবার লোক ডাকিতে মালাধর গোমস্তা পাইক পাঠাইল। পাইকটি নূতন—অতশত খবর রাখে না। হাঁকাহাঁকি করিয়া একেবারে নরহরির ঢালিপাড়ায় গিয়া উঠিল।

মাটি কাটতে পারিস ?

জবাব পাওয়া গেল—গলা কাটতে পারি। এবং প্রমাণস্বরূপ একজন আসিয়া সত্যসত্যই পাইকের গলা চাপিয়া ধরিল।

বাঁচাইয়া দিল রঘুনাথ। কোন্ দিকে যাইতেছিল, হাঁ-হাঁ করিয়া ছুটিয়া আসিল।

করিস কি ? করিস কি ভানুচাঁদ ? চকের মালিক চৌধুরি মশায়ের কুটুম্ব হন যে। বিদেশি পাইক—ইনি হলেন আমাদের অতিথি।

ভানুচাঁদ তখন গলা ছাড়িয়া হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, কুটুম্বর লোকের সঙ্গে ঠাট্টা করলাম একটু—

কাঁপিতে কাঁপিতে পাইক মহাশয় তখন কোন গতিকে বক্তব্য

শেষ করিল। রঘুনাথ সমস্ত বৃত্তান্ত বুঝাইয়া দিল, আমরা মাটি কাটি নে। বাঘা চৌধুরির ধান আসে—ডাক পড়লে খাজনা দিতে যাই। আমরা ঢালি—মুটে ঐ ওপারের ওরা। ভ্রূ কুঁচকাইয়া ব্যঙ্গের সুরে বলিতে লাগিল, পেটের দায়ে ওরা মোট বয়, মাটি কাটে, কত কি করে। আপনি ভুল করে এ পাড়ায় এসেছেন, পাইক মশায়।

বলিয়া সগর্ব হাসিয়া রঘুনাথ ওপারের চিন্তামণির দলবল দেখাইয়া দিল।

ওপারের লোক খবর পাইয়া মাটি কাটিতে আসিল। উহারা যখন ঘামে-মাটিতে ভূত সাজিয়া কোদাল পাড়িতে থাকে, তখন রঘুনাথের দল তৈল-চিক্কণ চুলে দিব্য টেরি কাটিয়া শিস দিতে দিতে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া বেড়ায়। কাজের শেষে শ্রান্ত পায়ে ওপারের দল ফিরিয়া যায়, ঘরে ঘরে ঢোল পিটাইয়া এপারে তখন সঙ্গীত শুরু হইয়াছে।

পাইকের কাছে রঘুনাথের সগর্ব উক্তিটা ক্রমশ মুখে মুখে ছড়াইয়া পড়িল। শেষে সৌদামিনীরও কানে পৌঁছিল। চিন্তামণিকে ডাকিয়া আনিয়া তিনি বলিলেন, আমার গোলা-ভরা ধান নেই ওস্তাদ, কিন্তু ভক্তদের জন্য কর্তা ঐ অতিথিশালা গড়েছিলেন। আমার বাপধনেরা সব ঐখানে এসে থাক। শাক-ভাত একসঙ্গে সকলে ভাগ করে খাওয়া যাবে।

ইহার উপর আর কথা নেই। চিন্তামণি ছোট দলটি লইয়া ঘোষ-বাড়িতে উঠিল। ওপার একেবারে উৎখাত হইয়া গেল। ঢালি বলিতে যা রহিল সমস্ত নরহরির। বাঘা চৌধুরি মালঞ্চের একেশ্বর হইয়া পড়িলেন। সে এমন হইয়া উঠিল, দেশ-বিদেশের ব্যাপারিরা যাইবার মুখে ঘাটে নৌকা বাঁধিয়া ভক্তিভরে মোহর দিয়া চৌধুরি মহাশয়কে প্রণাম করিয়া যায়। বাঘাহরির নামে সরকারি খেয়াতেও পয়সা লাগে না। একবার একটা পশ্চিমি লোক কোন একটা পারঘাটের ইজারা লয়। চৌধুরিবাবুদের মাহাত্ম্য তার কানে গিয়াছিল। কিন্তু একদিন আধময়লা কাপড়-পরা ইয়ার-গোছের এক

ছোকরা পারানি পয়সা না দিয়া বিনাবাক্যে চলিয়া যায় দেখিয়া প্রতিবাদ করিয়া তাকে বলিল, সবাই মিলে নরহরি চৌধুরির দোহাই পাড়লে আমার কি করে চলে বাপু? ফিরবার সময় লিখন নিয়ে এসো, নইলে পয়সা লাগবে।

ছোকরা মুখ ফিরাইয়া কহিল, লিখন সঙ্গেই আছে চাঁদ আমার। এবং বাঁ-হাতখানা মাঝির গলায় তুলিয়া অবলীলাক্রমে তাকে জলের মধ্যে গোটা দুই-তিন চুবানি দিয়া হাসিয়া দু'হাত সামনে প্রসারিত করিয়া বলিল, একটা কেন—আমার এই দু-দুটো লিখন।

তারপর আপন মনে শিস দিতে দিতে সে চলিয়া গেল।

পর দিন দেখা গেল, খেয়ার ঘাটে নৌকা নাই। দু-তিন'শ টাকা দামের নৌকা, বিস্তর চেষ্টা-চরিত্র করিয়াও কোন সন্ধান হইল না। সরকারি খেয়া বন্ধ রাখা চলে না, যে করিয়া হোক আবার নৌকার জোগাড় করিতে হইল। তার পরের দিন রাত্রে সেখানিও নিখোঁজ। তখন সেখানকারই একজন বাসিন্দা সৎবুদ্ধি বাৎলাইয়া দিল, ঢালি-পাড়ায় যাও গো মাঝি। সেদিন যে লোকের কাছে পয়সা চেয়েছিলে সে হল ভানুচাঁদ—বাঘাহরির বাছা খেলোয়াড়।

মাঝি তখন ভানুচাঁদের খোঁজ করিয়া হাতে-পায়ে ধরিয়া কাঁদিয়া পড়িল। ভানু বলিল, আমি কি জানি? যা বলবার বল গিয়ে সর্দারের কাছে। আমাদের বাপু হাত-পা-ই খোলা আছে—মুখ বন্ধ।

বস্তুত অনেক করিয়াও ইহার বেশি আর কিছু বাহির হইল না। যত জিজ্ঞাসা করে, হাসিয়া কেবল শিস দেয়, আর বুড়া-আঙুল নাড়িয়া নাড়িয়া গান করে, জানি নে—জানি নে—

তখন মাঝি রঘুনাথের কাছে গিয়া পড়িল।

নিতান্ত ভালমানুষ রঘুনাথ, যত্ন করিয়া শীতলপাটি পাতিয়া বসাইল, তামাক খাইতে দিল। কিন্তু আসল কথা উঠিলে সে-ও একেবারে আকাশ হইতে পড়িল। অত্যন্ত দরদ দেখাইয়া কহিল, আ-হা-হা···দু দু'খানা নৌকো। কেন, নোঙর করা ছিল না?

মাঝি বলিল, মোটা কাছিতে নোঙর তো ছিলই, অধিকন্তু লোহার শিকলে চাবি-আঁটা। আর তারাও পালা করিয়া দাওয়ায় সজাগ হইয়া ছিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না, অত বড় নোঙরটা উঠিল, চাবি-ভাঙিল,—কিন্তু এতটুকু শব্দ নাই, জলের উপর সামান্ত ছপছপানিও নয়, যেন মন্ত্রবলে কাজ হইয়া গেল।

রঘুনাথ হাসিয়া ফেলিল। বলিল, হয়—অমন হয়ে থাকে, মাঝি ভাই। জোয়ারের টানে হয়তো ভেসে গেছে কোন মুল্লুকে—

মাঝি খপ করিয়া তাহার পা জড়াইয়া ধরিল।

কোন্ মুল্লুকে ভেসে গেছে, সেইটে বলে দিতে হবে, সর্দার।

এবারে রঘুনাথ রীতিমতো রাগিয়া একটানে পা ছাড়াইয়া লইল। বলিল, আচ্ছা আহম্মক তো তুই। মুল্লুকের মালিক চৌধুরি মশায়। বলেন যদি—তিনি বলতে পারেন। আমরা নুন খাই, ডাক পড়লে খাজনা দিয়ে আসি—এই কেবল সম্পর্ক। আমরা কে ?

অতএব পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে আবার সেই নরহরি চৌধুরি পর্যন্ত ধাওয়া করিতে হইল। বয়সের সঙ্গে নরহরির রসিকতা বাড়িয়া গিয়াছে। নজর দিয়া পদপ্রান্তে হাতজোড় করিয়া বসিতে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

ওকি হল ? না না—উঠে বোসো, টাকাটা তুলে নাও। তুমি হলে কোম্পানির খেয়ার ইজারাদার—

কোম্পানির ইজারাদার নাক-কান মলিয়া বলিল, আর ঘাট হবে না চৌধুরি মশায়। আমি পারানির এক-শ গুণ ধরে দিচ্ছি।

নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার পারানি কত ?

ছু-পয়সা।

নরহরি হিসাব করিয়া কহিলেন, অর্থাৎ আরো টাকা ছুই আন্দাজ দিচ্ছ তুমি। আর তোমার নৌকা ছু-খানার দাম কত ?

সাড়ে তিন-শ, চার-শ—

নরহরি নরম সুরে কহিলেন, আমারও হাঙ্গাম আছে বাপু, লোকজন লাগিয়ে দেশদেশান্তর খুঁজতে হবে। তা যাকগে, তুমি

একখানারই দাম ধরে দিও। কোম্পানির ইজারাদার—যা হোক একটা খাতির-উপরোধ আছে তো।

অবশেষে একপক্ষের কান্নাকাটি অপর পক্ষের খাতির-উপরোধের ফলে একশ টাকায় রফা হইয়া দাঁড়াইল।

নরহরি বলিলেন, টাকাটা কি নিয়ে এসেছ বাপু?

খেয়ার ঘাট বন্ধ রাখিবার জো নাই, বড় মুশকিল হইয়াছে। মাঝি তাড়াতাড়ি বলিল, আমি কালই দিয়ে যাব—নিশ্চয়—

আমিও খোঁজ-খবর করে রাখব। বলিয়া এক মুহূর্ত লোকটার কাতর মুখের দিকে তাকাইয়া নরহরির সত্যসত্যই করুণা হইল। আর দেশদেশান্তর খোঁজের অপেক্ষা না রাখিয়া বোধ করি যোগ-প্রভাবেই বলিয়া দিলেন, চিতলমারির খালে দেড় বাঁক গিয়ে যে বড় কেওড়াগাছটা—তারই কাছে জলের তলায় খোঁজ করে দেখো। দু-খানা নৌকো এক জায়গায় আছে। যাও। আর টাকাটা কালই দিয়ে যেও—নয়তো, বুঝলে তো?

বলিয়া চৌধুরি মহাশয় হাসিয়া উঠিলেন।

মাঝি কৃতজ্ঞ অন্তরে চলিয়া গেল। সবই সে উত্তম রূপে বুঝিয়াছিল।

পরদিন কি একটা কাজে রঘুনাথ আসিয়াছিল। হাসিমুখে নরহরি কহিলেন, টাকা নেবে সর্দার? মাঝি বেটা পাইপয়সা অবধি শোধ করে দিয়ে গেছে। নিয়ে যাও না গোটাকতক।

রঘুনাথ ঘাড় নাড়িল।

চৌধুরি তবু বলিলেন, তুমি না নেও—ভানুচাঁদ আছে, আরও ছোকরারা আছে। কীর্তি তো ওদেরই। নিয়ে যাও আমোদ-স্ফূর্তি করবে।

হাসিয়া রঘুনাথ বলিল, ভানু কি আর আলাদা একটা কিছু বলবে? দলের লোক না? ও বড্ড ঝঞ্ঝাট চৌধুরি মশায়। টাকা নেও—হাটে-ঘাটে যাও—দরদস্তুর কর। অত ঘোর প্যাঁচ পোষায়

না আমাদের। আমরা সোজা মানুষ, সম্বৎসর খাওয়াচ্ছ তুমি—হুকুম হলে খাজনা দিয়ে যাব। ব্যস।

টাকা লইল না; প্রণাম করিয়া সে লাঠি তুলিয়া লইয়া রওনা হইল।

(২)

অগ্রহায়ণ মাস। বউভাসির চকের ধান কতক কাটা ঝাড়া হইয়াছে। কিন্তু দর কম বলিয়া আদায়পত্র বড় মন্দা। আবার যা আদায় হয়, বাঁধ মেরামতে ও আর দশটা বাবদে চলিয়া যায় তার অর্ধেকের বেশি। এবার তহ্শিল করিতে সদর-নায়েব হরিচরণ চাটুজ্জে মহাশয় স্বয়ং বরিশাল হইতে চলিয়া আসিতেছেন। চিঠি আসিয়াছে, তিনি রওনা হইয়া গিয়াছেন; আরও তিন-চারটা মহাল পরিদর্শন করিয়া তারপর এখানে আসিয়া পৌঁছিবেন। দু'টা জেলা পার হইয়া এতদূর অবধিও হরিচরণের নামডাক। অন্যান্য বার যারা আসিয়া থাকে, হরিচরণ সে ধরনের নহেন। মালাধর কিঞ্চিৎ শঙ্কিত হইয়া উঠিল।

যথাকালে সদর-নায়েব আসিলেন। রং কালো মাথায় টাক, খুব মোটা-সোটা চেহারা, পৈতার গোছাও চেহারার অনুপাতে। হুঁকা গড়গড়া, অনুকল্পে কলার পাতায় কলকে বসানো—সর্বক্ষণ যা হোক একটা কিছু চাই-ই। মালাধরের চণ্ডীমণ্ডপে মহাসমারোহে কাছারি চলিতেছে। আহারাদির ব্যবস্থা মালাধরের বাড়িতে। মালাধরের মেয়ে তরুবালা সমস্ত আয়োজন করিয়া চড়াইয়া দেয়; একটা হিন্দুস্থানি দারোয়ান আছে—সে-ই ভাত-তরকারিগুলা নামাইয়া জাত রক্ষা করে। মালাধর যেন রাজসূয় ব্যাপার লাগাইয়াছে। গোটা জেলার মধ্যে কইমাছ যত মোটা হইতে পারে, তারই বিপুল সংগ্রহ কলসি-ভরতি করিয়া জিয়াইয়া রাখা; ঘরকয়েক গোয়ালা প্রজা আছে, তারা সকাল-সন্ধ্যা দুধ-ঘি নিয়মিত যোগান দিয়া চলিয়াছে। ক্রমশ গঞ্জের দোকানের সন্দেশ-রসগোল্লাও দেখা দিতে

লাগিল। আয়োজন পরম সুন্দর। হরিচরণ মাঝে মাঝে ভদ্রতা করিয়া অনুযোগ করেন, কি শুরু করলে বল দিকি সেন মশাই? এত কি দরকার?

বিনয়ে গলিয়া গিয়া মালাধর বলে, আজ্ঞে না। এ কি আপনার যুগ্যি? ছাই ভস্ম—যা হোক মোটের উপর দু'টি পেট ভরে সেবা করেন।

সেবা আকণ্ঠ পুরিয়াই চলিতে লাগিল। কিন্তু বিকালে জমাখরচ মিলাইবার সময় সমস্তই বোধকরি একদম হজম হইয়া যায়।

এ যে ভয়ানক কাণ্ড, একেবারে পুকুর-চুরি। পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে হরিচরণ চমকিয়া ওঠেন। চার মজুরে তিন পয়সার তামাক পুড়িয়ে ফেলল? এ কক্ষনো হতে পারে না সেন মশাই।

মালাধর বিরক্ত হইয়া ওঠে। উত্তর দেয়, হয় মশাই, হিসেব করে দেখুনগে—চারজন কেন, এক একজনেই যে পাহাড় উড়িয়ে দিতে পারে।

একদিন সকালবেলা হরিচরণ নিজে বাঁধ দেখিতে গেলেন। আশ্চর্য কাণ্ড, পাঁচ-শ টাকার মাটি কাটা হইয়াছে, কড়াক্রান্তি অবধি হিসাব করিয়া দেখানো হইয়াছে, অথচ বাঁধের কোনোদিকে মাটি কাটার চিহ্ন নাই একটু।

মালাধর বলিল, গর্ত থাকিবে কি মশাই, আট-ন মাস হয়ে গেল—জোয়ার জলে সমস্তই তো ভরাট করে দিয়ে গেছে।

আর তোলা-মাটি বুঝি বৃষ্টির জলে ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে?

যে আজ্ঞে। বলিয়া মালাধর সপ্রতিভ হাসি হাসিল।

শোন সেন মশাই—হরিচরণ হাসিলেন না, রূঢ় কণ্ঠে কহিলেন, বাঁধ মেরামত বন্ধ আজকে থেকে। ভবিষ্যতে বিশেষ হুকুম না নিয়ে কাজে নামবে না।

তাহলে চকে লোনা জল ঢুকবে—

হরিচরণ বলিলেন, কিন্তু তা না হলে যে গোটা চকশুদ্ধ তোমার ট্যাকে ঢুকে যাবে।

মালাধর চুপ করিয়া গেল।

শীতের রৌদ্র সমস্ত নদীজল এবং দূরের গ্রামের গাছপালার উপর ঝকমক করিতে থাকে। চাষীর ছেলেরা খামারে হৈ-হৈ শব্দে গরু তাড়াইয়া মলন মলে। নদীর বালুতটের উপর দিয়া ভিন্ন গ্রামের একদল মেয়ে-পুরুষ জাগুলগাছি গ্রামে মেলা দেখিতে যায়। একজনে নাকি সুরে গান ধরিয়াছে, 'নাথ, রাম কি বস্তু সাধারণ?' ক্রমে দূরবর্তী হইয়া গান আর কানে আসে না। ইহারা তখন বাড়ি আসিয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ হরিচরণ প্রশ্ন করিলেন, তোমার মাইনে কত সেন মশাই?

প্রশ্নটা ঠিক কিভাবে হইল মালাধর ধরিতে পারিল না। নায়েবের মুখের দিকে তাকাইয়া করুণ গদগদকণ্ঠে কহিল, আজ্ঞে—আট টাকা মাত্তোর। ওরই মধ্যে খাওয়া।

হাসিয়া ফেলিয়া হরিচরণ বলিলেন, কিন্তু খাওয়া তো আট টাকার মতো নয়। আমাদের বাবুর বাড়িতেও যে এমনটা হয় না—

মালাধর তৎক্ষণাৎ জবাব দিল, ওসব শ্বশুর মশায় তত্ত্বে পাঠিয়েছিলেন।

তত্ত্বে সম্বৎসর চলে নাকি?

আজ্ঞে না, আর বেশিদিন চলবে না। বলিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া উদ্যত ক্রোধ সামলাইয়া মালাধর বাড়ির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল।

একদিন যথারীতি কাছারি চলিয়াছে, এমন সময় হুম-হাম করিয়া নরহরি চৌধুরির হাঙরমুখো পালকি উঠানে আসিয়া নামিল। যে যেখানে ছিল, তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল। নরহরি হাসিমুখে সকলের দিকে একবার তাকাইলেন। তারপর হরিচরণকে বলিলেন, গিন্নির বার্ষিক শ্রাদ্ধ। কয়েকটি ব্রাহ্মণভোজনের বাসনা হয়েছে। দয়া করে দুপুরবেলা একটু পদধূলি দেবেন নায়েব মশাই।

কাজকর্মের তাড়া আছে জানাইয়া চৌধুরি আর বসিলেন না, সরাসরি আবার পালকিতে গিয়া বসিলেন।

হরিচরণ এতক্ষণ পরে একবার গড়গড়ায় টান দিয়া দেখিলেন, আগুন নিভিয়াছে। দেখিয়া আবার সাজিতে হুকুম করিলেন। সেবারের সেই পাইকটি উপস্থিত ছিল, নিশ্বাস ফেলিয়া যেন হরিচরণেরই মনের কথাটা প্রকাশ করিয়া কহিল, সর্বরক্ষে!

দাখিলা লিখিতে লিখিতে বাঁকাহাসি হাসিয়া মালাধর বলিল, তাই কি বলা যায় রে ভাই?

উপস্থিত প্রজাপাটক সকলেই হাসিতে লাগিল। মালাধর বলিতে লাগিল, হাসির কথা নয় রে, দাদা। পুরাণে পড়েছ, ভগবানের দশ অবতার। তার ন'টা হয়ে গেছে—শেষ নম্বর ঐ উনি। আস্ত কলিঠাকুর। মাটি দিয়ে ছাঁচ তুলে রাখা উচিত।

দাখিলার বইটা হরিচরণের দিকে সহির জন্য আগাইয়া দিয়া মালাধর টাকাকড়ি বাজাইয়া গণিয়া হাতবাক্সে তুলিল। তারপর নায়েবকে লক্ষ্য করিয়া পুনশ্চ বলিতে লাগিল, বিদেশি মানুষ, ভাল করে চেনেন না তাই। বরকন্দাজ না পাঠিয়ে স্বয়ং সশরীরে ঐ যে আদর-আপ্যায়ন করে গেলেন—আমার কিন্তু সেই অবধি মোটে ভাল ঠেকছে না মশাই।

হয়েছে, হয়েছে—চুপ কর দিকি! হরিচরণ সগর্বে বলিতে লাগিলেন, নিজে আসবেন না কি! আমাদের বাবু যে চৌধুরি মশায়ের পিসতুত ভায়রা। খবর রাখ?

ভায়রার নিমন্ত্রণে যে প্রকার উল্লাস হইবার কথা, মুখভাবে অবশ্য তাহার একটুও প্রকাশ পাইল না। কিন্তু একঘর লোকের সামনে আলোচনা আর অধিক বাঞ্ছনীয় নয়। থামিতে গিয়াও তবু মালাধর বলিয়া উঠিল, ব্রাহ্মণ-সন্তান—বিদেশে এসেছেন। খেয়ে-দেয়ে এখন সুভালাভালি ফিরে আসুনগে। আমাদের আর কারও কিন্তু নেমন্তন্ন হয় নি—শুধু আপনার—

দুর্গানাম স্মরণ করিয়া হরিচরণ নিমন্ত্রণে চলিলেন।

বেলা পড়িয়া আসিল। জাগুলগাছি মেলায় আনুষঙ্গিক আজ পুতুলনাচ হইবে, তারা বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছে। দু'জন পাইক

পাগড়ি বাঁধিয়া লাঠি লইয়া রওনা হইবার উদ্যোগে উঠানে দাঁড়াইয়া আছে, মালাধর তাড়াতাড়ি বাড়ির মধ্য হইতে বালাপোষটা কাঁধে ফেলিয়া আসিল। এমন সময় হেলিতে দুলিতে হরিচরণ ফিরিয়া আসিলেন। দেখা গেল, আশঙ্কা অমূলক; দিব্য হাসিমুখে তিনি পান চিবাইতেছেন। হাসিয়া বলিলেন, বিদেশি লোক বলে খামকা একটা ভয় দেখিয়ে দিয়েছিলে সেন মশায়?

মালাধর সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল।

হরিচরণ বলিলেন, অতি মহাশয় ব্যক্তি। নরহরি চৌধুরির নাম-ডাকই শুনে আস্‌ছি, পরিচয় তো তেমন ছিল না। দেখলাম—হাঁ, মানুষ বটে একটা!

মালাধর সশঙ্কে জিজ্ঞাসা করিল, বৃত্তান্ত কি নায়েব মশায়?

গর্বিত স্বরে নায়েব বলিলেন, চর্ব-চোষ্য-লেহ্য-পেয়—আর কিছু নয়?

মালাধর গম্ভীর হইয়া ঘাড় নাড়িতে লাগিল। বলিল, কি জানি! শনির নজর পড়লে গণেশের মুণ্ডু উড়ে যায়, এই তো এতকাল জানা ছিল—

কিন্তু সত্যই, বিস্ময়ের পারাপার নাই।

দিনকয়েক পরে পুনরায় হাঙরমুখো পালকি এবং পুনশ্চ নিমন্ত্রণ। এবারে সুবর্ণলতার পুতুলের বিয়ে না অমনি কি একটা ব্যাপার। তারপর যাতায়াত শুরু হইল প্রায় প্রতিদিনই; উপলক্ষের আর বাছবিচার রহিল না। এদিকে বরিশালে জমিদারের নামে হরিচরণ গোটা গোটা লেপাফা পাঠাইতেছেন। মালাধর দাখিলা লেখে আর আড়চোখে তাকাইয়া তাকাইয়া দেখে। শেষে একদিন মরীয়া হইয়া বলিয়া বসিল, কথাটা একটু ভাঙুন দিকি নায়েব মশায়—

কি?

আজ্ঞে, আমরাও ছিটেফোঁটার প্রত্যাশী।

না—না—সে সব কিছু নয়।

হরিচরণ তখনকার মতো চাপা দিলেন বটে, কিন্তু মালাধর

ছাড়িবার লোক নয়। অতঃপর প্রায়ই কথাটা উঠিতে লাগিল। একদিন শেষে চুপিচুপি নায়েব বলিলেন, বউভাসির চক বাবুরা ছেড়ে দিচ্ছেন।

মৃদু হাসিয়া মালাধর বলিল, নিচ্ছেন নরহরি চৌধুরি—

বিস্মিত দৃষ্টি মেলিয়া হরিচরণ প্রশ্ন করিলেন, কোথায় খবর পেলে? তুমি জানলে কি করে?

মালাধর বলিতে লাগিল, আর কার মাথা-ব্যথা পড়েছে বলুন? কত চেষ্টা হয়েছে এর আগে। চকের দক্ষিণে চৌধুরির ঢালিপাড়া, গরজ চৌধুরির নয় তো কি আর গরজ হবে বরণডাঙাদের?

গরজ না ছাই। সে হিসেব-জ্ঞান থাকলে তো। তাচ্ছিল্যের সুরে হরিচরণ বলিতে লাগিলেন, চৌধুরির হাঁক-ডাক কেবল ঐ মুখে মুখে—হেনা করেঙ্গা, তেনো করেঙ্গা। বুদ্ধি-বিবেচনায় লবডঙ্কা। কত অজুহাত! বলে ও আমার পোষাবে না, আজ বাঁধ ভাঙল, কাল নোনা জল চোঁয়াচ্ছে। শেষকালে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলাম, কেন পোষাবে না মশাই? শ'দুই ঘর ঢালি চাকরান—সবাই তো ভাত গিলছে আর বগল বাজাচ্ছে; খাটিয়ে নিন একটু। আর আমাদের বাবুকেও বুঝিয়ে-সুজিয়ে লিখে দিলাম, আপদ-বালাই ঝেড়ে দিন চৌধুরির ঘাড়ে, কাঁহাতক হাঙ্গামা করে বেড়াবেন বছর বছর?

মালাধর তাড়াতাড়ি জিজ্ঞাসা করিল, দরদস্তুর হয়ে গেছে নাকি?

হরিচরণ বলিলেন, তা একরকম। তিন-চার শ'র এদিক-ওদিক আছে, হয়ে যাবে বই-কি।

আজ্ঞে, সে দরের কথা বলছি না। একটু হাসিয়া চোখ টিপিয়া মালাধর বলিল, বলি গণেশ-পূজোর ব্যবস্থাটা হল কি রকম?

হরিচরণ বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া চাহিলেন।

হাসিতে হাসিতে মালাধর বলিল, ব্রাহ্মণ-সন্তান—শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তি আপনি। ঐ দুর্গা বলুন, কালী বলুন—সকল বড়-পূজোর আগে গণেশ পূজো। বাচ্চাঠাকুর আগে খুশি হবেন, তবে বড়দের ভোগে

আসবে। আট টাকা মাইনে পাই মশাই, তা-ও তিন বচ্ছর বাকি। এই হাতবাক্স কোলে করে সেরেস্তায় বসে আছি, সত্যি সত্যি তো যোগ-তপস্যা করতে আসিনি।

শিহরিয়া নায়েব জিভ কাটিলেন, ঘুস?

আজ্ঞে না, পাওনা-গণ্ডা—

হরিচরণ গম্ভীর মুখে বলিলেন, তোমার চাকরি বজায় থাকে, চৌধুরি মশায়কে সেই অনুরোধ করতে পারি। তার বেশি এককড়াও নয়। পরক্ষণে হাসিয়া বলিলেন, শ্বশুর-বাড়ির মস্ত একটা তত্ত্ব ফসকে যায় বুঝি মালাধর?

মালাধর মনে মনে বলিল, শ্বশুরের বেটা একাই সাবাড় করছে যে। সে হতে দিচ্ছি নে, মাণিক।

নিরুত্তরে সে নায়েবের পরিহাসটা পরিপাক করিল।

দিবানিদ্রার পর বেলাটা একটু পড়িলে হরিচরণ আজকাল প্রায়ই যান ভায়রা কুটুম্বর বাড়ি খবরাখবর লইতে। মালাধরও সঙ্গে সঙ্গে বালাপোষ কাঁধে ফেলিয়া ভিন্ন পথে মেলা দেখিতে বাহির হইয়া পড়ে। দিনের পর দিন একই মেলা কি রকম সে উপভোগ করিতেছে, তাহার সংবাদ পাওয়া যায় না। ইদানীং সে পাইকদেরও সঙ্গে লয় না। এদিকে চক বন্দোবস্তের সমস্ত ঠিকঠাক, দিনস্থির পর্যন্ত হইয়া গিয়াছে, দলিলের মুশাবিদা করিতে দু'দিন পরে সকলের সদরে যাইবার কথা—হঠাৎ বিনামেঘে বজ্রাঘাতের মতো বরিশাল হইতে হুকুম আসিল, চক আপাতত বিক্রয় হইবে না—কবলাপত্র স্থগিত থাকুক।

মালাধরই পত্রের মর্ম পড়িয়া শুনাইল। রুক্ষ দৃষ্টিতে তার দিকে চাহিয়া হরিচরণ প্রশ্ন করিলেন, কাণ্ডটা কি?

মালাধর যেন আকাশ হইতে পড়িয়াছে। বলিল, আপনাদের বড় বড় ব্যাপারে, আমি কি জানি মশাই? আমি দাখলে লিখি, মেলা দেখে বেড়াই, ব্যাস—

হুঁ—বলিয়া নায়েব গুম হইয়া রহিলেন। সেই বিকালটায় আপাতত চৌধুরি-বাড়ির খবরাখবর লওয়া বন্ধ রাখিতে হইল, ভাবিয়া চিন্তিয়া মনের মধ্যে যা হোক কিছু খাড়া না করিয়া যাওয়া ঠিক নয়।
সকালবেলা কাছারির দোর খুলিয়াই দেখা গেল সামনে রঘুনাথ। সসম্ভ্রমে প্রণাম করিয়া রঘুনাথ জিজ্ঞাসা করিল, শরীর গতিকে ভাল তো? চৌধুরি মশায় উতলা হয়েছেন।

মালাধরও সবে ঘুম ভাঙিয়া কৃষ্ণের শতনাম আওড়াইতে আওড়াইতে বাহিরের দিকে আসিতেছিল, গলা খাটো করিয়া বোধকরি বাতাসকে শুনাইয়া শুনাইয়া কহিল, কুটুম্বিতে একে বলে। একটা দিন দেখেন নি, দুশ্চিন্তায় চৌধুরি মশায় একেবারে একপ্রহর রাত থাকতে লোক মোতায়েন করে দিয়েছেন।

রঘুনাথ কাপড়ের খুঁট হইতে চিঠি বাহির করিয়া দিল। সেই পুরানো ব্যাপারে—মধ্যাহ্ন-ভোজনের নিমন্ত্রণ। আর একদফা পদধূলি লইয়া রঘুনাথ বিদায় হইয়া গেল।

কাছারি বসিয়াছে। মালাধর ঝুঁকিয়া পড়িয়া একটা হিসাব মিলাইতেছে। মাঝে মাঝে আড়চোখে হরিচরণের দিকে তাকাইয়া দেখে। এতদিনের মধ্যে যা কখনো হয় নাই—এদিক ওদিক তাকাইয়া হঠাৎ নায়েব বলিয়া উঠিলেন, একটা সৎযুক্তি দাও তো সেন মশাই—

মালাধর ঘাড় তুলিল না। তেমনি হিসাব করিতে করিতে বলিল, আজ্ঞে?

হরিচরণ বলিলেন, চৌধুরি মশায় নেমতন্ন করে পাঠিয়েছেন, কিন্তু শরীরটে বড় খারাপ লাগছে—

আজ্ঞে—বলিয়া মালাধর এবার আপন মনে দুর্গানাম লিখিতে লাগিল।

হরিচরণ রাগ করিয়া খাতাপত্র ঠেলিয়া দিয়া কহিলেন, কথাটা যে মোটে কানে নিচ্ছ না?

মালাধর সন্ত্রস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, আজ্ঞে অসুখ করেছে নিশ্চয় —নয় তো শরীর খারাপ লাগবে কেন?

নায়েব আরও রাগিয়া বলিলেন, তোমায় সেজন্য পাঁচন জ্বালাতে বলছি না সেন মশাই। জিজ্ঞাসা করছি, চৌধুরির নেমন্তন্নের কি হবে?

যেতে হবে।

অসুখ অবস্থায়?

আজ্ঞে, বাঘাহরির ব্রাহ্মণভোজনের ইচ্ছে হয়েছে যে!

নায়েব বলিলেন, চিঠি লিখে পাইক পাঠিয়ে দেওয়া যাক। নয় তো ভদ্রলোক অনর্থক যোগাড়যন্ত্র করে বসে থাকবেন—

মালাধর এদিক-ওদিক বার দুই ঘাড় নাড়িয়া সংশয়ের সুরে বলিল, আস্তাকুড়ে গিয়ে বসলে কি যমে ছাড়বে মশাই? বিশ্বাস তো হয় না। তবে আপনাদের কুটুম্বিতের ব্যাপার— এই যা।

যা বলিল তাই। চিঠি লিখিয়া পাইক পাঠানো হইল। কিন্তু নিমন্ত্রণ মাপ হইল না। যথাকালে একেবারে পালকি-বেহারা চলিয়া আসিল। সঙ্গে রঘুনাথ।

হরিচরণ বলিলেন, জ্বর হয়েছে।

রঘুনাথ হাসিয়া বলিল, তাইতো চৌধুরি মশায় ব্যস্ত হয়ে পালকি পাঠালেন। মাটিতে সে হাতের পাঁচ-হাতি লাঠিখানা একবার অকারণে ঠুকিল। পিতলের আংটা ঝুন-ঝুন করিয়া বাজিয়া উঠিল।

মালাধর চোখের ইসারায় নায়েবকে ডাকিয়া লইয়া কহিল, বেলা করবেন না, উঠে পড়ুন পালকিতে।

নায়েব বিস্মিতভাবে চাহিলেন। মালাধর বলিতে লাগিল, দেব-দ্বিজে ওঁর অচলা ভক্তি। নেমন্তন্ন ওরা আজ খাওয়াবেই ঠেকছে, একবার বলরাম স্মৃতিরত্নকে পিছমোড়া বেঁধে নেমন্তন্ন খাইয়ে দিয়েছিল।

সাত-পাঁচ ভাবিয়া হরিচরণ পালকিতে উঠিলেন। নামিয়া নরহরির বৈঠকখানায় ঢুকিয়া দেখেন, গম্ভীর মুখে চৌধুরি পায়চারি করিতেছেন। বরিশালের চিঠিটা হাতে দিয়া হরিচরণ বলিলেন, কিসে কি হল, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না হুজুর। আমার এক বিন্দু গাফিলতি নেই।

পড়া শেষ করিয়া নরহরি ডাকিলেন, রঘু!

হরিচরণ বলিতে লাগিলেন, ঐ মালাধর বেটার হয়তো কোনরকম কারসাজি আছে। ওটাকে সায়েস্তা করা দরকার।

নরহরি আরও গম্ভীর উচ্চকণ্ঠে ডাকিলেন, রঘুনাথ!

হরিচরণ ছুটিয়া গিয়া রঘুনাথকে ডাকিয়া আনিলেন।

নরহরি বলিলেন, এঁকে খাবার জায়গায় বসিয়ে দিয়ে এসো।

হরিচরণ তাড়াতাড়ি বলিলেন, কথাটা তা হলে খাবার পরই হবে হুজুর—

নরহরি পুনশ্চ রঘুনাথকে বলিলেন, খাওয়া হলে দেউড়ি পার করে দিয়ে আসবে, বুঝলে ?

রঘুনাথ বিশেষ সম্বর্ধনা করিয়া কহিল, আসতে আজ্ঞা হয় নায়েব মশায়।

(৩)

আবছা জ্যোৎস্নায় প্রহরখানেক রাত্রে ঢালিপাড়ার ঘাটে ছোট একখানা ডিঙি আসিয়া লাগিল। এবারে বোঝাই হইয়া আসিয়াছে ধান নয়—কোদাল। রঘুনাথ সর্দার ডিঙি হইতে নামিয়া গিয়া ভানুচাঁদকে ডাকিল। বলিল, চটপট ঐগুলো বিলি করে দে তো বাবা!

ভানুচাঁদ আশ্চর্য হইয়া বলিল, শেষকালে চৌধুরি মশায় কোদাল পাঠালেন সর্দার ?

সর্দার বলিল, নিয়ে এলাম। দীঘি কাটার সেই চার পাঁচ শ' কোদাল পড়ে পড়ে নষ্ট হয়ে যাচ্ছিল। ভানুর অপ্রসন্ন মুখের দিকে চাহিয়া রঘুনাথ মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। যে রকম ঘোরপ্যাঁচ কোম্পানির আইনের—লাঠি কোদাল দুই ই রাখতে হয় রে—কখন কোনটা লাগে। চৌধুরি মশায় তাই বললেন—নিয়ে যাও সর্দার।

চকের ধান এখনো আধাআধি আন্দাজ কাটিতে বাকি। এখানে-ওখানে খামার করিয়া গাদা দেওয়া হইয়াছে। দিন তিনেক পরে মহা

এক বিপর্যয় কাণ্ড হইয়া গেল। মালাধরের উত্তরের ঘরে হরিচরণ ঘুমাইয়া ছিলেন। অনেক রাত্রি। হঠাৎ বহুলোকের চিৎকারে ঘুম ভাঙিয়া নায়েব বাহিরে আসিলেন। চাঁদ অস্ত গিয়াছে। বিশ-ত্রিশজন চাষী বুক চাপড়াইয়া মাথা কুটিয়া আর্তনাদ করিতে লাগিল। তাদের সর্বনাশ হইয়া যায়। বাঁধ ভাঙিয়াছে, নদীর নোনা জল পাকা ধান ডুবাইয়া নষ্ট করিয়া তাদের সম্বৎসরের আশা-ভরসা ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে।

চোখ মুছিতে মুছিতে মালাধরও আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল। তাহার পর সেই ক্রোশখানেক পথ সকলে একরকম দৌড়িয়া চলিয়া গেল। শেষ-রাত্রির অন্ধকার-নিমগ্ন মালঞ্চ। কোটালের মুখ; জোয়ার নামিয়াছে। শীতের শীর্ণ নিস্তেজ মালঞ্চ জলতরঙ্গে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। কলকল করিয়া নোনা জল বিপুল বেগে চকের নয়ানজুলি বোঝাই করিয়া ফেলিতেছে। আট-দশ হাত ভাঙন দেখিতে দেখিতে বিশ হাত হইয়া দাঁড়াইল। বিপুল সর্বনাশের সম্মুখে হতভম্ভ হরিচরণ ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে লাগিলেন। চাষীরা উন্মাদের মতো হইয়া গিয়া ঝাঁপ দিয়া সেই জলস্রোতের মধ্যে গিয়া পড়িল, যেন বুক দিয়া ঠেকাইতে চায়। পারিবে কেন? জল ধাক্কা দিয়া তাদের ফেলাইয়া দেয়, পড়িয়া গড়াইতে গড়াইতে রক্তাক্ত ক্ষত দেহে কোন গতিকে উঠিয়া আবার জল ঠেকাইবার চেষ্টায় বৃথা আকুলি-বিকুলি করে।

মালাধর চেঁচাইতে লাগিল, উঠে আয় বেটারা। গ্রামে গিয়ে বাঁশ কেটে নিয়ে আয় আমার ঝাড় থেকে। কান্নাতে কি আর জল ঠেকাবে?

বাঁশ আসিয়া পৌঁছিল। পঞ্চাশ-ষাটটা বাঁশের খোঁটা জলের মধ্যে পুঁতিয়া গোছা গোছা কাটা-ধান আনিয়া তার গায়ে দিতে অনেক কষ্টে জলের বেগ কমিল। রাত্রি শেষ হইয়া পূর্বাকাশে রক্ত আভা দেখা দিয়াছে। জল-কাদা মাখিয়া চাষীদের সঙ্গে মালাধরেরও অদ্ভুত মূর্তি হইয়াছে। তারপর নদীতে ভাঁটা পড়িয়া গেল, ঝপঝপ মাটি কাটিয়া বাঁধ মেরামত হইল।

ক্রুদ্ধকণ্ঠে হরিচরণ বলিয়া উঠিলেন, এ চৌধুরি শালার কাজ, আমি হলপ করে বলতে পারি।

চুপ, চুপ! মৃদু হাসিয়া মালাধর কহিল, রাগ চেঁচিয়ে করবেন না —মনে মনে করুন। চৌধুরির দু-শ লাঠি আর চার-শ কান।

একটু থামিয়া বলিল, আমি মশাই রাতদিন মাথা কুটে মরছি, নিদেন পক্ষে গাঙের দিককার বাঁধটা বন্ধ রাখুন। আপনি গেলেন সরকারি পয়সা বাঁচাতে। কোটালের টান—পুরানো বাঁধ রাখতে পারবে কেন? এখন চৌধুরির দোষ দিচ্ছেন। বাবু কি আর বিশ্বাস করবেন কুটুম্বর দোষ?

আলবৎ। হরিচরণ রাগিয়া আগুন। বলিতে লাগিলেন, এই কাজে চুল পাকিয়ে ফেললাম সেন মশাই, কোনটা কোটালের ভাঙন আর কোনটা মানুষের কাটা—তুমি আমায় শেখাতে এসেছ? বাবুকে আজই চিঠি লিখছি, বুঝুন তাঁর কুটুম্বর কাণ্ডটা।

নায়েব চিঠি লিখিলেন। মালাধরও বাড়ির মধ্যে গিয়ে বিস্তর মুশাবিদা করিয়া গোপনে আর এক সুদীর্ঘ চিঠি লিখিল। সদর হইতে জবাব আসিল হরিচরণের নামে, কি আসিল তিনি কাহাকেও দেখাইলেন না। ক'দিন পরে তল্পিতল্পা বাঁধিয়া বিদায় হইয়া গেলেন। মনের আনন্দে মালাধর হরির-লুঠের জোগাড় করিল।

অতঃপর মালাধর একেশ্বর। বাঁধ-মেরামতে আর কৃপণতা নাই। কিন্তু বাঁধ ভাঙা বন্ধ হইল না। ধান কাটা শেষ হইয়াছে, কাজেই আশু ক্ষতি গুরুতর হইতেছে না। কিন্তু নদী যেন মানুষের সঙ্গে দুষ্টামি লাগাইয়াছে। মালাধর লোকজন ডাকিয়া সমস্ত দিন হৈ-হৈ করিয়া নূতন মাটি ফেলিয়া আসে—সকালে গিয়া দেখা যায়, মালঞ্চ পাশে আর এক জায়গায় মাথা ঢুকাইয়াছে। আর মজা এই, নদীর যত আক্রোশ ঐ রাত্রিবেলাতেই। বিশেষত কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি হইলে তো কথাই নাই।

একদিন অমাবস্যার কাছাকাছি কি একটা তিথি, সমস্তটা দিন মেঘলা করিয়া সন্ধ্যার পরে টিপিটিপি অকালবর্ষা শুরু হইল। খানিক

রাত্রে একখানা বাঁশের লাঠি হাতে লইয়া মালাধর একাকী বাঁধের আড়ালে গুঁটিশুটি হইয়া বসিল। তীক্ষ্ণদৃষ্টি বিসারিত করিয়া সে গাঙের দিকে তাকাইয়া রহিল। আন্দাজ ঠিকই—অনেকক্ষণ তাকাইয়া তাকাইয়া তারপর দেখিল, কুল ঘেঁষিয়া উজান ঠেলিয়া কালো রেখার মতো ছোট একটা ডিঙি আসিতেছে। বিশ-পঁচিশটা মরদ একহাতে কোদাল আর একহাতে সড়কি—ডিঙি হইতে নামিয়া ঝপাঝপ বাঁধে কোদাল মারিতে লাগিল। পা টিপিয়া টিপিয়া মালাধর নদীর খোলে নামিয়া নৌকার কাছে গিয়া দেখিল, কাদায় লগি পুতিয়া নৌকা বাঁধা। নিঃশব্দে দড়ি খুলিয়া দিল, তীরস্রোতে ডিঙি দেখিতে দেখিতে নিখোঁজ হইয়া গেল। তারপর আবার বাঁধের আড়ালে আড়ালে ঘরে গিয়া দিব্য ভালো মানুষের মতো সে নাক ডাকিতে লাগিল।

পরদিন মালাধর নরহরির বাড়ি গিয়া ধর্না দিয়া পড়িল। প্রচ্ছন্ন বিদ্রূপের কণ্ঠে নরহরি কহিলেন, সেন মশাই খবর কি?

মালাধর করজোড় করিয়া সবিনয়ে বলিল, রাজ্যের মালিক আপনি—আপনার অজানা কি আছে হুজুর?

বাঁধ ভাঙার ঘটনা সে বলিতে লাগিল। বলিল, আপনার কুটুম্বর বিষয়, আপনি একটা বিহিত করে দিন চৌধুরি মশায়।

গাঙ তো আমার হুকুমের গোলাম নয়। আরও চওড়া করে নতুন বাঁধ দিয়ে দেখ দিকি।

মালাধর আরও বিনয়ে কাঁচু-মাচু হইয়া কহিল, আজ্ঞে গাঙ নয়; মানুষ।

কারা মানুষ? নরহরির দৃষ্টি একমুহূর্তে প্রখর হইয়া উঠিল।

মালাধর বলিতে লাগিল, চিনব কি করে হুজুর? যে অন্ধকার! আর কাছে এগুতেও সাহস হয় না। হাতে সব ঝকমকে সড়কি, শেষকালে এফোঁড়-ওফোঁড় গেঁথে ফেলে যদি!

শ্যামকান্ত সেখানে ছিল। সে সপ্তমে চড়িয়া উঠিল।

ঠিক বরণডাঙার কাজ। চিরশত্রু আমাদের—জানে আমাদের কুটুম্বর বিষয়, তাই ওখানেও শত্রুতা সাধতে লেগেছে। বিহিত

করতেই হবে বাবা, লাভ হোক লোকসান হোক—এ চক আমাদের নিতে হবে।

নরহরি হাসিয়া বলিলেন, তুমি মধ্যবর্তী হয়ে ওটার ব্যবস্থা করে দাও মালাধর। তারপর লাঠি-বৃষ্টি করব ঐখানে। দেখি, কে শত্রুতা করতে আসে!

কিন্তু লাঠি-বৃষ্টি হোক আর যা-ই হোক, কাজ ভুলিবার পাত্র মালাধর নয়। বলিল, আজ্ঞে, তা ঠিক—কিন্তু দরদামের কথাটা—

হরিচরণের আমলে যে তিন-শ টাকার কষাকষি চলিতেছিল, রাগের বশে সেটা একেবারে ধরিয়া দিয়াই নরহরি দাম বলিয়া দিলেন।

মালাধর মাথা নাড়িয়া বলিল, আর কিছু নয়?

ইঙ্গিতটা নরহরি সম্পূর্ণ এড়াইয়া গেলেন। বলিলেন, আর বেশি দিয়ে কে নিচ্ছে এই গোলমেলে মহাল? আমি রাজি হয়ে যাচ্ছি কুটুম্বিতের খাতিরে।

মালাধর বলিল, কে নেয় না নেয়—জানি নে। খবর দেব দিন পাঁচ-সাতের ভিতরে। আজ্ঞে, আসি তবে—

কিন্তু মালাধরের খবরের আগে খবর আনিল রঘুনাথ। ঢালি-পাড়ার নিচে দিয়া সৌদামিনী ঠাকরুনকে নৌকাযোগে যাইতে দেখা গিয়াছে, সঙ্গে মালাধর। বিদ্যুৎ ঝলকের মতো একটা আশঙ্কা নরহরির মনে খেলিয়া গেল। জিজ্ঞাসা করিলেন, নৌকা সা'পাড়া দিয়ে উঠল?

হুঁ—

কসবায় গেল নাকি?

তা জানিনে।

ক্রুদ্ধ বাঘের মতো গর্জন করিয়া নরহরি বলিলেন, সবাই হাত-পা কোলে করে বসে রইলে? গলুইটা টেনে ধরে জিজ্ঞাসা করে নিতে পারলে না?

রঘুনাথ কৈফিয়ৎ দিয়া বলিল, করব কি চৌধুরি মশাই? বড্ড সকালবেলা—ছোঁড়াগুলো তখনও সবাই ঘুম থেকে ওঠে নি।

নৌকোয় ছিল চিন্তামণি ওস্তাদ—ভাল তোড়জোড় না করে তো এগুনো যায় না।

ইহা যে কত বড় সত্য নিজে লাঠিয়াল হইয়া নরহরির চেয়ে বেশি জানে আর কে? তিনি আর তর্ক করিলেন না। রঘুনাথকেই কসবায় শশিশেখর উকিলের কাছে পাঠানো হইল। সন্ধ্যার সময় জবাব আসিল, শশিশেখর জানাইয়াছেন, প্রায় তিনগুণ দামে সেই দিনই সৌদামিনী ঠাকরুনের সঙ্গে বউভাসির চক বন্দোবস্ত হইয়া গিয়াছে।

নরহরি রক্তচক্ষে ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর সহসা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিলেন, ঠিক হয়েছে। পাটোয়ারি চাল চালতে গেছি আমি। ওকি আমার পোষায়? আচ্ছা ঠকিয়ে দিয়েছে মালাধর—

রঘুনাথ লাঠি ঠুকিয়া বলিল, তলে তলে ঐ বেটাই বরণডাঙার সঙ্গে যোগাড়যন্ত্র করেছে। ওকে একটু শিখিয়ে দিতে হবে।

নরহরি হাসিয়া বলিলেন, ছি-ছি! ছুঁচো মারতে যাবে কেন সর্দার? আমার ঘোড়া সাজাতে বল।

(৪)

চাঁদ উঠিয়াছে। পাথরে বাঁধানো সুবিস্তৃত অলিন্দ—শীতের ঘোলাটে জ্যোৎস্নায় তাহারই উপর বড় বড় থামের ছায়া চিত্র-বিচিত্র ডোরা কাটিয়া দিয়াছে। গোলঘর, চণ্ডীকোঠা, রান্নাবাড়ি সমস্ত জনহীন। গম্ভীর আনত মুখে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বাহিয়া নরহরি অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইলেন। পিছে পিছে আসিতেছিল রঘুনাথ ও আরও পাঁচ-সাত জন। হাত নাড়িতে তারা সব বিদায় হইয়া গেল।

ঠিক এইরকম সময়টায় এক একদিন নরহরি থামে ঠেস দিয়া ডাকাতের বিলের দিকে অলস দৃষ্টি বিসারিত করিয়া তাকাইয়া থাকেন। ভাঙা জ্যোৎস্নায় বিলের সে এক জ্যোতির্ময় রূপ। এ রাত্রে বিলে পদ্মফুলের রাশি নজরে আসে না কিছুই। ওপারের দিকে

যেখানে আজকাল ধানের আবাদ শুরু হইয়াছে—সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিবার মুখে চাষীরা শুকনা ধানের গোড়ায় আগুন ধরাইয়া দিয়া যায়, সমস্ত রাত ধরিয়া সেই আগুন লাকাইয়া লাফাইয়া বেড়ায়।··· রান্নাবাড়ির ঠিক হাত দুই-তিন নিচে দিয়া চিক-চিক করিয়া নাক-কাটির খাল বহিয়া চলে, পাকা-ফলের লোভে দেবদারু-বনে বাদুড় পাখা ঝটপট করে, কেওড়া-ছায়ার নিচে ডোঙায় ডোঙায় ঠক করিয়া একবার বা বাজিয়া ওঠে।···এপারে এক বিচিত্র রহস্যলোক, আর ওপারে সংখ্যাতীত অগ্নিকুণ্ড; মাঝখানে নিঃসীম জনশূন্য বিল জ্যোৎস্নায় দেহ এলাইয়া দিয়া পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়।

ঝুমঝুম করিয়া মল বাজিয়া উঠিতে নরহরির সঙ্কল্প-কঠোর মুখ স্নিগ্ধ হইয়া আসিল। হাসিয়া ফেলিয়া বলিলেন, লক্ষ্মী মেয়ে! অমনি জুট নড়ে উঠেছে তো? কি করে টের পাস বল দিকি?

চোখ বড় বড় করিয়া সুবর্ণলতা কহিল, সত্যি বাবা, কালীর কিরে—আমি নই, বউদিদি—

কোথায় সে হারামজাদি? সুবর্ণের হাসি-হাসি চোখের দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া নরহরি পিছনে চাহিতেই বধূ দিল এক ছুট।

সুবর্ণলতার নালিশ চলিতে লাগিল, বউদিদি মহামিথ্যুক। শাখ বাজাচ্ছি পাল্লা দিয়ে, কে কত দম রাখতে পারে—বলল, ঐ দেখ্ নাককাটির খাল থেকে যক্ষি উঠে আসছে। সেই যেমন একবার উঠে দুধওয়ালীর নাক কেটে নিয়েছিল তেমনি।

নরহরি মেয়েকে আদর করিয়া কোলের মধ্যে টানিয়া লইলেন। বলিলেন, বোকা মেয়ে! অমনি তুমি ছুটে এলে?

ছোট্ট মাথাটি সজোরে দুলাইয়া সুবর্ণলতা বলিল, বা রে—আমি না দেখে এসেছি বুঝি? আলসের ফাঁকে তাকিয়ে দেখলাম, কালো মস্ত মস্ত ছায়ার মতো সব উঠে আসছে। এসে দেখি, সে সব কিচ্ছু না—তুমি, আর পিছনে তোমার ঢালিরা।

খিল-খিল করিয়া হাসিয়া মেয়ে লুটাইয়া পড়িল।

নরহরি বলিলেন আচ্ছা মেয়ে তো! ভয় করল না? যগি
দেখছি তোরও নাক কেটে নেবে একদিন।

বাপের আদরে কি যে করিবে, সুবর্ণ ঠিক করিতে পারে না। বলিল, চাঁপাফুল নেবে বাবা, খাসা স্বর্ণচাপা? তুলে এনেছি। চক্ষে পলকে সে ছুটিয়া গেল। তখনই আবার আসিল। বলিল, ফুল নিচে রয়েছে। দুত্তোর—কি হবে ফুলে? শুকিয়ে গেছে, ও ভাল না। তারপর বলিল, বাবা বউদিদি কি করেছে জান সে দিন? সে এক কাণ্ড।

হাত-মুখ নাড়িয়া সুবর্ণ বলিতে লাগিল, দুপুরবেলা, কেউ কোথাও নেই। আমি আর বউদিদি বড় খাটে ঘুমুচ্ছি। পায়ের শব্দে কি রকমে ঘুম ভেঙে গেল। দেখি, এদিক-ওদিক চেয়ে চোরের মতো দাদা ঘরে ঢুকছে—

অলিন্দের পাশে কক্ষের মধ্যে ঝিন-মিন করিয়া গহনা বাজিয়া উঠিল। নরহরি হাসিয়া বলিলেন, থাম্—থাম্ দিকি।

না, শোন বাবা। নাছোড়বান্দা সুবর্ণ বলিতে লাগিল, কি দুষ্টু বউদিদি, শোন একবার। চুপচাপ শুয়েছিল, যেন কত ঘুমুচ্ছে দাদা যেই এসেছে চট করে অমনি উঠে দাঁড়াল। আমি চোখ মিটমিট করছি, দেখি কি করে। দাদা খাটের কাছে এসে বউদিদির মুখের কাছে মুখ নিয়ে—

নরহরি বলিলেন, রাত হয়েছে—এখন শুতে যাও মা। আর গল্প থাক।

সুবর্ণ না বলিয়া ছাড়িবেই না। বলিতে লাগিল, মুখের কছে মুখ না নিয়ে দাদা বলল, আর কামরাঙা আছে ঘরে? বউদিদি ফিস-ফিস করে বলল, না।

নরহরি হো-হো করিয়া হাসিয়া বলিলেন, বলল নাকি?

কথা বিশ্বাস করিতেছে না ভাবিয়া সুবর্ণলতা ক্ষুব্ধভাবে আরও জোরে মাথা ঝাঁকাইয়া উচ্চ কণ্ঠে বলিল, হ্যাঁ বাবা, সত্যি—কালীর দিব্যি। বউদিদি বলল, আমি স্পষ্ট শুনলাম। তোমাদের সামনে

কথা কয় না, ঘোমটা দিয়ে দিয়ে বেড়ায়। কিন্তু সেদিন বলেছিল, আমি শুনেছি।

নরহরি বলিলেন, বেশ করেছে। আর তাই লাগাতে এসেছ আমার কাছে? যক্ষিতে যদি নাক না-ও কাটে, আজকে বউমা ঠিক নাক কেটে নেবে তোমার।

সুবর্ণ কক্ষের দিকে একবার দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া নির্ভীক কণ্ঠে বলিল, তোমার কাছে শোব তা হলে—

ওরে বাস্‌রে! ভুল করে অন্ধকারে আমার নাকটাই যদি কাটা যায়?

সুবর্ণলতা কিন্তু হাসিল না, বড় বড় চোখ দু'টি মেলিয়া বাপের দিকে ক্ষণকাল চাহিয়া রহিল। শেষে ধীরে ধীরে আগের কথাটাই আর একবার বলিল, আজকে আমি তোমার সঙ্গে শোব বাবা।

হু-হু করিয়া এক ঝলক ঠাণ্ডা হাওয়া বহিয়া গেল। একটু পরেই উঠানে ঘোড়ার খুরের ধ্বনি। তীক্ষ্ণ চোখে নিচের দিকে চাহিয়া নরহরি সেই অলক্ষ্যের উদ্দেশে বলিলেন, ওখানে থাক ঘোড়া। চাঁদ ডুবে গেলে রওনা হব।

সকল আবদার এক মুহূর্তে বন্ধ হইয়া গেল। বাপকে সুবর্ণলতা ভাল করিয়া জানে। এক-পা দু-পা করিয়া সে ফিরিয়া গেল। দোরের কাছে গিয়া মুখ ফিরাইয়া একটু হাসিল—লাজুক অপ্রতিভ ধরনের হাসি হাসিল—বলিল, তোমার সঙ্গে কালকে শোব বাবা। হ্যাঁ?

এই ডাকাতের বিল, মালঞ্চ নদী, নাককাটির খাল, শ্যামশরণের সুপ্রাচীন অমসৃণ পাথরের প্রাসাদ লইয়া সম্ভব অসম্ভব কত যে গল্প চলিয়াছে তার সীমা নাই। ছোট্ট মেয়ে সুবর্ণলতা—সৌদামিনী ও কীর্তিনারায়ণের কথা আবছা তার মনে আছে। বাড়ির মধ্যে তার সঙ্গে দুটো ভাল-মন্দ গল্প জমাইবার মানুষ এখন কেবল বউদিদি। আর কোন কোন দিন হাতে কাজ না থাকিলে, মনে তেমন কোন কাজের ভাবনা না থাকিলে নরহরি চৌধুরি উহাদের সঙ্গে ছেলেমানুষ

হইয়া আসিয়া বসেন। কিন্তু সে-ও কালেভদ্রে কদাচিৎ। শ্যামকান্ত প্রায়ই বাড়ি থাকে না। আঠারো ক্রোশ দূরে দৌলতপুর গ্রাম, অনেক বিদ্বান লোকের বসতি, ইংরাজি-ইস্কুল আছে, চতুষ্পাঠি আছে, সেইখানে সে মানুষ হইতেছে। কতদূর কি হইতেছে, তার খোঁজ লইবার অবসর নরহরির বড় নাই। শ্যামকান্ত ছুটিতে দু-একদিনের জন্য বাড়ি আসে, বিষয়-আশয় প্রজাপাটকের ব্যাপারে তার বড় উৎসাহ, বেশির ভাগ সময় বাহিরে বাহিরে কাটাইয়া মেয়াদ অন্তে ফিরিয়া যায়। বধূ সরস্বতী আর মেয়ে সুবর্ণলতার মলের বাজনা হাসি-হাট্টার কলশব্দেই কেবল গম্ভীর বাড়ীখানার মধ্যে সমস্তটা দিন গানের সুর বহিতে থাকে।

রাত্রে একেবারে পৃথক আর এক জগৎ—এই পাষাণ-গৃহের সে এক অপূর্ব রহস্যময় রূপ।

এক একদিন মাঝরাত্রে ঘুম ভাঙিয়া সুবর্ণলতা অবাক হইয়া থাকে, হঠাৎ এ কোন নূতন দেশে আসিয়া পড়িয়াছে সে। জ্যোৎস্না তেরছা হইয়া মেজেয় বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছে। শুইয়া শুইয়াই খণ্ড-চাঁদের খানিকটা দেখা যায়, খিলান-করা ছাতে কালো ছায়া স্তূপাকারে জমিয়াছে, বিস্তৃত মেহগ্নি-খাটের একপাশে ঘুমন্ত সরস্বতীর চুল খুলিয়া গিয়াছে, শিথিল গৌর বাহুর উপর চুলের রাশির উপর শাড়ির চওড়া পাড়ের উপর এখানে-সেখানে টুকরা টুকরা জ্যোৎস্না পড়িয়া সে যেন মায়ালোকের নূতন বাসিন্দা হইয়া গিয়াছে, দিনের বেলাকার চেনা মানুষ সে বউদিদি আর নাই। উঠিয়া একটু ঘুরিয়া ফিরিয়া চারিদিকের সঙ্গে নূতন করিয়া পরিচয় করিতে ইচ্ছা করে। অপূর্ব অভাবিতপূর্ব সমস্ত। দিনের বেলাকার কোন-কিছুই মেলে না ইহাদের সঙ্গে। নাককাটির খালের জলের মধ্যে বগ-বগ করিয়া কত কি যেন এক একবার মাথা চাড়া দিয়া উঠে…জল ছিটাইতে ছিটাইতে মাঝখান দিয়া কি যেন তীরবেগে ছুটিয়া চলে…চাঁদাকাটার ঝাড়ের মধ্য দিয়া ঝির-ঝির করিয়া ভাঁটার জল ঝরিয়া পড়ে। আবার ওদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া ডাকাতের বিলে দেখ, কত অনুপম সুন্দরী তরুণী বিল

ঝাঁঝির মধ্য দিয়া চোখ চাহিয়া রহিয়াছে···হীরার আংটি হাতে সোনার মতো ঝকঝকে মুখ কত বড় মানুষের ছেলে···কত ছোট্ট শিশু জলতল হইতে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ওঠে, মা—মা—মা···কচি মেয়ের পায়ে পায়ে জলতরঙ্গ মল বাজিয়া ওঠে···জলে বুদ্বুদ ওঠে, কারা ওখানে নিশ্বাস বন্ধ হইয়া নাকানি-চুবানি খাইতেছে! বাদাম-বনে খড়-খড় করিয়া পাতা নড়ে, কারা যেন ঘুরিয়া বেড়ায়, চোখের তারা বাঘের মতো—অন্ধকারে হামাগুড়ি দিয়া দিয়া তারা আগাইতেছে।···বনঝোপের মধ্যে অজানা ফুল, শিশির-সিক্ত মাটি, সমস্ত মিলিয়া অদ্ভুত ধরনের এক মাদক গন্ধে সুবর্ণলতার চোখ আবার ঝিমাইয়া আসে।

সে রাত্রে সরস্বতীর সঙ্গে বড় খাটে শুইয়া ঘুমের মধ্যে সুবর্ণ শুনিতে পাইল, খট-খট করিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া নরহরি চলিলেন। প্রাসাদ-সীমা শেষ হইয়া নরম মাটিতে ঘোড়ার খুর আর বাজে না, তবু তার কানে তালে তালে আরো অনেকক্ষণ ধরিয়া খুরের শব্দ বাজিতে লাগিল। শব্দহীন জগৎ, নির্নিমেষ নক্ষত্র-মণ্ডলী, তন্দ্রাচ্ছন্ন রাত্রি—সেই তন্দ্রার রাজ্য বিমথিত করিয়া ঘোড়া দূর হইতে কত দূরে ছুটিয়া চলিয়াছে।

(৫)

সুন্দরবন বেশি দূর নয়; এখান হইতে তিনটা ভাঁটি ও পো দেড়েক জোয়ার মাত্র লাগে। তাই শীতের ক'মাসে গোল আর মোম-মধুর নৌকার বড় ভিড়। স্টিমারও চলে দু একখানা, তবে সে নিতান্তই শখ করিয়া। ধান-কাটার মরশুমে দুই পারের আবাদে বিস্তর বালিহাঁস আসিয়া পড়ে, হাঁস শিকারের লোভে বনকরের অফিসারেরা সেই সময়ে কখন কখন স্টিমার ঘুরাইয়া এই পথে আসেন। মরা-গোনের সময় জল মরিয়া গিয়া দু চার জায়গায় বালির চড়া জাগিয়া ওঠে, স্টিমারের সাধারণ পথ তাই এ নদী দিয়া নয়—

সেই মাথা ভাঙার দিক দিয়া ঘুরিয়া চলিয়া যায়। এ অঞ্চলের লোক আঁধার রাতে সার্চ-লাইটের আঁলো দেখিতে পায় মাত্র।

অমনি একখানা শখের স্টিমার সম্প্রতি গাঙে আসিয়াছে, হুস-হুস শব্দে ধোঁয়ার কুণ্ডলী উড়াইয়া ভাঁটায় আগাইয়া জোয়ারে পিছাইয়া সমস্ত দিনে গড়ে হাত কুড়িক করিয়া চলে। ডেকের উপর চেয়ার পাতিয়া বসিয়া একটা লোক মাঝে মাঝে চা-বিস্কুট ও কমলালেবু খান। লোকটি সাহেব—টুপি পরা সাহেব, ঠিক যেমনটি হইতে হয়। উড়ন্ত বকের ঝাঁক দেখিলে খাওয়া ফেলিয়া তৎক্ষণাৎ বন্দুকে তাক করেন। গুড়ুম-গুড়ুম করিয়া গুলি-বৃষ্টি হয়। বকের অবশ্য কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না তাহাতে। নির্বিঘ্নে তারা দৃষ্টিসীমা পার হইয়া গেলে সাহেব নিশ্চিন্ত চিত্তে পুনরায় প্লেট টানিয়া লইয়া বসেন।

তীরের লোকগুলা কিন্তু দেখিয়া শুনিয়া হতবাক্ হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে কে-একজন রটাইল, সুন্দরবনে যাইবার লোক ইহারা নয়—এসব জল-পুলিস। সম্প্রতি খুব বাড়াবাড়ি লাগাইয়াছে ইহারা —কোম্পানি বাহাদুরের আবার টনক নড়িয়াছে, ঢালিপাড়ায় নজর দিতে চর আসিয়াছে, শিকার-টিকার সব মিছা কথা। গতিক দেখিয়া সন্দেহ হইবার কথাই বটে। স্টিমারের লোকেরা স্টিমারের সঙ্গে যদি পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে ব্যবস্থা করিয়া আসিয়া থাকে তো আলাদা কথা—নহিলে বর্তমান পুরুষে তো সুন্দরবনের ত্রিসীমানায় কারো পৌঁছিবার কথা নয়। এবং দলের বড়কর্তা সেই সাহেবটি হইতে শুরু করিয়া তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গ চেলাচামুণ্ডা—বন্দুকে সকলেরই হাত এমন সাফাই যে এই বিদ্যার বালাই লইয়া স্টিমারে উহারা সব শিকারে আসিয়াছে, এ কথা বিশ্বাস করা অতি শক্ত। ব্যাপার যা-ই হোক, ঢালিপাড়া কিন্তু অকস্মাৎ একেবারে শিষ্টশান্ত হইয়া গেল।

এ ক'দিন স্টিমার একটু-আধটু তবু যা হোক নড়াচড়া করিতেছিল, সেদিন দুপুর হইতে একদম নিশ্চল হইয়া বসিল। ভোঁ-ভোঁ করিয়া অনবরত বাঁশি বাজিতেছে। কাণ্ডটা কি? ঢালিপাড়ার যে যেখানে সব গাঙের ধারে আসিয়া জুটিল। অল্প অল্প ভাঁটার টান ধরিয়াছে,

লোক দেখিয়া খালাসিরা চেঁচাইতে লাগিল। দু-গাছা কাছি তীরের দিকে ছুঁড়িয়া চেঁচাইয়া বলিল, ধর সবাই মিলে; টেনে দাও—কসে টানো তোমরা একটু। কাছির আগা তীর অবধি পৌঁছিল না, জলে পড়িল। রঘুনাথ ইহাদের মধ্যে নাই, জরুরী ডাক পাইয়া সকালবেলা চৌধুরি-বাড়ি চলিয়া গিয়াছে, এখনো ফিরে নাই। কাজেই সকলে ভানুচাঁদের দিকে তাকাইল। ভানুচাঁদ মুখ ঝাড়া দিয়া বলিয়া উঠিল, কাছি টানতে বলছে কি—কি বলছে বেটারা, শুনতে পাচ্ছি নাকি আমরা কিছু? চুপ করে থাক, যে যেমন আছ।

একজন ওরই মধ্যে বেশি বিচক্ষণ—সে প্রতিবাদ করিয়া উঠিল। ভানুচাঁদের বয়স কম, একটা কোন মজার নামে লাফাইয়া ওঠে। রঘুনাথ না থাকায় আজ একেবারে নিরঙ্কুশ হইয়া পড়িয়াছে। লোকটি তীরের জনতা দেখাইয়া কহিল, তাহলে বাপু, তাড়িয়ে দিই এদের। একেবারে পাড়া ভেঙে আসছে- শেষকালে রেগে-টেগে যাবে ওরা? বলিয়া চোখ ঘুরাইয়া স্টিমার এবং বিশেষ করিয়া সাহেবকে দেখাইল।

ভানুচাঁদ হাসিয়া খুন। বলিল, রাগে রাগুক। ডাঙায় এসে উঠতে হবে না আর। চড়ায় আটকে গেছে—হি—হি—হি। গাঙ সাঁতরে আসবে নাকি? আসে যদি—

যদি বন্দুক মারে?

যেমন বক মেরে থাকে?

আর এক দফা হাসাহাসি চলিল।

বিকাল হইয়া আসিল। ভাঁটায় জল সরিয়া গিয়া নদীগর্ভ নিকানো আঙিনার মতো তকতক করিতেছে। হঠাৎ দেখা গেল, সাহেব বুট পরিয়া বন্দুক হাতে বীরবিক্রমে কাদায় নামিতেছেন। সঙ্গে পাঁচ-সাত জন লোক—কেউ গুলির বাক্স লইয়াছে, কেউ তারের খাঁচা। ছুরি কাঁটা এবং আনুষঙ্গিক আয়োজনগুলোও সঙ্গে চলিয়াছে। অর্থাৎ ব্যাপার সহজ নয়। এইবার সাহেব শিকার করিতে ভূতলে নামিলেন। সঙ্গের লোকেরা কখনো আড়কোলা করিয়া, কখনো বা

হাত পা গলা মাথা যে যেখানে পারিল ধরিয়া টানাটানি করিয়া কায়-ক্লেশে সাহেবকে কূলে আনিয়া হাজির করিল। ততক্ষণে সেখানে আর কেহ নাই—একা ভানুচাঁদ কেবল অবাক হইয়া দেখিতেছিল, এত কষ্টের মধ্যেও সাহেব হাতের বন্দুক, মুখের গালি—কোনটাই ছাড়েন নাই—ভানুচাঁদের সঙ্গেও একবার চোখাচোখি হইয়া গেল। কিন্তু সাহেব শুধু কটমট করিয়া তাকাইলেন, কিছু বলিলেন না। তারপর ঐ বাঁধের উপর দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া অবলীলাক্রমে ডজন-খানেক কমলালেবু উড়াইয়া সাহেব কিছু ঠাণ্ডা হইলেন। সঙ্গের লোকের হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল। খোসা স্তূপাকার হইয়া পড়িয়া রহিল।

শিকারীর দল অবশেষে বাদায় নামিল।

এ হেন ব্যাপারে শেষ না দেখিয়া কোন মতেই ফেরা যায় না। ভানুচাঁদ পিছনে পিছনে চলিয়াছে। হঠাৎ কিন্তু রসভঙ্গ ঘটিয়া গেল। সাহেব থমকিয়া দাঁড়াইয়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে ভানুচাঁদের দিকে তাকাইয়া আরদালিকে কি বলিয়া দিলেন। আরদালি আসিয়া কহিল, কি সাঙাৎ, যাওয়া হচ্ছে কোথায়?

সেই সুরেই ভানুচাঁদ জবাব দিল, বুকের ওপর দিয়ে হাঁটছি না তো? অত ব্যথা লাগছে কেন? জমিদারের জায়গা—আমারও না, কারো বাবারও না।

ইহার ঠিকমতো জবাব দিতে গেলে পাখীর সন্ধান স্থগিত রাখিয়া ঐখানেই দলসুদ্ধ ফিরিয়া দাঁড়াইতে হয়। সাহেব বোধকরি কথাবার্তা কিছুই শুনিতে পান নাই, গজেন্দ্রগতিতে তিনি আগাইয়া চলিলেন। ভানুচাঁদের পেশীবহুল লম্বা চওড়া দেহখানির দিকে তাকাইয়া আরদালিও আপাতত ক্ষমা করিয়া যাওয়া সমীচীন মনে করিল। সুর সপ্তম হইতে একেবারে খাদে নামিয়া আসিল। বলিল, যাও দাদা, তুমি চলে যাও। বাজে লোক সঙ্গে নিই নে আমরা। গোলমাল করে পাখী তাড়িয়ে দেয়।

ভানুচাঁদ বলিল, সে তো তোমরাই খুব পারবে। আমি তাড়াব

না—দুটো-একটা মারব। আচ্ছা পুবমুখোই চললাম তবে—তোমরা ঐ-দিকে যাও। ঠিক-ঠাক বন্দুক মেরো ভাই, আমার ওদিকটায় উড়ে যায় যাতে—

হাসিয়া একাকী সে মোড় ঘুরিল। যাইবার মুখে বাড়ি হইয়া গুরোল-বাঁশটা লইয়া গেল।

দলবল ফিরিয়া আসিয়া আবার যখন বাঁধের উপর উঠিল, তখন বেশ ঘোর হইয়া আসিয়াছে। আয়োজন একেবারে নিরর্থক হয় নাই, তারের খাঁচায় একটা মরা কাক। বাঁধের ধারে একটা টিপয় পড়িয়াছে, স্টিমারে উঠিতে আবার এখনি কাদায় পড়িতে হইবে, গোধূলির আলোটুকু থাকিতে থাকিতে সাহেব তাড়াতাড়ি তাই দু-হাতে মুখের মধ্যে রসদ বোঝাই করিতেছেন। হঠাৎ ওদিকে ভানুচাঁদ আসিয়া উঠিল। গান করিয়া হাসিয়া গুরোল-বাঁশ নাচাইয়া আস্ফালন করিতে লাগিল, এ হল দেশি বন্দুক—দেখ, ভাই সব। পোড়া মাটির গুলি—কার নাক ভাঙব বল? মন্তোর পড়ে ছাড়ব—চলে যাবে বোঁ-ও-ও-ও—

গর্ব করবার কথাই বটে। দড়ি দিয়া গোটা কুড়িক বুনো-হাঁসের পা বাঁধিয়া আনিয়াছে--কতকগুলি মরে নাই তখনো। তারই দু-তিনটা একসঙ্গে ডাকিয়া উঠিতে সাহেব চমকিয়া তাকাইয়া দেখিলেন। খাওয়া তখন প্রায় সমাধা হইয়াছে। আগাইয়া আসিয়া সাহেব বলিলেন, হাসিস কেন?

ভানুচাঁদ ভালোমানুষের মতো কহিল, ঐ কাকটা কি মরে পড়ে ছিল, না হুজুর মেরেছেন?

সে কথার উচ্চবাচ্য না করিয়া সাহেব বলিলেন, তোর ঐ পাখী-গুলো দিয়ে দে।

কেন?

একজনে ইঙ্গিতে ভানুচাঁদকে কাছে ডাকিয়া কহিল, বড্ড ভাল সাহেব রে? টাকা পাবি। দিয়ে দে—

ভানুচাঁদ কহিল, টাকা কি হবে? চৌধুরির খাই, কাঁসি বাজাই—টাকা চাই নে।

আরদালির সঙ্গে পরিচয় সকলের আগে। বোধকরি সেই সুবাদেই সে আরও তিন-চার জনকে লইয়া ভানুচাঁদকে একেবারে ঘিরিয়া ফেলিল। বলিতে লাগিল, পাখী ক'টা দাও ভাই। স্টিমারে সারেং-খালাসি সব বেটা হা-পিত্যেশ বসে বসে পথ তাকাচ্ছে। হুজুর বলে এসেছিলেন সবাইকে, রাত্রে গোস্ত হবে।

সাহেবও বেশি দূরে ছিলেন না, সমস্তই কানে যাইতেছিল। কালো রঙের সাহেব, অতএব কথা বুঝিতেও কিছু কষ্ট হয় না। অনেকটা আপনার ভাবেই বলিলেন, কি আশ্চর্য ব্যাপার! একটা পাখী আজ আমাদের ওদিকে ছিল না। ঐ কাকটা কেবল। নইলে কি আর—

অনেক বলাবলিতে ভানুচাঁদের বোধকরি অবশেষে করুণা হইল। আচ্ছা—বলিয়া সে পাখীর দড়ি খুলিতে বসিল। একজনে ছুটিয়া গিয়া তাদের খাঁচাটা টানিয়া আনিল। সাহেব শিস দিতে দিতে গুলির বাক্সে চাবি আঁটিতে লাগিলেন। আর একজনে উপদেশ দিল, একটা করে খোল ভাই। এমনি সময়ে হঠাৎ ভানুচাঁদ তড়াক করিয়া লাফাইয়া উঠিয়া যেন নৃত্য শুরু করিল।

উড়ে গেল, ইস—সমস্ত উড়ে গেল যে!

তারপর মিনিটখানেক শূন্য পানে সে এমনি ভাবে তাকাইয়া রহিল, মাথায় যেন তার বাজ পড়িয়াছে বা অমনি একটা কিছু। হাতে তখন সত্যই একটা পাখীও নাই। উড়িয়াছে বটে। নিতান্ত যেগুলা মরিয়া গিয়াছিল, উড়িতে উড়িতে সেগুলা টুপ করিয়া নদীর জলে পড়িয়া গেল। জ্যান্তগুলা সাদা পাখা নাড়িতে নাড়িতে নদীপারে অন্ধকারে মিলাইয়া গেল। দাঁত বাহির করিয়া সকলের মুখের দিকে তাকাইয়া ভানুচাঁদ হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিল।

ইহার পর সাহেবের আর ধৈর্য রহিল না, বজ্রগর্জন করিয়া উঠিলেন, রাগের বশে ইংরাজি বাংলার বাছ-বিচার রহিল না।

চালাকি পেয়েছিস, ইউ গাধা রাস্কেল? ধরে আন্ ওটাকে—ঘুঘু দেখেছে, ফাঁদ দেখে নি—

চিৎকার-গোলমালের মাঝখানে একে দুয়ে দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে দশ-বারো জন ঢালি ভানুচাঁদের পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। বাঁধের এদিকে-ওদিকে কাছাকাছি কোথাও উহারা ছিল নিশ্চয়। সাহেব চিৎকার করিতে লাগিলেন, কে আছিস, নিয়ে আয় আমার চাবুকটা স্টিমার থেকে। আর বেঁধে কাছে নিয়ে আয় ঐ বেটাকে এক্ষুণি—

চাবুক আনিতে সকলেরই উৎসাহ। চক্ষের পলকে পাঁচ সাত জনে কাদা ভাঙিয়া স্টিমারে উঠিয়া পড়িল। কিন্তু বাঁধিয়া আনারই লোকাভাব। যে রকম মালকোঁচা আঁটিয়া গুরোল-বাঁশ হাতে সারবন্দি সব দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে সকলেই সকলকে বিপুল উৎসাহে আগে ঠেলিয়া দেয়, নিজে কেহ আগাইতে চায় না। সাহেবের গর্জন সমভাবে চলিতে লাগিল, বন্দুক ঠুকিতে ঠুকিতে বাঁধের মাটি এক বিঘৎ বসিয়া গেল, অথচ আসামি নিতান্ত যদি নিজে হাত-পা বাঁধিয়া হাজির না হয়, তাহাকে আনিবার কোন ব্যবস্থাই শেষ পর্যন্ত হইয়া উঠিল না।

অনেক ঠেলাঠেলি তর্কাতর্কি পরামর্শের পর সকলে পিছাইয়া একেবারে গাঙের ধারে চলিয়া আসিল।

সাহেব গর্জন করিয়া বলিলেন, কি?

একজনে কহিল, বড্ড শাসাচ্ছে হুজুর, গাঙের জলে চুবিয়ে দেবে। সন্ধ্যাবেলা, শীতের দিন—

আর একজনে বলিল, চাবুক-টাবুক নয় হুজুর। যে ক'টা বন্দুক আছে, সব নিয়ে আসতে হুকুম দিন। ডাকাত-দুশমন এরা—পঙ্গপালের দল। এই ফাঁকার মাঝখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ও সমস্ত চালাকি কথা নয়।

হুজুর হুকুম দিলেন, আনো সবগুলো বন্দুক।

যে আজ্ঞে—বলিয়া তৎক্ষণাৎ আর একদল বন্দুক আনিতে

স্টিমারে উঠিল। তাদের দেরি হইতেছে বলিয়া আর একদফায় আরও ক'জন। হঠাৎ ভানুচাঁদ ও ঢালিরা হো-হো করিয়া হাসিয়া প্রান্তর-নদীকূল হাসিতে তরঙ্গিত করিয়া বাঁধ বহিয়া ধীরে ধীরে পাড়ার দিকে ফিরিয়া চলিল। সাহেবের হাতের বন্দুক যেমন ছিল তেমনি রহিল—পিছনে তাকাইয়া দেখেন, বন্দুক আনিতে একে একে সকলেই স্টিমারে গিয়া উঠিয়াছে; তিনিই কেবল একা। অন্ধকার বেশ গাঢ় হইয়া উঠিয়াছে। একদম কারো সাড়াশব্দ নাই। বিরক্ত কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন, সরলি নাকি সব?

স্টিমার হইতে জবাব আসিল, না।

সাহেব কৃতার্থ হইয়া কহিলেন, তা হলে বিছানা পেতে ঘুম হচ্ছে নাকি?

ইহারও বিনীত জবাব আসিল, আজ্ঞে না। একটু আহারাদি হচ্ছে।

রাত্রি প্রহরখানেক হইয়া গেল, কিন্তু একটু আহারাদি চলিতেই লাগিল, শেষ হইবার নাম নাই। নদীকূলে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া সাহেবের শীত ধরিয়া গিয়াছে। অধীর কণ্ঠে অবশেষে চীৎকার করিয়া উঠিলেন, ফাঁসির খাওয়া খেয়ে নিচ্ছিস বেটারা?

আজ্ঞে না। সামান্য।

জোয়ার এসে গেল যে!

কথাটা সত্য কি না পরখ করিতে একজন রেলিঙ দিয়া লণ্ঠন উঁচু করিয়া ধরিল। উচ্ছল তরঙ্গ প্রায় বাঁধের ধার অবধি ভরিয়া তুলিয়াছে, স্টিমার তরঙ্গের আঘাতে অল্প অল্প দুলিতেছে। খুশি হইয়া লোকটি বলিতে লাগিল, তবে তো সুবিধে হল হুজুর, জাহাজ ভেসে উঠেছে। একেবারে ডাঙার ধারে লাগাব। উঠা-নামার আর অসুবিধে হবে না। এই এলাম আমরা।

টুলে বসিয়া ঝিমাইতে ঝিমাইতে কোন সময়ে সারেঙের একটু ঘুম আসিয়া গিয়াছে। সাহেবের চেঁচামেচিতে চমকিয়া জাগিয়া উঠিয়া ভোঁ-ভোঁ করিয়া বাঁশী বাজাইল। সুতীব্র আলো পড়িল জলের উপর। একবার ডাহিনে একবার বা বামে ঘুরাইয়া আগাইয়া

পিছাইয়া অনেক কষ্টে অনেক যত্নে অবশেষে স্টিমার যখন কূলের কাছাকাছি আসিল, তক্তা ফেলিয়া দিতে সাহেব আর দৃক্‌পাত না করিয়া উপরে উঠিয়া আসিয়া একেবারে চিমনির ধারে চেয়ার টানিয়া বসিয়া পড়িলেন। শীতের হাওয়া দিতেছিল। সাহেব ইঙ্গিতে দেখাইয়া দিলেন পর্দা ফেলতে। যাহাকে বলা হইল, সে করিৎকর্মা লোক—কেবলমাত্র পর্দা ফেলিল না কেবিনে পুরু করিয়া বিছানাটাও পাতিয়া দিল।

কত রাত্রি তার হিসাব নাই, নদীর উপর স্টিমার পর্দা মুড়ি দিয়া পড়িয়া আছে। চারিদিক নিষুপ্ত, ইঞ্জিনের স্টিমে যেন একটা অতিকায় ঘুমন্ত জন্তুর নিশ্বাসের শব্দ হইতেছে। একজন খালাসি নিচের ডেকে শুইয়া শুইয়া নাক ডাকিতেছিল, হঠাৎ সে চমকিয়া উঠিল। কোথায় যেন ইঁদুর নড়িতেছে। খড়-খড় করিয়া পাতা-লতার বোঝা ঠেলিয়া ইঁদুরের মতো কি একটা বেড়াইয়া বেড়াইতেছে। তারপর খেয়াল হইল, বাড়িঘর তো নয়, স্টিমারে ইঁদুর আসিবে কোথা হইতে? সজাগ হইয়া চোখ বুঁজিয়া সে পড়িয়া রহিল। শব্দ শুনিল—স্পষ্ট খস-খস শব্দ—শিয়রের দিকে, খানিকটা ওধারে। স্টিমারে লণ্ঠন আছে পাঁচ সাতটা। এদিকটাতেও পোস্টের সঙ্গে একটা বাঁধা আছে বটে, কিন্তু ঝুলকালিতে তার এমন অবস্থা যে আলোর চেয়ে সেটা আঁধারই বাড়াইয়াছে বেশি। হঠাৎ জলের মধ্যে একটা ভারী বোঝা পড়িয়া যাওয়ার মতো শব্দ হইল, লাফাইয়া উঠিয়া পর্দার ফাঁকে মুখ বাড়াইয়া সে দেখে, কুয়াসামগ্ন জ্যোৎস্নায় ভরা-জোয়ারে একখানা নৌক স্টিমারের গা ঘেঁসিয়া দ্রুত পলাইয়া যাইতেছে। চকিতে অমনি একটা সন্দেহ মাথা চাড়া দিয়া উঠিল, তাড়াতাড়ি আগাইতে গিয়া কমলালেবু পায়ে ঠেকিতে লাগিল, পায়ের আঘাতে কতকগুলো জলে ছিটকাইয়া পড়িল, কতকগুলো পায়ে পায়ে চেপ্টা হইয়া গেল। আলো খুলিয়া আনিয়া বিস্তর কষ্টে ঠাহর করিয়া দেখে, যা ভাবা গিয়াছিল তাই, নৌকা যে চুপি-চুপি আসিয়া কেবল স্টিমার দেখিয়া

ফিরিয়া গিয়াছে তাহা নয়, সাহেবের বাছাই-করা গণিয়া-রাখা লেবুর দুটো ঝুড়িই অন্তর্ধান করিয়াছে—আর কি কি গিয়াছে ভাবিয়া-চিন্তিয়া হিসাব করিয়া দেখিতে হয়। মহা হৈ-চৈ পড়িয়া গেল, আরও লণ্ঠন জ্বলিল, বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ হইতে লাগিল। সাহেব ট্রাউজারের ফিতা কষিতে কষিতে ঘুমচোখে ছুটিয়া আসিলেন। বৃত্তান্ত শুনিয়া ঘুম তো উড়িয়া গেল চক্ষের পলকে, সাহেব গুম হইয়া রহিলেন, পাঁচ-সাত মিনিট কথা বলিতে পারিলেন না। তারপর হুঙ্কার দিয়া উঠিলেন, ওঠো—চল সব—

উঠিতে তো কারো বাকি নাই, কিন্তু চলিতে বলিলেই চলা—এই শীতের রাত্রে সেটা বড় সহজ কথা নয়। পর্দার একটু কোণ তুলিয়া দেখিতে গিয়া হাড়ের মধ্য অবধি কনকন করিয়া ওঠে, এ অবস্থায় চোর ধরার চেয়ে কম্বল জড়াইয়া আবার শুইয়া পড়িতে সকলের উৎসাহ বেশি। নৌকা দৃষ্টিসীমার একেবারে অতীত হইয়া গিয়াছে কিন্তু সাহেবের বোধ করি মনে মনে তখনও আশা, চোরের দু-হাত যখন নৌকা বাহিবার কাজে ব্যস্ত, তখন ঝুড়ি শেষ করিয়া ফেলিবার ফাঁক এখনো হাত দু-খানার হয় নাই। অতএব সেই ফাঁক পাইবার আগেই গিয়া পড়িতে পারিলে কাল সকালবেলা এই লোনা জলের দেশে আর যাই হোক একেবারে নির্জলা উপবাস করিয়া মরিতে হইবে না। তাড়াতাড়ি কোন গতিকে সজ্জা সমাপন করিয়া সকলের আগে তিনি কূলে নামিয়া দাঁড়াইলেন।

কাজেই ওদিকেও সমারোহে তোড়জোড় আরম্ভ হইল। নৈশ শীত-বায়ুতে সাহেব একাকী ঠকঠক করিয়া কাঁপিতে শুরু করিয়াছেন, চেঁচাইয়া জোর দেখাইবার মতো অবস্থাও আর নাই। শেষ পর্যন্ত আবার সিঁড়ি বহিয়া উঠিয়া একটা একটা করিয়া হাত ধরিয়া সকলকে নামাইতে হইবে কিনা ভাবিতেছেন, এমনি সময় হাতিয়ার-পত্র লইয়া সাঙ্গোপাঙ্গেরা হুড়মুড় করিয়া বীরবিক্রমে নামিয়া আসিল।

কোন দিকে তিলমাত্র সাড়াশব্দ নাই, নির্জন অস্পষ্ট জ্যোৎস্না থমথম করিতেছে। ক্রমে ঢালিপাড়ার কাছাকাছি আসিয়া তারা

আলোর ধারে সারবন্দি দাঁড়াইল। বাবলাবনে অজস্র জোনাকি ঝিকমিক করিতেছে। পিছনের একজন আগে আসিয়া সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিল, কোথায় যাওয়া হচ্ছে হুজুর ?

চলিতে চলিতে দেহ ইতিমধ্যে একটু গরম হইয়া উঠিয়াছিল। সাহেব ব্যঙ্গ করিয়া বলিলেন, নেমন্তন্ন খেতে।

লোকটি বলিল, আজ্ঞে না, খাওয়াতে—সে বুঝেছি। কিন্তু কথাটা বুঝে দেখুন হুজুর। রাত্রিবেলা। কে কি রকম মানুষ—একেবারে পাড়াসুদ্ধ ঘাঁটা দেওয়া—বুঝে দেখুন কথাটা—তার চেয়ে কাল সকালে বরং—

সাহেব বলিলেন, বলেছ ভাল। তবে এক কাজ কর। চর হয়ে তুমি বরঞ্চ দেখে এস। আমরা দাঁড়াই এখানে।

লোকটার মাথায় আকাশ ভাঙিয়া পড়িল, এমন জানিলে হিতোপদেশ দিতে কদাপি আসিত না। দশজনের পরামর্শ মতোই সে মুখপাত্র হইয়া আসিয়াছিল। উদ্দেশ্য, চোর ধরাটা এইভাবে আপাতত স্থগিত হইয়া যাইবে। উল্টো-উৎপত্তি হইয়া বসিতে সে হতভম্বের ভাবে পিছনে সঙ্গীদের দিকে তাকাইয়া রহিল। রাত্রে ভাল মুখ দেখা যায় না, কিন্তু সাহেবের কথাবার্তা একটুকুও যে আর কারো কানে গিয়াছে ভাবভঙ্গিতে এমন মনে হইল না। সহযাত্রী হইতে কেহই আগাইল না, একটা মুখের কথাও কেহ বলিল না।

সাহেব পুনশ্চ বলিলেন, সেই ভাল হে। তুমি চলে যাও, চুপি-চুপি সন্ধান নিয়ে এস। বুঝে দেখলাম বটে, সমস্ত পাড়া ঘাঁটানো ঠিক নয়।

বোধকরি আকাশের ক্ষীণ চন্দ্রকেই সাক্ষী করিয়া লোকটা তখন করুণ মুখে অগ্রসর হইল। সাহেব পিছন হইতে বলিলেন, ফিরো কিন্তু—ডুব দিয়ে বোসো না। দাঁড়িয়ে রইলাম—

দুর্গা। দুর্গা। ও কি কথা ?

সে মনে মনে যা করিতে করিতে গেল সেটা প্রকাশ করিয়া বলার কথা নয়। কিন্তু ফিরিয়া আসিল অনতিপরেই। উৎফুল্ল স্বর।

ফিস-ফিস করিয়া কহিল, আসুন। গুড়ি মারিয়া সে আগে আগে চলিল।

সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, গিয়েছিলে তো সত্যি সত্যি?

এই দেখুন সে এসে—বলিয়া রাগের বসে ধাঁ করিয়া লোকটি পাশের উঠানে ঢুকিয়া পড়িয়া কি কতকগুলা তুলিয়া আনিল। লণ্ঠন ধরিয়া দেখা গেল, লেবুর খোসা।

চোরেরা বুদ্ধিমান সন্দেহ নাই, বমাল বোধ করি শেষ করিয়াই রাখিয়াছে, হাতে-নাতে ধরিয়া ফেলার উপায় রাখে নাই। দারুণ আক্রোশে সদলবলে সাহেব সেই উঠানে গিয়া উঠিলেন।

অনেকক্ষণ হইতেই একটা একটানা আওয়াজ আসিতেছিল, যেন বিশ-পঁচিশটা কামারশালে হাপর টানিতেছে। উঠানে যাইতেই সেটা আরো প্রবল হইয়া কানে যাইতে লাগিল। নজর করিয়া দেখা গেল, হাপর নয়—নাক। খোলা দাওয়ায় মাছুরের উপর মরদগুলা পাহাড়ের মতো পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছে। সেই পাহাড়ের নাসারন্ধ্র দিয়া যেন ঝড় বহিয়া যাইতেছে। সাহেব বন্দুকের ঘোড়া টিপিলেন, নিশীথ রাত্রে নদীকূলে সেই আওয়াজ ধ্বনিত হইয়া ফিরিতে লাগিল। লোকগুলা কিন্তু পাশ ফিরিয়া শুইল না।

বন্দুকে হইল না—ইহার পর একটিমাত্র উপায়, বন্দুকের কুঁদা দিয়া নাড়িয়া চাড়িয়া দেখা। বোধ করি তারও অন্যথা হইত না, সাহেব একেবারে মরীয়া—কিন্তু তার আগেই হঠাৎ একটি দীর্ঘ ছায়ামূর্তি রাস্তা হইতে ছুটাছুটি করিয়া একেবারে উহাদের মাঝখানে আসিয়া দাঁড়াইল।

সাহেব হাঁকিলেন, খাড়া রও—

লোকটি হুকুম মান্য করিল; ঘাড় নিচু করিয়া সেলাম করিল।

তুমি কে?

লোকটি বলিল, সর্দার। আমি বাড়ি ছিলাম না। ছোঁড়াগুলো গোলমাল করেছে নাকি কর্তা?

দলের সর্দার সামনে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে, সাহেব মনে মনে ভারি ফূর্তি করিয়া রঘুনাথকে তাক করিয়া বন্দুক উঠাইলেন।

রঘুনাথ একেবারে হাউমাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিল। মারবেন না কর্তা। একদম মরে যাব। রক্ষে করুন।

সাহেব অটল। বন্দুক তেমনি ধরাই আছে। দৃঢ়ভাবে ঘাড় নাড়িলেন। চোর তোরা সব—

আজ্ঞে না, কক্ষণো না। আমরা বুঝি নে কিছু। দোষদিষ্টি মাপ করুন—নাবালক আমরা।

চাঁদের মৃদু আলো, তার উপর গোটা দুই-তিন লণ্ঠনের আলো রঘুনাথের কাঁচাপাকা দাড়ির উপর আসিয়া পড়িল। নাবালকের কথায় সাহেবের লোকজন সকলে হাসিয়াই খুন। ইহার পর বন্দুক দেখাইয়া কি হইবে। হাত নামাইয়া হাসিমুখে সাহেব বলিলেন, তা সত্যি, দাড়ি দেখে নাবালক বলেই ঠেকছে বটে। মারব না তোকে। আচ্ছা ঐগুলোকে তোল—দেখি, ওরাই বা কি?

রঘুনাথ শেষের কথায় মনোযোগ না দিয়া দাড়িতে হাত বুলাইয়া বলিল, আজ্ঞে, এ দাড়ি কিন্তু আমার নয়—

কার?

কালী করালীর।

এবারে হাসির তুমুল রোল উঠিল। সাহেব অনেক কষ্টে হাসি সামলাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কালী করালীর দাড়ি উঠল কবে?

রঘুনাথ কিন্তু হাসি-ঠাট্টার ধার দিয়াও গেল না; গম্ভীর হইয়া বলিতে লাগিল, ওপারে বরণডাঙায় মস্ত এক ওস্তাদ আছে— চিন্তামণি। তার সঙ্গে একবার শখের খেলা খেলতে গিয়েছিলাম। মেরে ভূত ভাগিয়ে দিল। শিবনারায়ণ ঘোষ আর চৌধুরি মশায় দু-জনে বড় ঠাট্টা করলেন। কালীমায়ের নামে মানত করে সেইদিন চুল-দাড়ি রাখলাম। মা দিন দেন তো চিন্তামণিকে হারিয়ে দিয়ে চুল-দাড়ি তাঁর পায়ে নামিয়ে আসব একদিন।

একজনে টিপ্পনী কাটিল, আজকে যা নমুনা দেখলাম, সর্দার, ও দাড়ির আশা কালামায়ের কোনকালে নেই।

নিতান্ত কৃতার্থ হইয়া একগাল হাসিয়া রঘুনাথ বলিল, আজ্ঞে, আমারও এর পরে বড্ড মায়া—

হঠাৎ ব্যস্ত হইয়া ছুটিয়া ঘর হইতে একটা মাদুর আনিয়া বলিল, বসুন কর্তা। তামাক সাজব ?

এত আপ্যায়নেও সাহেব বসিলেন না। বলিলেন, না—ডাক্ ওদের।

স্টিমারে পৌঁছে দিয়ে আসতে হবে নাকি ?

হ্যাঁ। আর আমার সেই নেবুর ঝুড়ি দুটো। সেই সঙ্গে আর যা যা নিয়ে এসেছ। সাহেব বলিতে লাগিলেন, এই যদি করে তো ভাল, নইলে তোমার কোন চালাকিতে ভুলছি নে।

রঘুনাথ জিভ কাটিল। বলেন কি কর্তা ? চালাকি করলাম কখন ? কিন্তু ওরা তো সে রকম ছেলে নয়। কর্তার জিনিসপত্তোর আর কারা নিয়ে গিয়েছে। আপনারা ভুল করে এ-পাড়ায় এসেছেন।

আর এগুলোও ভুল করে এসেছে নাকি ? যে লোকটাকে কপাল-ক্রমে চর হইতে হইয়াছিল, জ্যোৎস্নার আলোয় আঙুল দিয়া সে উঠানের পাশে দেখাইয়া দিল।

তবু রঘুনাথ তর্ক ছাড়ে না। ও খোসা—নেবু তো নয়। আপনি একবার বুঝে দেখুন কর্তা।

এমন সময় ভানুচাঁদ হঠাৎ দাওয়ার উপর পাশমোড়া দিয়া উঠিয়া বসিল।

গোলমাল কিসের ?

রঘুনাথ একেবারে তেলে-বেগুনে জ্বলিয়া উঠিল।

হারামজাদা, খোসা কুড়িয়ে এনে উঠোনে রেখে এখন নাকে-তেল দিয়ে ঘুমুচ্ছিস। দিল যে এদিকে সাবাড় করে।

ভানুচাঁদ দাওয়া হইতে লাফাইয়া উঠানে পড়িল। রঘুনাথ বলিতে লাগিল, নেবু আনিসনি তা জানি, কিন্তু খোসাই বা আনতে গেলি

কেন ? পানের মসলা হবে ? ও-ও তো কর্তার। ধর্, পায়ে ধর্—তা হলে দয়াময়ের রাগ পড়ে যাবে—

ভানুচাঁদ বিদ্রূপের কণ্ঠে কহিল, তাই ধরতে দেবে সাহেব ? দেবে নাকি ? তা একা তো নই। দলবল ডাকি ? আয়রে জিতু, ভোলা, মহেশ—চলে আয় পা ধরতে।

হি হি করিয়া হাসিতে হাসিতে ভূতের মতো একের পর এক ছায়ামূর্তি হঠাৎ দাওয়া হইতে নামিয়া আসিল। তারপর আনাচ-কানাচ হইতে আরও অনেকে ছুটিয়া আসিয়া পাশাপাশি দাঁড়াইতে লাগিল। ভানুচাঁদ হাসিতে হাসিতে বলিল, এস সর্দার, তুমি ধরবে সাহেবের ডান ঠ্যাং আর আমি বাঁয়েরটা। দেখা যাক টেনে, গায়ের বল কার বেশি—তোমার না আমার। আর তোরা যা ঐ নন্দী-ভৃঙ্গীগুলোর দিকে। দু-দু'জনে এক একটাকে নিয়ে পড়।

যে কথা সেই কাজ। তে-রে-রে করিয়া ভক্তিমান জোয়ানগুলা লাফাইতে লাফাইতে পা ধরিতে আসিল। সাহেব আর দিশা না পাইয়া বন্দুক ছুঁড়িলেন। সঙ্গে সঙ্গে আরও দু-তিন জনে ছুঁড়িল। বাবলাবনে কয়েকটা পাখী জাগিয়া উঠিয়া কিচমিচ করিয়া উঠিল।

ও বাবা গো—বলিয়া রঘুনাথও সঙ্গে সঙ্গে মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

বিস্মিত, নিশ্চেতন পাথরের মতো চাষিরা। ছুটিয়া আসিয়া সকলে রঘুনাথকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল। তারপর ক্রন্দনাকুল শত কণ্ঠ নৈশ বাতাসে ধ্বনিত হইতে লাগিল, সর্দার! সর্দার!

সাহেবও হতভম্ব হইয়া গেছেন। পিছনের লোকেরা অবাক্। ভীত বিপন্ন দৃষ্টিতে সাহেব তাদের দিকে তাকাইয়া বলিলেন, কে ছর্‌রা দিয়েছিলি ? ফাঁকা দেওড় করবার কথা ছিল না ?

তাই তো হয়েছে।

তাই হয়েছে। সহসা গভীর গর্জনে সাহেব চমকিয়া স্তব্ধ হইয়া গেলেন। সর্দারের চারিপাশে ভিড় করিয়া যারা দাঁড়াইয়া বসিয়া

ছিল, সকলের মধ্যে মাথা উঁচু করিয়া ভানুচাঁদ বলিয়া উঠিল, তোমরা থাক এখানে—সর্দার মরছে। কিন্তু যারা মারল ওকে, আমি তাদের সঙ্গে মোলাকাৎটা সেরে আসি।

লাফাইয়া উঠিয়া ছুটিয়া সে সাহেবের দলের মধ্যে ঝাঁপাইয়া পড়িতে যায়। রঘুনাথের জ্ঞান ছিল, সে ভানুর হাত ধরিয়া ফেলিল। ক্ষীণ কণ্ঠে মানা করিতে লাগিল, যাস নে রে ভানুচাঁদ, আমার কথা শোন্—যাস নে।

ভানুচাঁদ মাথার ঝাঁকড়া চুল ঝাঁকাইয়া বলিয়া উঠিল, ভয় নেই—তোমার জ্ঞান থাকতে থাকতেই ফিরে আসব। মরবার সময় খানিক হেসে মরতে পারবে সর্দার। আমি আসি—হাত ছাড়—

রঘুনাথ হাত ছাড়িল না। বলিতে লাগিল, তোরা বাবারা নিমিত্তের ভাগী হতে যাস নে, আমার শেষ-কথাটা শোন। নির্দোষীকে খুন করে গেল, ওদের ফাঁসি হবেই। কোম্পানির রাজত্বে নিস্তার নেই কোন রকমে।

ভানুচাঁদ হাত ছাড়াইবার জন্য ছটছট করিতে লাগিল। কিন্তু মরিতে বসিয়াও রঘুনাথের গায়ের বল কম নয়। আবার মুমূর্ষুর গায়ে কোনক্রমে ব্যথা না লাগে—অধীর কণ্ঠে ভানুচাঁদ কহিতে লাগিল, ঐ ওরা পালিয়ে গেল। ছাড়—ছাড়—

রঘুনাথ কাতরাইতে কাতরাইতে কহিল, যাবে কোথায়? কোম্পানীর জাল পাতা রয়েছে। তুই বড্ড ক্ষেপা ভানুচাঁদ। আমার সামনে তোরা সার বেঁধে দাঁড়া—আর যারা আছে সবাইকে খবর দে—কেউ যেন বাদ না থাকে। আমার এই শেষ-হুকুম।

ভানুচাঁদ বলিয়াছিল ঠিকই। এদিকে যখন একের পর এক সমস্ত চালিপাড়ার মেয়ে-পুরুষ মুমূর্ষুকে ঘিরিয়া আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সাহেবের দল ততক্ষণে ত্বরিত পায়ে ষ্টিমারে চড়িয়া সিঁড়ি তুলিয়া লইল। সাহেব বারম্বার দাঁত-মুখ খিঁচাইয়া বলেন, ষ্টিমে জোর দে শূয়ার ব্যাটারা, আরও জোর—

জল কাটিয়া পূর্ণ বেগে ষ্টিমার ছুটিতেছে। কেবিনে গিয়াও

সাহেব ভিড়াইতে পারিলেন না—বারম্বার মনে হয়, পিছনে পিছনে ফাঁসের দড়িও বুঝি সমান বেগে ছুটিয়া আসিতেছে। সারেঙ ও খালাসিগুলা উদ্ব্যস্ত হইয়া উঠিতেছে, সাহেব হাঁকিতেছেন, জোরা চালা—আরও—

(৬)

বোধকরি অত কথা কহিবার শ্রমেই রঘুনাথ অবসন্ন ভাবে চোখ বুজিয়া এলাইয়া পড়িল। বুকে কোথায় আঘাত লাগিয়াছে, উপুড় হইয়া দুইহাতে সেই আহত স্থান চাপিয়া ধরিয়াছিল। সন্তর্পণে হাত একটু সরাইয়া দিয়া জায়গাটা দেখিবার চেষ্টা হইতেই হি-হি করিয়া হাসিতে হাসিতে মরণোন্মুখ রঘুনাথ তড়াক করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

বলিল, তাড়িয়ে দিলাম চালাকি করে। দেখ তো—

আর দেখিবার কিছু নাই। স্টিমার ততক্ষণে বাঁক পার হইয়া পূর্ণবেগে চলিয়াছে। দলসুদ্ধ হাসিয়া ধূলার উপর লুটোপুটি খাইতে লাগিল।

রঘুনাথ বলিল, সাহেব লোক—গোলমাল করতে আছে? কে জানে হয়তো বা জলদারোগা-টারোগা হবে। বাঘে ছুঁলে আঠারো ঘা। দেখ তো কত দূর গেল।

দেখিবে আর কি, কান পাতিয়া কয়েক মুহূর্ত একটু স্থির হইয়া শুনিল—একটা গুমগুম আওয়াজ ক্রমশ অস্পষ্ট হইয়া দূরে মিলাইতেছে। রঘুনাথ হাসিতে হাসিতে বলিল, সাহেব কিন্তু বড্ড দাগা পেয়ে গেল। ও হারামজাদারা, বলি নেবুগুলো সব সাবাড় করেছিস নাকি?...কিন্তু এ সমস্ত কি খেলা হচ্ছে, বল দিকি? চৌধুরি মশাই আসছেন, কাজকর্ম রয়েছে—আমি তো ফিরে এসে দেখে শুনে ঘাবড়ে গিয়েছিলাম, এ আবার কি গেরো!

চৌধুরির আসিবার কথায় সকল কথা তলাইয়া গেল। একসঙ্গে বিশ-পঁচিশটা ব্যগ্র কণ্ঠ, কখন আসবেন তিনি? কখন? কখন?

এই রাত্রে।

আনন্দে মরদগুলার লাফাইয়া নাচিতে ইচ্ছা করে। বলিল, উঃ—কত দিন পরে। মশালের যোগাড় রাখব নাকি সর্দার ?

রঘুনাথ বলিল, সেকথা হয় নি তো—সে সমস্ত বোধ হয় নয়। চৌধুরি মশায় শুধু বললেন, আমি যাব—তুমি এগুতে লাগ সর্দার।

ঢালিপাড়ায় কেহ ঘুমায় নাই। কাঠের বড় বড় কুঁদা জ্বলিতেছে, তাহাই ঘিরিয়া সকলে জাগিতেছে। নানারকম গল্প চলিতেছে, দা-কাটা তামাক পুড়িতেছে খুব। তারপর জ্যোৎস্না ডুবিয়া গেল। চারিদিকে আবছা অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ শোনা গেল, ঘোড়ার খুরের শব্দ—খটাখট-খটাখট—লোকগুলা উঠিয়া দাঁড়াইল।

নরহরি চৌধুরি একলাফে নামিয়া সকলের সামনে দাঁড়াইলেন। গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, কাল সকালে পঁচিশখানা লাঙল নামবে বউভাসির চকে—

আনন্দোচ্ছল সুরে ভানুচাঁদ জিজ্ঞাসা করিল, চকটা তা হলে দিয়ে দিয়েছে ওরা ? ভাল হল চৌধুরি মশায়, বেশ হল—খাসা হল—

চৌধুরি হাসিলেন। এ হাসি রঘুনাথ আগে দেখিয়াছে, দেখিয়া শিহরিয়া উঠিল। রঘুনাথের দিকে তাকাইয়া নরহরি প্রশ্ন করিলেন, কেউ জানে না বুঝি এখনো ? সঙ্গে সঙ্গেই মনে পড়িয়া গেল, কত বড় নিরর্থক এই প্রশ্ন। নরহরি নিজে আসিয়া না বলা পর্যন্ত তাঁর কথা অতিবড় সুহৃদকেও ভুল করিয়া রঘুনাথ বলিবে না—ইহা চিরদিনের বিধি।

নরহরি হাসিয়া উঠিয়া বলিতে লাগিলেন, ওরা চক দেয় নি ভানুচাঁদ, আমাদের নিয়ে নিতে হবে। খান পঁচিশেক লাঙল এখানে এসে পৌঁছবে রাতারাতি। কাল তোমরা পঁচিশ জনে তাই নিয়ে চকের খোলে নামবে।

ভানুচাঁদের মুখ এক মুহূর্তে ছাইয়ের মতো হইল, তার সকল উৎসাহ নিভিয়া গেল। হাতের লাঠিখানার উপর সে মাথাটা কাত করিয়া দিল।

রঘুনাথ পাশে দাঁড়াইয়া ছিল। বলিল, কি হল রে ভানু?

ভানু নিরুত্তর।

একটুখানি ঠেলা দিয়া রঘুনাথ আবার ডাকিল, কথা বলছিস না কেন? কি হল তোর?

ভানুচাঁদ বলিল, ওসব আমি পারব না সর্দার। মাথা নাড়া দিয়া বলিতে লাগিল, না—কিছুতেই পেরে উঠব না, বুঝলে? সেদিন এল কোদাল, আজ আসছে লাঙল। তবু তো কোদালের কাজ ছিল রাত্তিরবেলা। দিন দুপুরে চাষাদের সঙ্গে লাঙল ঠেলতে পারব না আমি।

বলিতে বলিতে ভানুচাঁদের গলা ধরিয়া আসিল।

প্রায় সমস্ত কথাই নরহরির কানে যাইতেছিল। বলিলেন, ও রঘুনাথ, বলে কি ছোকরা?

রঘুনাথ, বলিবার আগেই ভানুচাঁদ আগাইয়া গিয়া দাঁড়াইল। বলিল, চৌধুরি মশায়, তোমার কামারে কেবল কোদাল আর লাঙলই গড়ছে—সড়কি বল্লম গড়ে না আজকাল? ছিলাম ঢালি, এখন কি চাষা বানিয়ে তুলবে আমাদের?

চৌধুরি হাসিতে লাগিলেন। তারপর বলিলেন, হুকুম দিয়ে দিয়েছি বাপু, হাকিম নড়বে তো হুকুম নড়বে না। কাল সকালে পঁচিশখানা লাঙল চকে নামবেই—আর বাঁধের উপর বসে তামাক-টামাক খাবে আরও জন পঞ্চাশ। তা ছাড়া গাঙের খোলে নৌকোর মধ্যে—ঘুমোতে পারে, দাবা-পাশা খেলতে পারে—তা-ও ধর আর শ-খানেক আন্দাজ। তুমি কোন দলে থাকবে ভানুচাঁদ?

ভানুচাঁদ আগ্রহের সুরে তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, আমার ঐ তামাক খাওয়ার কাজ। লাঠি আর হুঁকো নিয়ে বাঁধে আমি টহল দিয়ে দিয়ে বেড়াব—ঐটে বেশ পারব।

প্রসন্নমুখে সকলের দিকে তাকাইয়া নরহরি ঘোড়ায় চড়িয়া সপ্ করিয়া চাবুকের ঘা দিলেন। মুখ ফিরাইয়া বলিলেন, কিন্তু লাঙলের কাজটাও মন্দ ছিল না হে। মাটি চষতে হবে না বেশি—বরণডাঙার

কেউ যদি আসে, বুকের উপর দিয়ে কলা টানতে হবে। পারবে না তোমরা?

হাঁ, হাঁ—করিয়া অনেকগুলা কণ্ঠস্বর বাঘের মতো গর্জন করিয়া উঠিল। দেখিতে দেখিতে নরহরি অদৃশ্য হইয়া গেলেন। ঢালিরা যে যার ঘরে ফিরিতে লাগিল। ভানুচাঁদকে উদ্দেশ করিয়া রঘুনাথ বলিল, লাঙল একটু ধরে-টরে রাখলে বুদ্ধির কাজ হত কিন্তু। এই যেমন আজকের কাণ্ড—কোম্পানির নজর পড়ে যাচ্ছে, পুরানো দিনকাল আর থাকছে না বাপু। বন্দুক-গুলিগোলার পাল্লায় লাঠি আর কতদিন?

ভানুচাঁদ হাসিয়া বলিল, যতদিন এই হাত দু'খানা কাটা না যাচ্ছে সর্দার। মরদ-মানুষের হাত থাকবে, লাঠি থাকবে না—এ কি রকম কথা।

পায়ের নিচে জোয়ারের জল ছলছল করিয়া লাগিতেছে। রঘুনাথ বড় স্নেহে ভানুচাঁদের কাঁধে হাত রাখিল। ভানুচাঁদ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মুখের সামনে মুখ আনিয়া বলিতে লাগিল, ভাবছ কেন সর্দার? যতদিন চলে চলুক। যখন চলবে না, গাঙের জল তো আর শুকিয়ে যাবে না?

(৭)

সৌদামিনী ঠাকরুনের পানসি কসবা হইতে ফিরিতেছিল। খুব ভোরবেলা, অল্প অল্প কুয়াসা করিয়াছে। মালাধর বলিল, ভাল দেখা যাচ্ছে না মা, উই যে কালো কালো—উঁহু-উঁহু ওদিক কেন? ওদিককার ওসব হল বাঘা চৌধুরির—আমাদের চকের সীমানা দক্ষিণের ঐ বাবলাবন থেকে।

চিন্তামণি পিছনের গলুয়ে তামাক সাজিতেছিল। কলিকা ফেলিয়া মচ-মচ করিয়া ছই-এর উপর দিয়া চলিয়া আসিল। মালাধরের নির্দেশমতো ঠাহর করিবার চেষ্টা করিল। কিন্তু সোজা বাঁশের লাঠি লইয়া চিরকার কারবাল, সীমানা-সরহদ্দ তল্লাস করিবার

ধৈর্য তার ধাতে নাই। কোটরের মধ্যে চোখ দু'টা চক-চক করিয়া উঠিল। বলিল, মা-ঠাকরুন, ডাকব একবার কর্তাভাইকে? তুমি একেবারে এক রাজ্যি কিনে ফেলেছ, দাদাভাই আমার দেখবে না একটু?

এলোমেলো শয্যায় কীর্তিনারায়ণ অঘোরে ঘুমাইয়া আছে, হাত-পা গুটাইয়া এক জায়গায় আসিয়াছে। ঘোড়ায় চড়িতে গিয়া আছাড় খাইয়া কপাল কাটিয়া গিয়াছিল, তার দীর্ঘ রেখা জয়পত্রের মতো আঁকিয়া আছে। চিন্তামণি দুই পা আগাইয়া লেপটা আস্তে আস্তে কীর্তিনারায়ণের গায়ের উপর তুলিয়া দিল। এবারে মালাধরের দিকে চাহিয়া বলিতে লাগিল, তুমি কি বল গো সেন মশাই, নৌকাটা লাগান যাক এইখানে? দাদাভাইকে কাঁধে নিয়ে চকের উপর দিয়ে সোজা দেব এক ছুট। তোমার এই পানসির আগে আগে গিয়ে বাড়ি উঠব। রাজা তার রাজ্যপাট দেখবে না, তাই কি হয়?

মালাধর ঘাড় নাড়িয়া তৎক্ষণাৎ সায় দিল, নিশ্চয়, নিশ্চয়—দেখবেন বই-কি। ঐ একবার ছায়া দেখিয়ে গেলেই হল। তারপর আমি রইলাম আর রইল চকের প্রজাপাটক। নজর নিদেনপক্ষে ষোল আনা ধরলেও একটি হাজার। এখন না দেয়, খাজনা দিতে তো আসতে হবে—তখন? আরে, আরে—বেটারা বেয়েই চলল যে! ডাইনে মেরে ধর্ নৌকো।

সৌদামিনী ইহারই মধ্যে একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িয়াছিলেন। চোখে তাঁর জল আসিয়াছিল। ঐটুকু এক চকে চিন্তামণির এত আহ্লাদ, আর পুরানো আমলে কর্তা যে দিন নারিজির-ঘেরির গোটা তালুক কিনিয়া ফেলিলেন! সে একদিন গিয়াছে। পাইক-বরকন্দাজরা সমস্ত দিন আমরুল শাক ঘসিয়া ঘসিয়া চাপড়াশ সোনার মতো চকচকে করিয়া ফেলিল। তারা আগে আগে চলিল, পিছনে কর্তার পালকি, তার পিছনে পঙ্গপালের মতো কর্তার হাতে-ধরিয়া-শেখানো লাঠিয়ালের দল। পাকা বাঁশের দীর্ঘ লাঠি উঁচাইয়া সারবন্দি সকলে চলিয়াছে। সে-সব যেন কালিকার কথা। মাসটা বৈশাখ,

বড় গরম, যাই-যাই করিয়া রওনা হইতে একেবারে ঘোর হইয়া গেল। আকাশে খণ্ড-চাঁদ উঠিতেছে। সৌদামিনী হাসিয়া বলিয়াছিলেন, বিয়ে করতে চলেছে যেন! উলু দেব? কর্তা রসিকতা করিয়া একটা সংস্কৃত শ্লোক আওড়াইলেন—আর ঘর-ফাটানো হাসি! শ্লোক বলিতেন তিনি কথায় কথায়, সে সব সৌদামিনী এক বর্ণ বুঝিতেন না—হাসিটা কিন্তু আজো স্পষ্ট কানে বাজে। হাসি তো নয়—যেন জোয়ারের ঢেউ, চারিদিক একেবারে তোলপাড় করিয়া দিত।

আগে জমিদারি ছিল না, ঐ নাজির ঘেরি হইতে জমিদারির পত্তন। সৌদামিনীর বড় ভাই ভগ্নীপতিকে সদুপদেশ দিয়া পাঠাইলেন, বিষয়-সম্পত্তি কিনে গেলেই হয় না। ভাল করে আর একবার ভায়াকে বিবেচনা করতে বোলো, এ চাতালের উপর বসে ভুঁড়ি দুলিয়ে পুঁথিপড়া নয়। শিবনারায়ণ এদিকে ভালমানুষ লোক, সংস্কৃত ও ফারসি জানিতেন চমৎকার। সে আমলের কালেক্টরির বাংলানবিশ দেওয়ান। লাঠি খেলিতেন, কুস্তি করিতেন, আর অবসর পাইলেই পণ্ডিত মহাশয়দের লইয়া কাব্যচর্চা হইত। কিন্তু জমিদার হইয়া কাব্যের পুঁথি ক্রমশ সিন্দুকে উঠিল। দেখাইয়া দিলেন, সম্পত্তি রক্ষা করিয়া বাড়াইয়া-গুছাইতেও সক্ষম তিনি। কর্তা থাকিলে আজ কি এমনটা হইত, সৌদামিনীকে এমন ছুটাছুটি করিয়া বেড়াইতে হইত? সেদিনের লজ্জাবতী বধূ আজ বাঘিনীর মতো ঠাটটা আগলাইয়া বসিয়া আছেন। যখন-তখন ছেলের দিকে চাহিয়া নিশ্বাস পড়ে, কবে যে সে মানুষ হইয়া উঠিবে!

হঠাৎ নৌকা ঘুরিয়া যাইতে সৌদামিনীর চমক ভাঙিল। হুকুম দিলেন, এখানে বাঁধতে হবে না, চলুক যেমন চলছে—

মালাধর সঙ্গে সঙ্গে বলিয়া উঠিল, হ্যাঁ, হ্যাঁ—চালা, চালা নৌকো। তোড়জোড় না করে ফস করে অমনি বাঁধলেই হল—নাঃ? আপনি জানেন না গিন্নি-মা, আজকাল এমন হয়েছে—চৌধুরির ঐ ভূতপ্রেত-গুলো হক্ না হক্ মাথায় লাঠি মেরে বসে। আখেরের ভাবনা ভাবে না। তারপর গলা নিচু করিয়া কহিল, কিন্তু একটুখানি ধরুক

মা। আমাকে নেমে যেতে হবে। আমার বাড়ি ঐ সোজা। মিছেমিছি ঘুরে মরব কেন অন্দর?

চিন্তামণি নিঃশব্দে উঠিয়া দাঁড়াইল। সৌদামিনী বলিলেন, রাগ করলে ওস্তাদ? অত বড় ঐ ছেলে—তুমি বললে, পিঠে নিয়ে মাঠ ভাঙবে। পিঠ তা হলে কুঁজো হয়ে যাবে, বুক ফুলিয়ে লাঠি ধরতে হবে না আর কোনদিন।

ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া নদী-জলের দিকে তাকাইয়া চিন্তামণি দাঁড়াইয়া রহিল। মৃদু হাসিয়া সৌদামিনী বলিলেন, আমরা বাজে লোক কি না। ওস্তাদ আমাদের সঙ্গে কথাই বলে না।

ওস্তাদ বলিল, বলাবলি আর কি মা, আর তো সেদিন নেই—বুড়ো অকর্মা হয়েছি, দুধের ছেলেটাও বয়ে নিতে পারি নে। তাই বলি, ছুটি দাও এবার—যাই—

সৌদামিনী খুব হাসিতে লাগিলেন। হাসিতে হাসিতে বলিলেন, আ—হা, সে বুঝি তুমি। অকর্মা আমার ঐ ছেলে। যেখানে যাব আঁচল ধরে সঙ্গে চলেছেন। ঐ ননীগোপাল আমার মানুষের মতো হয়ে তোমাদের সঙ্গে মহালে ঘুরবে—আ আমার কপাল!

চিন্তামণি রাগিয়া আগুন হইল। বলিল, তাই বুঝি সোনার পালঙ্কে তোমার ননীগোপালকে ঘুম পাড়িয়ে রেখেছ মা? কার ছেলে, হুঁশ আছে তা? খালি কাঠের উপর পড়ে রয়েছে, শীতে ধনুকের মতো হয়ে গেছে, কাপড়খানা গায়ে তুলে দেবার ফুরসৎ তোমাদের কারো নেই—এতেও মনোবাঞ্ছা পুরল না মা?

ঘাটে সারবন্দি বাছাড়ি নৌকা। মালাধর হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল, দেখিস, দেখিস মাঝি, লাগেনা যেন—সামাল। ডান পাশ দিয়ে—ঐ বালির চরটার ওখানে ধরবি।

বলিতে বলিতেই ঠক করিয়া পানসির মাথা একটা নৌকার গায়ে গিয়া লাগিল। ছই-এর ভিতর হইতে অমনি মধুরকণ্ঠে প্রশ্ন আসিল, কোন্ সুমুন্দি গো?

মালাধর বলিল, হেঁ হেঁ বাবা, গোলপাতা কাটতে চলেছ?

মেজাজ বড্ড গরম যে। থাম, থাম। আগে বসি গিয়ে কাছারি। সৌদামিনীকে লক্ষ্য করিয়া বলিল, মা এই খুঁটো-সেলামি আদায় করে দেব আপনাকে বছরে পাঁচ-শ টাকা।

আশ্চর্য হইয়া সকলে মালাধরের মুখের দিকে তাকাইল।

মালাধর গম্ভীর হইয়া ঘাড় নাড়িল। বলিতে লাগিল, আলবৎ। বাপের সুপুত্তুর হয়ে সব খুঁটো-সেলামি দিয়ে যাবে। এই গাঙ না হয় কোম্পানির, পাড় তো আমাদের চকের সামিল। পাড়ে খুঁটো পুঁততে হবে না? মাগনা কাছি মেরে সব যে পড়ে পড়ে ঘুমোবেন, সে হচ্ছে না। এক এক খুঁটোর খাজনা চার চার আনা। দেখুন না কি করি।

সৌদামিনী চিন্তামণির দিকে ফিরিয়া হাসিমুখে বলিলেন, বোসো, বসে পড় না ওস্তাদ। ঐ খুঁটো-সেলামি দড়ি-সেলামি কলসি-সেলামি—শুনে নাও সব মালাধরের কাছ থেকে। সর্দার-পাইক তুমি—কাজে লাগবে।

চিন্তামণি রুক্ষ-কণ্ঠে কহিল, ও সব আমাদের এখানে হবে না সেন মশাই। তোমার আগের মনিবের কাছে চলে থাকে তো চলেছে—আমাদের এখানে নিয়ম-কানুন আলাদা। আসল খাজনা—তাই গিন্নি-মা মাপ করে দেন কথায় কথায়—তার হেনোতেনো ছাইভস্ম!

সৌদামিনী বলিলেন, তবু শিখে রাখ সমস্ত। পরিণামে কি হবে ঠিক কি? পেট তো মানবে না! ছেলে যে এদিকে দিগ্‌গজ হয়ে উঠছেন। 'ক' লিখতে একেবারে কেঁদেই খুন।

মালাধর প্রশ্ন করিল, কেন?

মুখ টিপিয়া হাসিয়া সৌদামিনী বলিলেন, বোধ হয় কৃষ্ণ নাম মনে পড়ে। কিম্বা হয়তো কলম ভেঙে যায়—

এবার চিন্তামণির মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল। ঘুমন্ত কীর্তিনারায়ণের দিকে আর একবার স্নেহ-দৃষ্টিতে চাহিল। বলিল, ভাঙবে না? ওঁর কবজির হাড় দেখছ মা, চওড়া কি রকম! খাগের কলম টিকবে কেন? লাঠি—পাকা পাঁচহাতি বাঁশের লাঠি, তার

কমে মানবে না ও-হাতে। দাদামণিকে আমি লাঠিখেলা শেখাব। সব শিখিয়ে দিয়ে যাব—কর্তার কাছ থেকে যা পেয়েছি, সমস্ত।

মালাধর বলিল, কিন্তু ও কথা বললে হবে কেন মা? খোকাবাবু লেখেন তো বেশ। কসবায় দেখলাম এবার—

চিন্তামণি বাধা দিয়ে অধীর কণ্ঠে কহিল, তার গরজটাই বা কি? কিচ্ছু দরকার নেই। পুঁথি পড়তে হয়, নিয়ে আসা যাবে পণ্ডিত-মশায়দের। তাঁরা পড়ে পড়ে শোনাবেন। আর তোমরা আধকুড়ি নায়েব-গোমস্তা রইলে, কর্তাভাই লিখতেই বা যাবে কোন্ দুঃখে?

মালাধর তৎক্ষণাৎ সায় দিয়া বলিল, তা ঠিক। কি দুঃখে লেখাপড়া করতে যাবেন? কিন্তু যা উনি শিখেছেন, তাই বা ক'জন জানে? কসবায় দেখলাম এবার, দিব্যি সই দিয়ে দিলেন—গোটা গোটা মুক্তোর মতো অক্ষর। কলম ভাঙা-টাঙা মিছে কথা। একটু থামিয়া আবার বলিল, বাঘা চৌধুরির চেয়ে অনেক ভাল লেখেন উনি।

চিন্তামণি তখন আপনার ঝোঁকেই বলিয়া চলিয়াছে, হুকুম দাও মা-ঠাকরুন, দাদাকে আমি লাঠি শেখাই। বাড়ি যা খুলবে ও-হাতে। আজ ওঁকে ভরসা করে দিতে পারলে না মা, কিন্তু গুরুর নাম করে বলছি, কর্তাভাই আমার হাজার লোকের মহড়া নেবে একদিন। আমি বুড়োমানুষ, আমি হয়তো বেঁচে থাকব না, তুমি দেখো—

সৌদামিনী শান্ত দৃষ্টি তুলিয়া চিন্তামণির দিকে একটুখানি চাহিয়া রহিলেন। বলিলেন, ভরসা করে দিতে পারলাম না, তাই বুঝি। এই বুঝলে তুমি ওস্তাদ? চকের নতুন কাছারি বাঁধা হোক, পাইক-বরকন্দাজ নিয়ে বোল-বেহারার পালকি হাঁকিয়ে তোমার দাদাভাই সেখানে গিয়ে উঠবে। এখন এমনি-এমনি গেলে কি তোমাদের ইজ্জত থাকে? ওকি—ওকি—

নৌকা কূলের কাছাকাছি আসিতেই মালাধর লাফাইয়া পড়িল। চটিসুদ্ধ সে পড়িল গিয়া একেবারে কাদার মধ্যে। নোনা কাদা—

কে যেন যত্ন করিয়া ছানিয়া নিভাঁজ করিয়া রাখিয়াছে। মালাধরের হাঁটু অবধি তলাইয়া গেল। পানসির সকলে হাসিয়া উঠিল। মালাধরের দৃক্‌পাত নাই। দুই আঙুল তুলিয়া দেখাইয়া সে কহিতে লাগিল, কিছু ভাবতে হবে না মা, এই দুটো মাস সবুর করুন, আটচালা কাছারি-ঘর তুলে দিচ্ছি। বাঁশ-খড় সব ভূতে যোগাবে, এক পয়সাও চাইনে ঘর থেকে। মাস্তোর দুটো মাস।

মালাধর বাঁধের উপর দিয়া যাইতেছিল। হৈ-চৈ শুনিয়া তাকাইয়া দেখিল, একটু দূরে দল বাঁধিয়া কারা চাষে লাগিয়াছে। শব্দ-সাড়া খুবই হইতেছে, গরু বড় চলিতেছে না, লাঙলের মুঠা ধরিয়া দশ-জোয়ান সারবন্দি দাঁড়াইয়া হাসাহাসি করিতেছে।

হাঁক দিল, কারা?

লোকগুলো তাকাইয়াও দেখিল না।

মালাধর বলিল, কার জমিতে কে লাঙল দেয়? শেষকালে জেলের ঘানি ঘুরিয়ে মরবি বেটারা? সব নতুন বন্দোবস্ত হবে, সেলামি লাগবে—হেঁ হেঁ, মাঙনা নয়।

বাঁধের আড়াল হইতে ভানুচাঁদ যেন হঠাৎ পাতাল ফুঁড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। হাতে হুঁকা। দাঁত বাহির করিয়া হাসিতে হাসিতে ভানু বলিল, তামাক ইচ্ছে করবে সেন মশাই? সাজা রয়েছে। এস না এদিকে।

মালাধরের কণ্ঠ এক মুহূর্তে একেবারে খাদে নামিয়া আসিল। বলিল, না বাবা, তামাক নয়। বেলা হয়ে গেছে বড্ড। বলছিলাম ছোঁড়াগুলোকে। ওরা সব বুঝি তোমাদেরই পাড়ার? সবাই আমরা পাড়াপড়শি, পর তো নয়—তাই বলছিলাম, বাপধনেরা, এই যে সকালবেলা পরের জমিতে লাঙল নামিয়েছে, একটা ফ্যাসাদ যদি বাধে আমাদেরই আবার ঠেকাবার জন্য দৌড়তে হবে।

ভানুচাঁদ বিস্ময়ের ভাবে কহিল, পরের জমি হল কোথায়? জমি তো আমাদের। বাঁধের গায়ে লাঠিটা ঠেশ দেওয়া ছিল, অন্যমনস্ক

ভাবে সেটা হাতে করিয়া তুলিল। বলিল, কেন—তুমি সেন মশাই, সমস্ত তো জান। মনে পড়ছে না বুঝি?

মালাধর তাড়াতাড়ি বলিল, পড়ছে বই কি বাবা! জমি তোমাদের নয় তো কার আবার? সাত পুরুষে জমি চৌধুরি মশায়ের। খুব মনে পড়ছে। হি-হি করিয়া মালাধর হাসিতে লাগিল। বলিল, দুপুর রাতে ঝপাঝপ কোদাল মারছিলে, কাছি খুলে ডিঙি গেল ভেসে। তিন দিন পরে দীঘলের বাঁধাল থেকে সেই ডিঙি ত্রৈলোক্য গিয়ে নিয়ে এল। খুব মনে আছে।

ভানুচাঁদও হাসিতেছিল। হাসি থামাইয়া বলিল, কাছি খুলে গেল না হাতী। ও ঠিক তোমার কাজ, ডিঙি তুমি খুলে দিয়েছিলে। অন্ধকারে তখন ঠাহর করতে পারিনি যে! নইলে আর কিছু না হোক, হাতে তো কোদাল ছিল একখানা করে—

মালাধর জিভ কাটিল। সর্বনাশ! অমন কাজ করতে পারি আমি? না বাবা, কোদালের কোপ-টোপ তোমরা দেখে শুনে জায়গা বিশেষে ঝেড়ো।

খানিকক্ষণ ধরিয়া সে হাসিল। তারপর গলা খাটো করিয়া বলিল, সে ছিল রাত-বিরেতের কাজ—সাক্ষি মেলে না, সে একরকম মন্দ নয়। কিন্তু দিন-দুপুরে এই যে হৈ-হৈ করে গরু তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে, এটা কি রকম হচ্ছে বল তো? এখন যদি গ্রামের ওদের সাক্ষি মেনে দেয় এক নম্বর ফৌজদারি ঠুকে! চৌধুরি মশায়ের আর কি হবে, মরতে মরবি তোরাই তো বাবা।

কে কথা বলে রে ভানু? আরে, আরে—আমাদের মালাধর যে!

গলা শুনিয়া মালাধর পিছন ফিরল। রঘুনাথ সর্দার। সে একেবারে পিছনে আসিয়া পড়িয়াছে। আশ্চর্য হইয়া রঘুনাথ বলিল, কাল দেখে এলাম পরেশ উকিলের ওখানে—ফিরলে কখন বল? কাজকর্ম চুকল তো?

মালাধর তাচ্ছিল্যের সুরে কহিল, ভারি তো কাজকর্ম—হ্যাঃ! মেয়েমানুষ অবোলা জাত—সঙ্গে করে নিয়ে গেল নাছোড়বান্দা হয়ে।

সমস্ত রাত মশা তাড়িয়ে মরেছি। তারপর শরীর-গতিক ভালো তো বাবা? চৌধুরি মশায় আছেন ভালো?

রঘুনাথ কহিল, চৌধুরি মশায় যে তোমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছেন।

পাংশুমুখে মালাধর বলিল, কেন? কেন বল দিকি?

রঘুনাথ হাসিয়া বলিল, চাকরি-টাকরি দেবেন বোধ হয়।

মালাধর তাড়াতাড়ি কহিল, তা দেবেন বই-কি! চাকরি আমাদের পেশা। চৌধুরি মশায় বিচক্ষণ লোক—জানেন তো সমস্তই। তা বেশ আমি দেখা করব ওঁর সঙ্গে।

এক পা দু'পা করিয়া মালাধর বেশ খানিকটা আগাইয়াই ছিল, এবারে সে হন-হন করিয়া হাঁটিতে শুরু করিল। পিছন হইতে রঘুনাথ বলিল, দাঁড়াও, দাঁড়িয়ে যাও—এক্ষুণি দেখা হয়ে যাবে। চৌধুরি মশায় চকের চাষ দেখতে আসছেন।

ততক্ষণে মালাধর পথ ছাড়িয়া গ্রামের সীমানায় পা দিয়াছে।

কিন্তু কি ক্ষণে সেদিন রাত্রি পোহাইয়াছিল, গ্রামে পৌঁছিয়াও গ্রহ কাটিল না। মোড় ঘুরিয়াই বাঘ, স্বয়ং বাঘাহরি চৌধুরি। সঙ্গে আরও যেন কে কে—একজন তো মধ্যমপাড়ার যজ্ঞেশ্বর চাটুজ্জে। তাকাইয়া দেখার ফুরসৎ মালাধরের ছিল না। সে দিকটায় পানের বরোজ ও সুপারি-বন। ধাঁ করিয়া আগে তো রাস্তা হইতে নামিয়া পড়িল, তারপর কোন বনে ঢুকিবে সেটা পরের বিবেচনা। কিন্তু শনির নজর এড়ায় নাই। তীক্ষ্ণ কণ্ঠের হাঁক আসিল, কে? কে ওখানে?

মালাধর মুখ ফিরাইয়া কোন গতিকে কহিল, এই যে-- আমি। প্রশ্ন করিয়াছে শ্যামকান্ত, সে-ও চৌধুরির পিছু পিছু চক দেখিতে চলিয়াছে। যজ্ঞেশ্বর আগের কথার খেই ধরিয়া বলিতেছেন, ফাঁকা মাঠের মধ্যে কাছারি করতে যাবেন কেন? সে উচিত হবে না চৌধুরি মশাই। এক ফুলকি আগুনের মাত্র ওয়াস্তা। তার চেয়ে যেমন ছিল—গ্রামের মধ্যে থাকুক। ঐ মালাধরকে জিজ্ঞাসা করুন বরং। ও তো হাল চাল সমস্ত জানে—

কথা শুনিয়া মালাধর ঘুরিয়া দাঁড়াইল। বলিল, কিছু ভাববেন না চৌধুরি মশাই। ভার আমাকেই দিন। কাছারি-টাছারি সমস্ত বেঁধে দেব। আটচালা চৌরিঘর—দারোয়ানের দেউড়ি সমস্ত। দুটো মাস শুধু সময় দেবেন, দেখে নেবেন তারপর।

চৌধুরি বলিলেন, তুমি ওখানে কি করছ?

মালাধর বলিল, আজ্ঞে আপনারই কাছে যাচ্ছিলাম।

হাসিমুখে নরহরি বলিলেন, পথটা বেছেছ ভাল। কিন্তু আমার কাছে কেন বল দিকি?

মালাধর ততক্ষণে দু-এক-পা করিয়া রাস্তার দিকে আগাইতেছিল। অপ্রতিভ হাসি হাসিয়া বলিল, আর বলেন কেন মশাই। চাকরি—হা-হা-হা—ছা-পোষা মানুষ কাঁধের উপর কন্যাদায়, চক দখল করুন, যা-ই করুন—চকের আদায়ের কাজটা যেন আমার থাকে। নতুন কাউকে বহাল করে বসবেন না। রঘুনাথও বলল সেই কথা—বলল, যাও, চৌধুরি মশায়ের সঙ্গে দেখা কর গিয়ে—তিনি তো জানেন তোমাকে।

শ্যামকান্ত ব্যঙ্গের সুরে কহিল, তা জানেন বটে, আগাগোড়া সমস্ত জানেন। তোমার চাকরি যাবে কোথায়? কেন, বরণডাঙার উনি কি বলছেন?

মালাধর বলিল, আরে রামোঃ। বরণডাঙা করবে মহাল শাসন। এক নম্বর মেয়েমানুষ, আর দুই নম্বর হল এক পুঁটকে ছোঁড়া। চৌধুরি মশায়ের যমদূতগুলো কবে ঐ মা-ব্যাটা আর নায়েব-গোমস্তা সবসুদ্ধ গোটা চকটাই মালঞ্চের তলায় রেখে আসবে, তার কিছু ঠিক-ঠিকানা আছে? আমাদের আখেরের ভাবনা আছে মশাই। বলিয়া সে একবার নরহরির দিকে একবার আর সকলের দিকে চাহিয়া হাসিয়া উঠিল।

শ্রোতারাও হাসিতে লাগিল। হাসিলেন না কেবল নরহরি। গম্ভীর স্বরে বলিলেন, চাকরি তোমায় দেব মালাধর। কাল বিকেলে দেখা কোরো।

যে আজ্ঞে—বলিয়া তাড়াতাড়ি পায়ের ধূলা লইয়া মালাধর বিদায় হইল।

শ্যামকান্ত খানিক তাহার গমন-পথের দিকে তাকাইয়া থাকিয়া অনেকটা যেন আপনার মনে বলিয়া উঠিল, আস্পর্ধা বটে লোকটার!

মৃদু হাসিয়া নরহরি বলিলেন, তা ঠিক, মালাধর আমাদের চক্ষু-লজ্জা করে না। একটু চুপ থাকিয়া বলিলেন, তা ছাড়া চিরকাল ঐ চকে কাজ করে আসছে। শ্যামগঞ্জে বরণডাঙায় গণ্ডগোল জমে উঠল। এ বয়সে ও-ই বা যায় কোথায়?

শ্যামকান্ত বলিল, কিন্তু গণ্ডগোলের মূলে তো ও-ই। বরণডাঙার গিন্নিকে নিয়ে এল এর মধ্যে।

নরহরি হাসিয়া বলিলেন, উঃ—আমাকে সুদ্ধ ঘোল খাইয়ে দিল। কম লোক মালাধর! তাই তো দেখা করতে বললাম। এবার ওকে নিশ্চয় বেঁধে ফেলব।

শ্যামকান্ত আশ্চর্য হইয়া বলিল, বিশ্বাস করবেন?

নরহরি বলিলেন, বিশ্বাস করব কেন? চাকরি দেব।

যজ্ঞেশ্বর বলিলেন, তা লোকটার ক্ষমতা আছে বটে! কিন্তু বাবাজি যা বললেন, তা-ও দেখুন ভেবে। বড় বিশ্বাসঘাতক লোক—পয়সা পেলে লোকটা না পারে এমন কাজ নেই।

নরহরি বলিলেন, পয়সা-কড়ি যাতে পায়, সেই উপায় করতে হবে তা হলে। ধর্মপুত্তুর যুধিষ্ঠির কে আসবেন আমার তহ্‌শিলদার হতে? জমিদার বাড়ি হাতী-ঘোড়া জীব-জানোয়ার পুষতে হয়, ঐ রকম মালাধরও দু-চারটে পুষতে হয়। এসব আপনারা বুঝবেন না চাটুজ্জে মশায়, চাকরি আমি ওকে দেবই। আর আমাদের বড়বাবুও ওকে পছন্দ করবেন—আমার চেয়ে বেশি করবেন। আগে থাকতে এই বলে রাখছি।

বলিয়া শ্যামকান্তকে অঙ্গুলি নির্দেশ করিয়া দেখাইলেন।

গামছা কাঁধে তেল মাখিয়া জন সাত-আট দীঘির ঘাটে চলিয়াছে। হাঁকডাক করিয়া মালাধর তাদের উঠানে আনিল। বলিতে লাগিল, সু-খবর শুনিয়া যান দাদা, আর তহ্‌শিলদার নয়—সদর নায়েব, হেঁ হেঁ, একদম হরিচরণ চাটুজ্জে। বিশটা বউভাসি এখন শর্মার মুঠোর মধ্যে। চৌধুরী মশায় তাই বলেছিলেন—নায়েব যা, নবাবও তাই। ঐ কেবল নামের হেরফের।

একজন প্রশ্ন করিল, বাঘা চৌধুরীর চাকরি নিয়েছ নাকি?

মালাধর চিন্তিত ভাবে মাথা নাড়িয়া বলিল, মুশকিল তো হচ্ছে ঐ। দুই সুয্যির উদয় হল—কার রোদে এখন ধান শুকোই? বরণডাঙার গিন্নি তো হাত-পা কোলে করে বসে আছেন—বলেন, যা কর, তুমি মালাধর। আর ওদিকে চৌধুরিও নাছোড়বান্দা। বিকেলে গিয়ে চেক-মুড়ি আনতে বলেছেন। মামলা আর মাথা ফাটাফাটি চলুক এইবার, কে মালিক সাব্যস্ত হতে থাকুক। আমি ওসব তালে নেই। আমার কি, আমি নির্গোলে আদায়-পত্তোর করে যাই কাল সকাল থেকে।

পরদিন বরণডাঙা হইতে হারাণ সরকার আসিয়া উপস্থিত; বলিল, মা পাঠিয়েছেন।

একগাল হাসিয়া মালাধর বলিল, বেশ, বোলো মা'কে। কিছু ভাবনা নেই। আদায়ের আরম্ভ কালকে থেকে।

হারাণ চোখ-মুখ ঘুরাইয়া ফিসফিস করিয়া বলিল, তা যেন হল। কিন্তু চৌধুরি যে চকে লাঙল লাগিয়েছিল। বলে, চক নাকি তার। চক হল তার, আর আমরা পুঁটিমাছের মতো করকরে টাকা গুণে দিয়ে এলাম—সে হয়ে গেল ভুয়ো। মা তোমাকে ডেকেছেন আজ।

মালাধর বলিল, যাব বিকেলে।

পরদিন পুনশ্চ হারাণ আসিল। কই? কি হল?

মালাধর বলিল, একদিনে আর কি হবে ভাই? প্রজাপাটক বিস্তর খবর হয়ে গেছে। দুটো মাস দেরি করতে বল। সব হয়ে যাবে—আটচালা কাছারিবাড়ি দেউড়ি সমেত।

হারাণ বলিল, সে কথা নয়, তোমার বরণডাঙা যাবার কথা। রোজ ওরা হৈ-হৈ করে লাঙল চালাচ্ছে, দখল সাব্যস্ত করছে, বুঝলে না? একটা বিহিত করা দরকার। মা'কে বলছিলাম তাই, ফৌজদারি-দেওয়ানি দুটোই জুড়ে দেওয়া যাক। সেইসব ঠিকঠাক হবে আজকে। তুমি একবার চল সেন মশাই।

মালাধর বলিল, বিকেলে যাব।

হারাণ বলিল, কালও তো বলেছিলে ঐ কথা।

মালাধর চটিয়া বলিল, আজকে আবার একটা নতুন কথা বলব না কি? সে লোক আমি নই। বিকেলবেলা যাব, বলে দিও।

সকালের পর দুপুর, তারপরেই বিকাল আসিয়া থাকে। রোজই আসে। মালাধর বিকালে হয়তো যাইবেই, সেজন্য তাড়া কিছু নাই। কিন্তু প্রাজাপাটক ডাকাডাকি করিয়া এদিকে মালাধর বিষম তাড়া লাগাইল। ভোরবেলা হাতবাক্স কোলে করিয়া দুর্গানাম লিখিয়া সে চণ্ডীমণ্ডপে বসে। পাইকবরকন্দাজ নাই, কিন্তু তাহাতে যায় আসে না। বেলা প্রহরখানেক হইতে প্রজাদের বাড়ি বাড়ি নিজেই দপ্তর হাতে ঘুরিতে শুরু করে। এই রকম সন্ধ্যা অবধি চলে। সন্ধ্যার পর রেড়ির তেলের প্রদীপ জ্বালিয়া আবার চণ্ডীমণ্ডপে বসে। কিন্তু আদায়পত্রের সুবিধা হয় না বিশেষ কিছু। লোকে জিজ্ঞাসা করে, কোন তরফের আদায় করছ সেন মশাই?

মালাধর বলে, তাতে দরকার কি বাবু? তোমাদের হকের খাজনা, শোধ করে যাও, ব্যাস।

কিন্তু ওদিকে কসবায় ছুটোছুটি আরম্ভ হয়ে গেছে, সে খবর রাখ?

মালাধর বলে, নিষ্পত্তি তো হবে একটা। আমার এ কায়েমি চাকরি, আমি নড়ছি নে কিছুতে। আসে বরণডাঙা—ভালো,

আসেন চৌধুরি, আরও ভালো। আমি করচা লিখে শেষ করে রেখেছি। মালিকের নামের জায়গাটা ফাঁক রয়েছে কেবল।

তুমি কোন দলে সেন মশাই?

মালাধর হাসিয়া বলে, তোমরা যে দলে। বরণডাঙার গিন্নি রোজ টাকা গুণে দিয়েছেন। সেটা তো আর মিথ্যে নয়। বেশ তো—দাও টাকা, রসিদ দিচ্ছি, বরণডাঙার মোহর-মারা রসিদ—

চৌধুরির লোক এসে শাসিয়ে গেছে, বরণডাঙাদের টাকা দিলে ঘাড় ভাঙবে।

তবে চৌধুরির টাকাই দাও। কাঁচা-রসিদ কিন্তু। বিকেলে গিয়ে চেকমুড়ি আনব। সেই সময় এস, একেবারে দাখলে পেয়ে যাবে।

এত তর্কাতর্কি করিয়াও কিন্তু লোকগুলা গাঁটের টাকা গাঁটে লইয়া পিছাইয়া পড়ে।

একদিন উঠান হইতে আওয়াজ আসিল মালাধর আছ?

উঁকি মারিয়া দেখিয়া মালাধর তটস্থ হইয়া দাঁড়াইল। এস এস, রঘুনাথ সর্দার যে! বলি, খবর ভালো? চৌধুরি মশায় ভালো আছেন?

রঘুনাথ বলিল, তলব হয়েছে।

হবারই কথা। বিকেলে যাব।

রঘুনাথ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, উঁহু, এখনই।

মালাধর হাসিয়া বলিল, কেন, চৌধুরি মশায়ের ব্রাহ্মণ-ভোজনের ইচ্ছে হল নাকি আবার? আমি তো ব্রাহ্মণ নই।

রঘুনাথ চুপি চুপি বলিল, বাঘা চৌধুরির আমল চলে যাচ্ছে। শ্যামকান্ত লেখাপড়ায় ইস্তফা দিয়ে গদি চেপে বসেছেন। এ দেবতা একেবারে কাঁচাখেগো। এখন আর ভোজন-টোজন নয়। একদম সোজা হুকুম, নিয়ে এস সঙ্গে করে। না আসতে চায়, বেঁধে এনো।

মালাধর শুষ্কমুখে বলিল, ভয়ের কথা হয়ে উঠল বড্ড। কি করা যায়?

রঘুনাথ হাসিয়া বলিল, আপাতত দুর্গা বলে উঠে পড়। জ্যান্ত বা মরা—বুঝতে পারলে না? চল—

শ্যামকান্ত বিনা ভূমিকায় বলিল, জমিদারি এবার থেকে আমি দেখছি। বাবা আর কত খাটবেন—আমার উপর ভার পড়ছে। চাকরি নিতে হলে আমার খোশামোদ করতে হবে।

মালাধর সবিনয়ে বলিল, যে আজ্ঞে।

তোমায় ডেকে পাঠিয়েছি কেন, বুঝেছ?

মালাধর একগাল হাসিয়া বলিল, বুঝেছি কতক কতক। চাকরি দেবেন বোধ হয়।

শ্যামকান্ত কহিল, না—মুণ্ডপাত করব। সৌদামিনী ঠাকরুন মামলা রুজু করেছেন—চক বেদখলের মামলা। সমস্ত তোমার কারসাজি।

মালাধর জিভ কাটিয়া ঘাড় নাড়িয়া মহা প্রতিবাদ করিতে লাগিল। কক্ষণো না, একেবারেই না। আমার গরজটা কি মশাই? বিষয় আপনাদের যার হয় হোকগে, আমার সেহা-করচা নিয়ে সম্পর্ক। ষোল আনা হিস্যার মালিক সৌদামিনী দেব্যা না লিখে নরহরি চৌধুরি লিখতে আমার আর কি এমন বেশি খাটনি, বলুন।

তবে বরণডাঙার হয়ে এত কাণ্ড করলে কেন?

মালাধর বলিল, বরণডাঙা? আমার বয়ে গেছে। চৌধুরি মশায়ের সঙ্গেই তো কথাবার্তা চলছিল—হরিচরণ চাটুজ্জে মধ্যবর্তী। চাটুজ্জে রাঘব-বোয়াল মশাই, সমুদ্দুর শুষে নেয়। পান খাবার খরচা-টরচা কি আদায় করল—ভাগের বেলা একেবারে তাইরে-নাইরে-না। তখন মনে ভাবলাম, দুত্তোর—পুরোণো মনিবকে কিছু পাইয়ে দিই এই ফাঁকে—ধর্ম হবে। নুন খাই যার, গুণ গাই তার। তা হয়েছে মশাই, ভালই হয়েছে। প্রায় দুনোদুনি দর। নোনা-ওঠা চর—মেয়ে মানুষ ছাড়া কে নিত অত টাকা দিয়ে? মনিব মশায় রেজেস্ট্রি অফিস থেকে টাকা বাজিয়ে নিয়ে সোজা বরিশালের স্টিমারে উঠে বসলেন।

শ্যামকান্ত হাসিয়া বলিল, আর তুমি এলে বুঝি নিরম্বু একাদশী করে ?

মালাধর ঘাড় নাড়িতে নাড়িতে বলিল, ঐ তো ভুল করছেন বড়বাবু। চৌধুরি মশাই ঐ ভুল করলেন বলে তো এত গণ্ডগোল। বলি চাকর-মনিব কি আলাদা? আমার সাবেক মনিব মশায় জানতেন সব। আট টাকা মাইনে মশায়, রাত-দিনের চাকরি, খোরাকি ওরই মধ্যে। তা-ও আজ আড়াই বছর মাইনে বাকি। মনিব কি ভাবতেন, আমি বাতাস খেয়ে আছি ?

শ্যামকান্ত হঠাৎ গম্ভীর হইয়া বলিল, চকের দলিলের নকল আছে তোমার কাছে, সেইটে আমি দেখব।

মালাধর ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আজ্ঞে না—নেই।

শ্যামকান্ত বলিল, কসবায় গিয়ে খোঁজাখুঁজি করবার সময় নেই আর। বুধবারে মোকর্দমার দিন। দলিল না দেখালে তোমার গলা কাটব।

মালাধর বলিল, দলিল কি গলার ভিতর রয়েছে বাবু ?

শ্যামকান্ত হাসিয়া ফেলিল। না থাকে, সিন্দুকের ভিতর আছে। সিন্দুক খুলবার মন্তোর আমি জানি। বাবা যে ভুল করেছেন, আমার বেলা তা হবে না। দাঁড়িয়ে রইলে কেন মালাধর, বোসো—। বোসো ফরাসের উপর। রঘুনাথ, দেওয়ানজির সেরেস্তা থেকে জেনে এস, বুধবারেই মোকর্দমার দিন তো ?

শ্যামকান্তর মন্ত্রটা কি প্রকার কে জানে, কিন্তু ফল তার হাতে হাতে। পুনরায় ডাকাডাকি আর আবশ্যক হইল না। মালাধর সন্ধ্যার পর আবার ক্রোশখানেক হাঁটিয়া সৌদামিনীর সেই দলিলের নকল চাদরে বাঁধিয়া লইয়া আঁধারে আঁধারে শ্যামকান্তের বৈঠকখানায় আসিয়া উঠিল।

শ্যামকান্ত হাসিয়া বলিল, এইটে তো সেই ? তোমায় বাপু কিছু বিশ্বাস নেই।

প্রদীপের আলোয় শ্যামকান্ত মনে মনে পড়িতে লাগিল। পড়িতে পড়িতে মুখ অন্ধকার হইয়া গেল। বলিল, জবর দলিল তো।

বাঁধন-কষনের বাকি নেই কিছু। তবে আর অনর্থক মামলা করে কি হবে?

মালাধর কৃতার্থ হইয়া যেন গলিয়া পড়িবার জো হইল। বলিল, আজ্ঞে, আমার কাজকর্ম এই রকম। খুঁৎ পাবেন না। চাকরিটা দিন, দেখতে পাবেন তখন?

বিরক্ত মুখে শ্যামকান্ত বলিল, চক পেলে তো চাকরি? যত-কিছু উৎপাত আসতে পারে, একটা করে সব তো দলিলে ঢুকিয়ে বেঁধে ফেলেছ। মাথা ঢোকাবার একটু ফাঁক নেই—

মালাধর হাসিয়া বলিল, নেই—কিন্তু হতে কতক্ষণ? হুজুর যদি ইচ্ছে করেন, মাথা তো মাথা, হাতী ঢুকিয়ে দিতে পারি ওর মধ্যে।

শ্যামকান্ত বলিল, রেজেস্ট্রি কবলা যে। ওর উপর কি চালাকি করবে?

মালাধর বলিল, হুকুম হয়তো হোসেনশা'র আমলের সনদ বেরিয়ে যেতে পারে। রেজেস্ট্রির চেয়েও তার দাম বেশি। আসলে হল, হুজুরের ইচ্ছে। বলিয়া আঙুলে কাল্পনিক টাকা বাজাইয়া মালাধর হাসিয়া ফেলিল। বলিল, হুজুর, কথাবার্তা এবার আগে থাকতে আস্কারা হয়ে যায় যেন। সেবারে যত গোলমাল, সমস্ত ঐ দোষে। আরে বাবু, গণেশ-পূজো না হলে মা-দুর্গা ভোগ কি নেন কখনো? হল না তাই।

(৯)

সমন লইয়া আদালতের পেয়াদা দেখা দিল।

মালাধর পড়িয়া যাইতেছিল, বাদী শ্রীমত্যা সৌদামিনী ঘোষ, জওজে মৃত শিবনারায়ণ ঘোষ, জাতি কায়স্থ, পেশা—

দেখি—বলিয়া নরহরি তার হাত হইতে কাগজটা টানিয়া লইয়া টুকরা-টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দিলেন।

মালাধর কহিল, শেষকালে ঐ যে লিখেছে, বুধবারে অত্র আদালতে উপস্থিত হইয়া—মোটের উপর তারিখটা যেন ঠিক থাকে হুজুর।

চৌধুরি মালাধরের দিকে কঠোর দৃষ্টিতে চাহিলেন। সে দৃষ্টির সম্মুখে মালাধর সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি বলিল, মানে, ফৌজদারি মামলা কি না—অন্তর্জলী থেকে আসামি টেনে তুলে নিয়ে যায়। তাইতো বলছিলাম। তা দেখুন না হয় একবার যুক্তি-পরামর্শ করে—

হঠাৎ নরহরি হাসিয়া উঠিলেন! নীরস ভয়ানক হাসি, অন্তরের মধ্য অবধি কাঁপিয়া উঠে। বলিলেন, শ্যামগঞ্জের চৌধুরিরা কোন্ পুরুষে কবে কাঠগড়ায় উঠেছে মালাধর, যে মামলার তারিখ মনে করিয়ে দিচ্ছ? মরদে মরদে বিবাদ, লাঠিতে লাঠিতে তার মীমাংসা —আইন-আদালত করবে কি?

নিশ্বাস ফেলিয়া এক মুহূর্ত তিনি স্তব্ধ হইয়া রহিলেন। তারপর বলিতে লাগিলেন, তবে কি না এবার মাঝে মেয়েমানুষ এসেছে! বরণডাঙার গিন্নি কসবায় গিয়ে এমন করে মাথা মুড়োবেন, কে জানত? হাকিমের কাছে না কেঁদে আমার কাছে কাঁদলে দিতাম এ সমস্ত ছেড়েছুড়ে—

চৌধুরি গম্ভীরভাবে পায়চারি করিতে লাগিলেন। মালাধর শ্যামকান্তর বৈঠকখানায় ঢুকিয়া গেল। অনেকক্ষণ এমনি কাটিল। শেষে নরহরি ডাকিলেন, রঘুনাথ!

রঘুনাথ আসিলে বলিলেন, চল ঘুরে আসি। দু-জনে অনেক দিন পরে পাল্লা দিয়ে আজ ঘোড়া ছোটানো যাবে।

সর্দার ও মনিব মালঞ্চের কূলে কূলে ফিরিয়া আসিতেছিলেন। বালুকায় ঘোড়ার খুরের শব্দ হইতেছে না। অনেক রাত্রি, চারিদিকে অতল নিস্তব্ধতা। তেঘরার বাঁকে জল নাই মোটে। নদীজলে ঘোড়া নামাইয়া দিয়া ধীরে ধীরে তাঁরা পার হইয়া উঠিলেন।

গভীর রাত্রে কেউ মালঞ্চের রূপ দেখিয়াছ?

ভাঁটার টান শেষ হইয়া ঘোলা জল থমকিয়া দাঁড়ায়, জেলেরা জাল তুলিয়া লণ্ঠনের আলোয় বাঁধের পথে ঘরে ফিরে, আবছা

অন্ধকারে আকাশ-ভরা তারা ঝিকঝিক করে। ওপারে নির্জন নিঃশব্দ দিগন্তবিসারী মাঠ, এপারে ঢালিপাড়ার শত শত খেলোয়াড়, বাবলা-বন। ঠিক এই সময়টা শ্রান্ত অবসন্ন নদী শিথিল দেহ এলাইয়া যেন তন্দ্রাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে। খড়ের নৌকা, ধানের নৌকা, পূবদেশি ব্যাপারির লঙ্কা-হলুদের নৌকা সমস্ত সারি সারি নোঙর ফেলিয়া বালুতটে মাথা রাখিয়া ঘুমায়। দিনের আলোয় যে মরদগুলার লম্বা পাকা লাঠি আর চিতানো চওড়া বুক দেখিয়া চমকিয়া ওঠ, রাতের নক্ষত্রালোকে মাটির দাওয়ায় কাঠির মাছুরের উপর অসহায়ের মতো তারাও পড়িয়া পড়িয়া ঘুমায়। হয়তো হঠাৎ অনেক দূর হইতে অস্পষ্ট একটা কুকুরের ডাক আসে, শোঁ করিয়া আকাশে একটা উল্কা ছুটিয়া যায়, এক ঝলক শীতল নৈশ বাতাস ঘুমের মধ্যে একবার বা পাশমোড়া দিয়া জাগিয়া ওঠে। হাওয়ায় হাওয়ায় জলতরঙ্গে সেই অপরূপ নির্জনতায় রূপসী মালঞ্চের এলানো আঁচল, গায়ের কত গহনা ঝলমল করিয়া ওঠে।

এত পথ ছু-জনে চলিয়া আসিলেন, ভাল-মন্দ একটি কথা নাই। যেখান হইতে নরহরি ঘোড়ায় চাপিয়াছিলেন, চাতালের নিকট সেই-খানটিতে আসিয়া তিনি লাফাইয়া নামিলেন। পুরানো ছুর্গের মতো বিশাল প্রাসাদ অন্ধকারে ডুবিয়া আছে; রঘুনাথ ঘোড়া ছু'টি আস্তাবলে লইয়া গেল। উঠানে ঢুকিয়া নরহরি দেখিলেন, শ্যামকান্তের বৈঠকখানায় আলো। অত বড় মহালের মধ্যে কেবল শ্যামকান্ত ও মালাধর জাগিয়া থাকিয়া কি পরামর্শে মাতিয়া আছে। মালাধরের এখন আর বাড়ি হইতে আসা যাওয়া করিতে হয় না, এখানেই থাকে, বৈঠকখানার পাশের ঘরটা শ্যামকান্ত তাকে ছাড়িয়া দিয়াছে। নরহরি ধীরে ধীরে সেখানে গিয়া দাঁড়াইলেন। গম্ভীর স্বরে কহিলেন, কসবায় গিয়েছিলাম—

পরামর্শ বন্ধ হইয়া গেল, ছু-জনেই তাঁর মুখের দিকে চাহিল। নরহরি বলিতে লাগিলেন, কিছুতে বিশ্বাস হচ্ছিল না—শিবনারায়ণের বউ সত্যি সত্যি গিয়েছে মামলা করতে। একি একটা বিশ্বাস হবার

কথা? অথচ সমন দেখে অবিশ্বাসই বা করি কি করে? তাই গেলাম ভাল করে খবরটা নিতে। শশিশেখরকে জিজ্ঞাসা করলাম, এ কি কাণ্ড বাপু? সে বলল, দেওয়ানি-ফৌজদারি আজকাল কোন জমিদারের ঘরে বিশ-পঁচিশ নম্বর না আছে? ওতে আর ভয়টা কি!

বলিয়া নরহরি একটু হাসিলেন। বলিতে লাগিলেন, শশিশেখর অভয় দিল, তবু ভয় আমার এত হয়েছে—সমস্ত পথ কেবল ভাবতে ভাবতে এসেছি। ঐ সমস্ত করে এখন থেকে বিষয় রাখতে হবে নাকি?

মালাধর বলিল, কোন ভাবনা নেই। আমরাই বা পিছপাও কিসে? বড়বাবুকে বরঞ্চ জিজ্ঞাসা করে দেখুন।

সে কথা কানে না লইয়া নরহরি বলিতে লাগিলেন, বরণডাঙার গিন্নি যা করেছেন, ঐ চলবে এখন দেশের মধ্যে। পুরুষ-জোয়ান নেই আর, সমস্ত মেয়ে-রাজ্য। আমি আর করব কি—সত্যই আমার ছুটি। যা করতে হয় তুমি কর শ্যামকান্ত। আমি মামলা-মোকর্দমা করে বেড়াতে পারব না—বুঝিও না।

মালাধর তৎক্ষণাৎ বলিল, বেশ তো হুজুর, আমরাই করব। তুই তুড়ি দিয়ে মামলা জিতে আসব। নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি। হেঁ হেঁ—পনের আনা তদ্বির এরই মধ্যে সারা হয়ে গেছে।

শ্যামকান্ত ঘাড় নাড়িয়া সায় দিল, তা ঠিক। বড্ড কাজের লোক এই মালাধর। ওকে পেয়ে খুব কাজ হল। মামলার জন্যে ভয় নেই বাবা।

নরহরির মুখে হাসি ফুটিল। বলিলেন—ভয়? ভয়ই সত্যি। কিন্তু আসল ভয়টা হচ্ছে, আমি বুড়ো হয়ে গেছি—তোমাদের সঙ্গে তাল রেখে চলতে পারছি নে।

তারপর পুরনো স্মৃতির ভারে নরহরির কণ্ঠস্বর যেন অবসন্ন হইয়া আসিল। বলিতে লাগিলেন, শিবনারায়ণের বউ গেল কসবায় নাকে কাঁদতে। বাঘের ঘরণীর এই দশা—কিসে আর সাহস থাকে বল। শিবনারায়ণের বিদ্যের কাছে নবদ্বীপের বামুনদের অবধি মাথা হেঁট

হয়ে যেত। আর কি লাঠিই ধরত! লাঠির লোভ দেখিয়ে চিন্তামণি-ওস্তাদকে কেড়ে নিয়ে গেল। প্রথম যেদিন দেখা হয়, এমন মার মেরেছিল—কবজির উপর আজও এই দাগ রয়ে গেছে। বলিয়া একটি স্বল্পাবশেষ আঘাত-চিহ্নের উপর সগর্বে তিনি আঙুল রাখিলেন।

শ্যামকান্ত বলিল, অনেক রাত হয়ে গেছে বাবা, আপনি এখন বিশ্রাম করুন গে।

নরহরি বলিলেন, হাঁ যাই। পুরোপুরি বিশ্রাম এবার। আমি কিছুতে বুঝতে পারছিনে শ্যামকান্ত, এখনও চিন্তামণি-ওস্তাদ বর্তমান রয়েছে, অথচ জমাজমির হাঙ্গামায় বরণডাঙার বাড়ি থেকে লাঠি বেরুল না, বেরুল একরাশ কাগজপত্তোর। তাই তো বলি, আমরা সেকেলে মানুষ—বিদ্যে তো আঁকুড়ে ক আর বকঠুঁটো খ—ঐ সব কাগজপত্তোরের আমরা বুঝি কি? তুমি বিদ্বান হয়ে এসেছ, ও-সব তোমাদের পোষায়। এই কথাটাই তোমাকে বলতে এলাম।

বলিয়া হাসির শব্দে চতুর্দিক সচকিত করিয়া নরহরি বাহির হইয়া গেলেন।

পাশের ঘরে সকলে অঘোরে ঘুমাইতেছে, নিশ্বাসের গভীর শব্দ আসিতেছে। নরহরির কিন্তু ঘুম নাই। শিয়রের দেয়ালে আংটার উপরে সযত্নে লাঠি রাখা আছে। এ লাঠির ব্যবহার এখন একেবারে বন্ধ হইয়া যাইতেছে, পঞ্চাশ বছর আগে কিশোর বয়সে প্রথম তিনি এই লাঠি ধরিয়াছিলেন। লাঠির মাথায় পেঁচানো সোনার সাপ, সাপের দুই চোখে দু'টি লাল পাথর। নরহরি ঘুমাইয়া পড়িলে যৌবনের সাথী লাঠিখানা এখনও পাথরের চোখ মেলিয়া পাহারা দিয়া থাকে। নির্জন কক্ষে লাঠিয়ালের সঙ্গে লাঠি কথা বলে। আজ রাত্রে বাদামবনে কুয়োপাখী ক্রমাগত ডাকিতেছে, ডাকাতের বিল ভরিয়া অজস্র জোনাকি—যেন আকাশের সমস্ত তারা ভাঙিয়া খসিয়া ধূলার মতো হইয়া উড়িতেছে, যেন মাঠের মধ্যে শত শত দীপ জ্বালিয়া বড় ধূম করিয়া কাদের বিয়ে হইতেছে। নরহরির কি হইল—অনেক দিনের পর লাঠিটা নামাইয়া মুঠা করিয়া ধরিয়া শয্যার উপর চুপ

করিয়া বসিয়া রহিলেন। কিশোর কালে এমনি করিয়া লাঠি ধরিতে বুক ফুলিয়া উঠিত। অভ্যাসের বসে এখন আর সে উত্তেজনা নাই, লাঠির পরে সে ভালবাসা নাই, লাঠি যেন নরহরির মুখোমুখি চাহিয়া সেই সব দিনের জন্য কত দুঃখ করিতে লাগিল।

ও-ঘরে হঠাৎ সুবর্ণলতা ধড়মড় করিয়া ঘুম হইতে জাগিয়া বসিল। বোধকরি কোন স্বপ্ন দেখিয়া থাকিবে। সভয়কণ্ঠে ডাকিতে লাগিল, বউদিদি, বউদিদি!

ঝিকে ডাকিতে লাগিল, হাবির মা, হাবির মা গো—

নরহরি ডাকিলেন, এস মা, তুমি এ-ঘরে চলে এস।

বাপের আদরে ঘুম-চোখে সুবর্ণ ছুটিয়া আসিল। আসিয়া সামনে দাঁড়াইল। এত রাত্রে বাপের হাতে লাঠি! সুবর্ণ চমকিয়া উঠিল

লাঠি কি হবে বাবা?

কি হবে ভাবছি তো তাই। ফেলে দেব।

সুবর্ণ বলিল, আমি নেব।

নিবি তুই? নিবি? তারপর অসহায়ের মতো কণ্ঠে নরহরি বলিলেন, যার নেবার কথা, সে নিল না। ওরা নেবেও না কোনদিন। ...সুবর্ণ, তুই লাঠি শিখবি?

সুবর্ণলতা আনন্দ আর ধরিয়া রাখিতে পারে না। বলিল, হ্যাঁ বাবা। তুমি আমাকে শিখিয়ে দেবে। দিনে না পার, রাতে শিখিও। বড় আলোটা জ্বেলে দিয়ে শিখব—আমি ঘুমুব না।

নরহরি বলিলেন, না মা, দিনমানেই শিখো তুমি—সমস্ত দিন ধরে আমি তোমাকে লাঠি শেখাব। এবার আমার ছুটি হয়ে যাচ্ছে।

সুবর্ণ বাহু দিয়া বাপের কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিল। বলিল, বেশ হবে বাবা, খুব ভাল হবে। তুমি আর কোথাও যাবে না তা হলে? কোথাও না? তারপর অল্প একটু হাসিয়া একটু সঙ্কোচের সহিত চুপি চুপি কহিল, আজকে তবে তোমার সঙ্গে শোব বাবা।

নরহরি মেয়েকে পাশে বসাইয়া মাথার উপর হাতখানি রাখিলেন।

সুবর্ণের আজকাল মাটিতে পা পড়ে না। পড়িবার কথাও নয়, সে দশের বাড়ি অবধি শিখিয়া ফেলিয়াছে। লাঠি হাতে একবার সোজা হইয়া দাঁড়ায়, একবার বা হাঁটু গাড়িয়া শুইয়া পড়ে। ভাবখানা, যেন সামনে তার শ' দুই-তিন লোক, আর সে একলা অত লোকের মহড়া লইতে লাগিয়াছে। নরহরি টিপটিপি. হাসেন। সরস্বতী প্রশংসমান চোখে চাহিয়া থাকে। তারও বড় লোভ হয়। নরহরি যখন সামনে না থাকেন এক একদিন করুণা-পরবশ হইয়া সুবর্ণ বলে, আচ্ছা, ধর্ তুই একখানা লাঠি—এমনি করে, হ্যাঁ—আমি দেখিয়ে দিচ্ছি। এদিক-ওদিক তাকাইয়া সরস্বতী লাঠি তুলিয়া লয়। বুকের মধ্যে ঢিব-ঢিব করে, বার বার চারিদিকে চায়, সুবর্ণ যেমন করিয়া বলে তেমন ধরা হয় না। হঠাৎ গায়ের উপর সুবর্ণের লাঠির চোট আসিয়া পড়ে, সামলাইতে পারে না। হাতের লাঠি ফেলিয়া দিয়া সরস্বতী খিলখিল করিয়া হাসিয়া ওঠে। বলে, থাক ভাই, থাক তোর দশের বাড়ি। ঠাকুরজামায়ের জন্যে তুলে রেখে দে। তখন কাজে আসবে। আমাদের উপর বাজে খরচ করিস নে।

বাড়ির মধ্যে দুষ্ট কেবল শ্যামকান্ত। সে বড় ক্ষেপায়। আরশুলায় সুবর্ণের বড় ভয়, আরশুলা উড়িতে দেখিলে সে আঁতকাইয়া উঠে, গায়ে পড়িলে চেঁচাইয়া বাড়িতে লোক জড় করে। ইদানীং বাপের কাছে লাঠি শিখিয়া লাঠিয়াল হইতেছে, আরশুলার ভয় কিন্তু যায় নাই। শ্যামকান্ত তার নূতন নামকরণ করিয়াছে—আরশুলা-পালোয়ান। ঐ নামেই যখন-তখন ডাকে। তাই শ্যামকান্তকে লুকাইয়া লাঠি খেলিতে হয়।

সুবর্ণ বলে, বাবা, বউদিদিকে তুমি কিছু শেখাও না। ও কাঁদে।

হাসিমুখে নরহরি জিজ্ঞাসা করেন, তাই নাকি রে?

এমন মিথ্যুক সুবর্ণ। কাঁদিল সে কবে? বড় বড় চোখে সরস্বতী

সুবর্ণের দিকে চায়। তারপর কিন্তু সত্যসত্যই চোখে জল আসিয়া পড়ে। শ্বশুরের প্রতি অভিমান হয় বড়। নরহরি তবু হাসিতে হাসিতে ঘাড় নাড়েন। বলেন, সে হচ্ছে না দুষ্টু বেটি। ছেলে আমার লাঠি উঁচু করে ধরতে আছাড় খায়, লাঠি শিখে তাকে বুঝি নাকানি-চুবানি খাওয়ানোর মতলব? আচ্ছা, তাকে একবার জিজ্ঞাসা করে দেখ—সে-ই বা কি বলে!

সেদিককার মতামত সরস্বতীর ভাল করিয়াই জানা আছে, জিজ্ঞাসার আবশ্যক হয় না। কোনদিন বা নরহরি বলেন, আচ্ছা বেশ—মুখ ভার করে থেক না মেয়ে। এস এদিকে, লাঠিখেলা থাক—হাতের খেলা বরঞ্চ দু-একটা শিখিয়ে দিই। বলিয়া হাত মুঠা করিয়া কয়েকটি ভঙ্গি দেখাইয়া দেন। লাজুক মুখে সরস্বতী অনুকরণের ব্যর্থ চেষ্টা করে। নরহরি হাসিয়া বলেন, ঐ হয়েছে। ব্যস, আজকে থাক এই অবধি। এইটে এখন ভাল করে শেখ। তারপর শ্যামকান্তর ইচ্ছেটা কি—তোমাদের নতুন কালের পথ কোনটা—ভাল করে জেনে নিয়ে দেখা যাবে তখন।

সুবর্ণ চুপি-চুপি বউদিদির কানে বলে, এই এক বুদ্ধি শোন্। সব ঠিক হয়ে যাবে। যা শিখলি, ঐটেই আজ ভাল করে চালাবি দাদার পিঠের উপর। তখন মত দেবার দিশে পাবে না। বুঝলি?

সরস্বতী সুবর্ণের গায়ে চিমটি কাটিয়া দেয়।

আবার বাপে মেয়েয় লাঠি লইয়া পায়তারা দিতে থাকে। গভীর নিশ্বাস ফেলিয়া সরস্বতী ধীরে ধীরে সরিয়া যায়। নরহরি তাহাকে এড়াইতে চান, সরস্বতী স্পষ্ট বুঝিয়াছে।

একদিন উহাদের ঐ আখড়ায় রঘুনাথ আসিয়া ডাক দিল, চৌধুরি মশায়!

নরহরি ঘাড় নাড়িয়া না না করিয়া উঠিলেন। বৈঠকখানার দিকে নির্দেশ করিয়া বলিলেন, এখানে নয় সর্দার, কাছারি এখন ঐ দিকে। যাও তোমাদের বড়বাবুর কাছে। আমার ছুটি—

রঘুনাথ বলিল, তাই তো অবাক হয়ে যাচ্ছি, এটা কি রকম হল ? দুই পক্ষে সাজ-সাজ পড়ে গেছে। উকিল-মুহুরিগুলো আদালতের বটতলায় টুল পেতে ঝিমোত, এখন তারা সব চাপকান মেরামত করে ঐ ভরসায় হা-পিত্যেশ তাকিয়ে আছে। সৌদামিনী ঠাকরুন কসবায় কায়েমি বাসাভাড়া নিলেন, আর আপনি নিলেন ছুটি!

নরহরি বিষণ্ণ হাসি হাসিয়া বলিলেন, মামলা হবার আগেই আমার হার। অনেকে অনেক কথাই বলে সর্দার, সব আমার কানে আসে। তোমাদের বড়বাবুও নাকি বলাবলি করছিলেন, মামলার তোড়জোড় দেখে বাবা ভয় পেয়ে গেছেন। আহা, ছেলের আমার একান্ত ইচ্ছা, জমিদারি করে বেড়ায়। দোষ দিই নে। অনেক বিদ্যে শিখেছে— বিদ্যে খাটাবার উপায় তো চাই! আমি তাই উপায় করে দিলাম। বলিয়া নরহরি চুপ করিলেন।

চির-কঠোর সর্দারের চোখ ফাটিয়া জল আসিয়া পড়ে বুঝি! রুদ্ধ কণ্ঠে রঘুনাথ কহিল, চৌধুরি মশায়, আমরা তো বিদ্যে শিখি নি— আমাদের উপায় ?

বিদ্যে না শিখলে বিভুর হয়ে ক্ষুদ খেয়ে বিদায় নিতে হবে। অন্য উপায় নেই। নিজের রসিকতায় চৌধুরি নিজেই হা-হা করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিতে লাগিলেন, দিন বদলাচ্ছে। তুমি-আমি লাঠি ধরে ঠেকাতে পারব কেন ? ধুলোয় পড়ে মরে থাকব, কেউ চেয়েও দেখবে না। তার চেয়ে শ্যামকান্ত যেমন যেমন বলে, সেই রকম করে যাও—সুখে থাকবে! ওর খুব সাফ মাথা, সব জিনিস ভাল বোঝে।

আর আপনি ?

নরহরি বলিলেন, আমার কথা কেন সর্দার ? বুড়ো হয়ে গেছি।

রঘুনাথ বলিল, কিন্তু আমরা বরাবর ভাবতাম, বুড়ো কোনদিন হবেন না আপনি—

কাশিয়া গলা পরিষ্কার করিয়া লইয়া নরহরি বলিতে লাগিলেন, আমিও ভাবতাম তাই। দশটা দিন আগেও বুড়ো ছিলাম না। বউভাসির চকে তোমরা সব লাঙল চালাতে গেলে—কেউ মাঠে, কেউ

বাঁধে, কেউ বা নৌকোর মধ্যে সমস্ত দিন ধরে হল্লা করে এলে। সন্ধ্যের পর শ্যামকান্ত এল সঙ্গে দু-চারজন মাতব্বর ব্যক্তি। সবাই বলে, দিন দুপুরে পরের জমিতে পড়ে এমনটা করা ঠিক নয়। আইন বড় খারাপ। আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম। আইন আবার কি? যার লাঠি, তার মাটি—এই তো আইন।

কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন। তারপর আবার বলিতে লাগিলেন, বুড়ো হয়েছি বলে সেদিনও আমি ভাবতে পারি নি। ওদের সমস্ত কথায় কেবলি হাসি পাচ্ছিল। ভাবছিলাম, শ্যামশরণ চৌধুরির বাড়ির মধ্যে এসে এরা এসব বলে কি? দাঙ্গার দোষ দেখাচ্ছে এখানে বসে! ঐ পাথরের দেয়ালগুলোর যদি জোড় খুলে দেখা যায়, ওর ভাঁজে ভাঁজে কত মাথার খুলি কত হাড়-পাঁজরা বেরুবে বল তো? শশিশেখরকে বলছিলাম তাই যে, দেশসুদ্ধ বুড়িয়ে গেল কি করে? শশিশেখর বলল, বুড়ো আপনিই তালুই মশাই। বসে বসে মড়ার হাড় আগলাচ্ছেন, ওদিকে আর কেউ ফিরেও চাইবে না।

রঘুনাথ রাগ করিয়া বলিল, না চাইল তো বয়ে গেল। কিন্তু লাঠি হল গিয়ে মড়ার হাড়? শশী উকিল বলল একথা?

নরহরি বলিতে লাগিলেন, অন্যায় কথা কি বলেছে সর্দার? আমাদের বাপ-পিতামহের হাড় এই লাঠি। কত পুরুষ ধরে এই লাঠি রাজ্য করে এসেছে। এবার যদি সে লাঠিতে ঘুন ধরে থাকে, ঝগড়া করতে যাব কার সঙ্গে?

অনেক দিনের লোক রঘুনাথ, নরহরির অনেক সুখ-দুঃখের সাথী। রাগের মুখে তার পাত্রাপাত্র জ্ঞান রহিল না। বলিল, আমরা সামান্য লোক—ঢালি, আমাদের লাঠিতে ঘুন ধরবার দেরি আছে চৌধুরি মশাই। সর্বস্ব ছেড়ে দিয়ে এবার আপনি লাঠি অন্দরে নিয়ে এসেছেন, ঘুন-ধরা লাঠি মেয়েদের হাতে দিয়ে যাবেন বুঝি।

চৌধুরি হাসিতে লাগিলেন। হাসিমুখে বলিলেন, ঠিক তাই। যাকে দেব ভেবেছিলাম, সে নিল না। তাদের দরকার নেই—কি করব? কি ভেবেছিলাম শুনবে সর্দার?

বলিতে বলিতে সহসা চৌধুরির কণ্ঠ কাঁপিয়া উঠিল, মুখের ভাব কেমন একরকম হইয়া গেল। বলিতে লাগিলেন, ইচ্ছা ছিল—শ্যামশরণকে আবার তাঁর পুরানো বাড়িতে নিয়ে আসব। শিবনারায়ণ ঘাড় নাড়ত, বিশ্বাস করি নি তার কথা। মিল করে ছেলের নামও রেখে দিলাম শ্যামকান্ত। তোড়জোড়ের ক্রটি থাকল না, কিন্তু শুকনো গাছ ঠেলে উঁচু করে ধরলেই কি আর তাতে পাতা গজায়? শ্যামশরণ স্বর্গে বসে হাসতে লাগলেন, নামের ফাঁকি অপমান হয়ে রাতদিন আমার বুকে সূঁচ ফোটাচ্ছে।

রঘুনাথ বলিল, লাঠি নিয়ে তাই এবার খেলতে লেগেছেন চৌধুরি মশাই। বেশি বুদ্ধি হয়েছে। দু-চারদিন খেলার পর ওঁদের শখ মিটবে—তখন লাঠি উনুনে চলে যাবে। রান্নাঘরের কাছাকাছি এগিয়ে এসেছে বটে!

খেলা? না, তা হবে না। দৃঢ় কণ্ঠে নরহরি বলিতে লাগিলেন, আগুনে পোড়ে পুড়বে—তবু আমার লাঠি নিয়ে কাউকে আমি খেলতে দেব না। লোকে বলে, লাঠিখেলা। খেলা করতে করতে আমিও এই লাঠি শিখেছিলাম। কিন্তু এখন এই ডানহাত আমার যেমন, হাতের লাঠিখানাও তেমনি। তাই নিয়ে খেলা করতে দিব আমি? আমার লাঠি মরবার আগে মেয়ের হাতে দিয়ে যাব—আর নয় তো মালঞ্চের জলে। রাতদিন তাই মেয়েকে নিয়ে আছি, ঘুমিয়েও স্বস্তি নেই। তা ও পারবে···পারবি না রে খুকী?

রঘুনাথ নিস্তব্ধ হইয়া শুনিতে লাগিল। নরহরি বলিতে লাগিলেন, ঐ দেখ, বউমা আমার মুখখানা শুকনো করে বসে বসে দেখছেন। কিন্তু হবে না মা, তোমার রক্তে এ জিনিস নেই। যার সঙ্গে তোমার জীবন কাটাতে হবে, সে অশ্রদ্ধা করে একে। তোমার হাতে আমি কি খেলা করতে লাঠি দেব?

আবার বলিয়া উঠিলেন, রঘুনাথ, তোমার মেয়েকেও শেখাও না দু চারটে বাড়ি। ভাল মেয়ে যমুনা।

বাপের কাঁধের বোঝা শ্যামকান্ত সর্বান্তঃকরণেই লইয়াছে। পিতৃভক্ত ছেলে, সন্দেহ নাই। দিনরাত যুক্তি-পরামর্শ, লোকজন ডাকাডাকি। মালাধর তো ভোরবেলা হইতেই কুড়িখানেক মানুষ লইয়া সাক্ষির তালিম দিতে বসিয়া যায়। দু-একদিন অন্তর কসবায় যাতায়াত চলিতেছে। এমনি সময়ে একদিন শ্যামকান্ত মালাধরের সঙ্গে নরহরির কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, নানারকম ছল-ছুতো করে অনেক দিন কাটান গেল। এবারে হাকিম আর শুনবে না। পরশু মোকর্দমা।

নরহরি বলিলেন, আমি তা শুনে কি করব?

শ্যামকান্ত বলিল, আপনি আপনার ঘোড়ায় যাবেন। শেষরাতে রওনা হলে আদালত বসবার মুখেই পৌঁছে যাবেন। আমরা কাল সকালে আগে-ভাগে পানসিতে রওনা হব।

নরহরি বলিলেন, মামল-মোকর্দমা আমি তো বুঝি নে। আমি গিয়ে করব কি?

মালাধর সামনে চলিয়া আসিল। হাত-মুখ নাড়িয়া বলিতে লাগিল, বুঝতে হবে না কিছু। বুঝবার কিছু বাকি রেখেছি আমরা? সমস্ত ঠিকঠাক। আপনি খালি বলে আসবেন, বউভাসির চক বলে কথিত সম্পত্তিতে আপনি বিশ বছরের দখলিকার। ব্যস।

নরহরি বলিলেন, বললেই অমনি হয়ে যাবে?

মালাধর সগর্বে শ্যামকান্তর দিকে চাহিল। বলিল, তা হবে কেন? আরো কত পাকা দলিল-দস্তাবেজ রয়েছে! অত বড় পানসি তবে ভাড়া হচ্ছে কি জন্যে?

দলিলের সিন্দুকসুদ্ধ নিয়ে যাবে নাকি?

মালাধর হাসিয়া বলিল, সিন্দুকে আর ক'টা দলিল আছে চৌধুরি মশাই? বেশির ভাগ তো এখনও চালের কলসিতে। নরহরি

বিস্ময়ের ভাব দেখিয়া বলিতে লাগিল, আজ্ঞে হ্যাঁ। কলসির ভিতর সব পড়ে পড়ে পুরানো হচ্ছে। শ্যামশরণের আমলেরও রয়েছে—আজকের নয়। জমাখরচ সেহা করচা—সমস্ত। বেরুক আগে, দেখবেন তখন। কারো বাপের সাধ্যি হবে না যে বলে, ওসব আপনার গোলাম এই অধমাধম মালাধর সেনের কারুকার্য। বলিয়া নিজের চতুরতায় মালাধর হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল।

হাসি থামিয়া গেল নরহরির কথায়। শ্যামকান্তকে লক্ষ্য করিয়া নরহরি গম্ভীর কণ্ঠে কহিলেন, আমার কোন পুরুষে কেউ কাঠগড়ায় ওঠেন নি, আমিও উঠব না। আমার ছুটি। যা করতে হয়, তোমরা কর গিয়ে। এতখানি করে ফেলেছ, আর বাকিটুকু পারবে না?

শ্যামকান্ত বলিল, তা যদি হত, মিছামিছি আপনাকে কষ্ট দেব কেন বলুন? আপনার নামে বিষয়, মোকর্দমাও আপনার নামে—একটা বার শুধু হাকিমকে দেখা দিয়ে আসতে হবে। তারপর অতিশয় ব্যাকুলভাবে বলিতে লাগিল, আমরা অনেক খেটেছি, সমস্ত একেবারে অনর্থক হয়ে যাবে। আর এটায় গোলমাল বেরুলে—বলা তো যায় না, ফৌজদারিতে যদি জেলের হুকুম-টুকুম হয়ে বসে, তাতেও মুখ উজ্জ্বল হবে না বাবা। এবারটা আপনাকে যেতেই হবে।

মালাধরও বলিল, কোন গোলমাল নেই চৌধুরি মশাই। এজলাসে গিয়ে হলফ পড়বেন—ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ জানিয়া যাহা বলিতেছি তাহা অক্ষরে অক্ষরে সত্য। তারপর ক'টা মাত্র কথা বলেই খালাস। তার পরে আমরা তো রইলাম—

শেষ পর্যন্ত কিন্তু গোলমাল বেশ জমিয়া উঠিল।

নরহরি কাঠগড়ায় উঠিয়া কথা কয়টি নির্ভুল ভাবেই বলিলেন, বউভাসি নামক একটি চক সৌদামিনী কিনিয়াছেন বটে, কিন্তু জমি তাহাতে মাত্র দুই-তিন শ' বিঘা। চকের উত্তর সীমানা নরহরির চক। সেই চকের জমি অন্যায়ভাবে গ্রাস করিবার চেষ্টা হইতেছে। নরহরির প্রজাপাটক ঐ সব জমি বরাবর চাষ করিয়া থাকে—এ কেবল

এবারের একটি দিনের ঘটনা নহে। কিন্তু মিথ্যা মামলার সৃষ্টি করিয়া চৌধুরিকে নাস্তানাবুদ করা এই প্রথম।

প্রমাণ।

প্রমাণের অভাব নাই কিছু। কমপক্ষে ঝুড়িখানেক কাগজপত্র দাখিল হইয়াছে। কতকগুলি তার অতি-পুরানো সেকেলে অদ্ভুত ছাঁদে লেখা, পোকায় কাটা। আবার পাল্টা জবাবে বরণডাঙা তরফ হইতে যাহা সব বাহির হইতে লাগিল, তাহাতেও আতঙ্ক লাগে। হাজার দলিলের হাজার রকম মর্ম গ্রহণ করিতে করিতে টানাপাখার নিচে বসিয়াও হাকিম গলদঘর্ম হইয়া উঠিলেন।

কাগজের স্তূপ উল্টাইতে উল্টাইতে বরণডাঙা-পক্ষের পরেশ উকিল নরহরিকে লক্ষ্য করিয়া কহিল, বাপরে বাপ। আয়োজন সামান্য নয়। একেবারে বিশ বছরের দাখলে সংগ্রহ। একখানা হারায় নি, নষ্ট হয় নি। আপনার প্রজারাও বড় ভালো চৌধুরি মশাই। দলিলগুলো দরকার মাফিক ঠিক ঠিক বের করে এনে দিয়েছে।

নরহরি রাগ করিয়া বলিলেন, ভাগ্যিস দিতে পেরেছে। নইলে আপনাদের দয়ায় রাঁধা-কইমাছ যে এতক্ষণ কানে হেঁটে বেড়াত!

কিন্তু এত দাখলে লেখা হল কোথায়, তাই কেবল ভাবছি।

মালাধর নরহরির পিছনে দাঁড়াইয়াছিল। ফিসফিস করিয়া সে সমঝাইয়া দিল, মস্ত বড় কাছারি রয়েছে আমাদের। আটচালা ঘর—দেউড়ি সমেত। সেখানেই আদায়পত্তোর হয়, দাখলে লেখা হয়—

নরহরি কহিলেন, ভেবে কিনারা করতে পারলেন না উকিলবাবু? দাখলে লেখা হয়ে থাকে পাটের আড়তে।

উকিল মৃদু হাসিয়া বলিল, পাটের আড়তে নয়, পাটোয়ারির ঘরে। সে আমি জানি।

নরহরি কহিলেন, তা যদি বলেন, আমার কাছারি-ঘরটা তবে একদিন দয়া করে দেখে আসবেন মশাই।

উকিল কহিল, আমি কেন—যাঁরা দেখবার তাঁরাই গিয়ে দেখে

আসবেন। ঘরটা শক্ত করে বাঁধবেন—দেখবার আগেই যেন উড়ে না পালায়।

সৌদামিনীর উকিল পুরা দুইদিন এমনি কত কি জেরা করিল, পনের-কুড়িটা সাক্ষিরও তলব হইল। কিন্তু মীমাংসা কিছুই হয় না, সমস্যা আরও সঙিন হইয়া ওঠে।

হাকিম রাগ করিয়া কলম ছুঁড়িয়া বসিয়া রহিলেন। শেষে সরেজমিন তদন্তের হুকুম হইল। বিচার স্থগিত রহিল।

বাহিরে আসিয়া মালাধর হাসিয়া খুন। বলে, রসগোল্লা খাওয়ান বড়বাবু। জয় নির্ঘাৎ। গোটা ঢালিপাড়া প্রজা হয়ে এসেছে, পানসির খোল বোঝাই দলিল-দস্তাবেজ—তার উপর কাছারি বাড়ি, নায়েব-গোমস্তা···আর চৌধুরি মশাই যা বলা বলে এলেন—

শ্যামকান্ত বলিল, রোসো—তদন্তটা হয়ে যাক আগে। কোন বেটা যাবে, সে আবার কি করে আসে—

মালাধর বলিল, ফৌজদারি তো ফেঁসে গেল। এখন সত্ত্বাসত্ত্বির কথা। দেওয়ানি মামলা মশাই, যার নাম হল 'দেও আনি—যা কিছু আছে, সব এনে এনে দিয়ে যাও। ব্যস্। তদন্ত এখন গড়াতে গড়াতে ছ-মাসের ধাক্কা। দুটো মাস সময় দিন আমাকে—কি কাছারি-বাড়ি করে দেব দেখবেন। দুটো মাসের মাত্র সময় চাই।

কিন্তু স্বপ্নেও যাহা আন্দাজ হয় নাই, তাহাই ঘটিল। আদালতের আদিকাল হইতে এমন অসম্ভব কাণ্ড বোধকরি কখন হয় নাই। ঐ শ্যামগঞ্জ-বরণডাঙা অঞ্চলটাতে জমাজমি-ঘটিত আরো কয়টা তদন্ত ছিল। ডেপুটি যাওয়ার ঠিক হইয়াই ছিল। তাঁর সেই তালিকার মধ্যে বউভাসিটাও জুড়িয়া দেওয়া হইল। ঢালিপাড়ার যারা সাক্ষি হইয়া আসিয়াছিল, তারা সব বাড়ি ফিরিয়া গিয়াছে। কেবল পরবর্তী আর কয়েকটি কাজকর্মের দরুন এবং শশিশেখর একটু ছোট-খাট ভোজের আয়োজন করিয়াছে সেইজন্য নরহরিরা যান নাই। রঘুনাথ ঘোড়া লইয়া চলিয়া গিয়াছে, ভোররাত্রে পানসিতে ইহারা একত্র

হইয়া রওনা হইবেন, এইরূপ ঠিক আছে। বিকালে অকস্মাৎ শশিশেখর জরুরি খবর পাইল, ডেপুটি বউভাসির চকের তদন্ত করিতে পরের দিনই পৌঁছিয়া যাইবেন।

শ্যামকান্ত মাথায় হাত দিয়া বসিল। এখন উপায়? তদন্তের তারিখ একটা সপ্তাহও পিছাইয়া দেওয়া যায় না?

শশিশেখর কহিল, বউভাসি পথেই পড়ে গেল কিনা। ঐটে সেরে তারপর অন্যান্য জায়গায় যাবেন। ও আর ঠেকাবার উপায় নেই। এখনো বেলা আছে, চলে যান—কাছারি গিয়ে তাড়াতাড়ি গুছিয়ে-গাছিয়ে ফেলুন গে—

নরহরি ম্লান হাসিয়া বলিলেন, মালাধর রয়েছে—গুছাবার বাকি নেই কিছু। কাছারিরই কেবল অভাব। কিন্তু মালাধর, আমাকে এমন করে দাঁড় করিয়ে তোমরা মিথ্যেবাদী সাজালে? ঘোষগিন্নি এখনই হাসতে আরম্ভ করেছে, টের পাচ্ছি।

মালাধর ক্ষুব্ধস্বরে কহিল, হাসে কি সাধে কর্তা? ঘুস দিয়েছে কত? আদালত-বাড়ির টিকটিকিগুলোর পর্যন্ত পেট ভরতি। আর আমাদের হল কি? আমি করছি তদ্বির, টাকার থলি বড়বাবুর হাতে। অমন কাঁচা তদ্বিরে কাজ হয় কখনো?

খুব তাড়াতাড়ি ফিরিবার দরকার। আর পানসি নয়—তিনখানা পালকির বন্দোবস্ত হইল। নরহরি শ্যামকান্ত মালাধর—সকলেরই পালকি। হুমহাম করিয়া বিকালবেলা বেহারারা শ্যামগঞ্জের দিকে ছুটিল।

(১২)

বর! বর!

ঠাহর করিয়া দেখিয়া ভানুচাঁদ বলিল, হ্যাঁ, বরই বটে! বরের পালকি, কনের পালকি—আর ঐ শেষের পালকি মেরে চলেছেন বোধ হয় ওদের পুরুত মশায়—

ঘাটে ছিল একখানা ডিঙি, সেইটাই ঠেলিয়া স্রোতে ভাসাইয়া

দিল। ঝুপ-ঝাপ করিয়া তখন আরও আটদশ জন জলে ঝাঁপাইয়া আসিয়া ডিঙিতে চড়িয়া বসিল। অত লোকের ভারে ডিঙি জলের উপর আঙুল তিনেক মাত্র জাগিয়া আছে। একটু এপাশ-ওপাশ করিলেই জল ওঠে।

আকাশে চতুর্থীর ক্ষীণ চাঁদ। অনতিস্পষ্ট জ্যোৎস্নায় রঘুনাথও ওপারের দিকে খানিকক্ষণ নজর করিয়া দেখিল। তারপর কহিল, বর না হাতী! না বাজনাদার, না একটা বরযাত্রী···আরে একটা বোঠেও নিতে পারিস নি তোরা কেউ, হাত দিয়ে কাঁহাতক উজোন ঠেলে মরবি? বর—তা তোদের এত তাড়া কিসের? বরের তো মাথায় ছুটো শিং বেরোয় নি!

ভানুচাঁদ মাঝ-নদী হইতে কহিল, বাজনা-টাজনা সব আগে-ভাগে রওনা করে দিয়েছে। বোঠে খোঁজাখুঁজি করতে গেলে এরাও সরে পড়বে ততক্ষণে। চুপি চুপি চলেছে কেমন—বারোয়ারির চাঁদা-টাদা বলে পথে কিছু না দিতে হয়। মানুষ আজকাল কম শয়তান হয়ে উঠেছে!

কিন্তু আশ্চর্য, পালকি না পলাইয়া ওপারের খেয়াঘাটে বটতলায় নামিল। ক্রমশ দেখা গেল, তিনখানাই পাশাপাশি খেয়ার উপর উঠিয়াছে। ভানুচাঁদেরা ডিঙি লইয়া আর আগাইল না। এপারেই আসিতেছে, তখন মোলাকাৎ তো নিশ্চয় হইয়া যাইবে।

খেয়া আগাইয়া আসিলে তাড়াতাড়ি পাশে ডিঙি লাগাইয়া দেখে, আগের বড় পালকির মধ্যে চৌধুরি মহাশয় চুপচাপ বসিয়া। চৈত্র-সন্ধ্যায় মৃদু মধুর হাওয়া দিতেছে। জ্যোৎস্না-ধূসর নদীজল ছল ছল করিয়া নৌকার নিচে আহত হইতেছে, নৌকা নাগরদোলার মতো দুলিতেছে। ঢালিপাড়ার ঘাটে অনেক লোকের জটলা, তাদের প্রত্যেকটি কথাবার্তা বেশ স্পষ্ট হইয়া ভাসিয়া আসিতেছে। কিন্তু নরহরির লক্ষ্য কোনদিকে নাই, পালকির মধ্যে স্থাণুর মতো বসিয়া। ডিঙিটা আসিয়া খস করিয়া খেয়ানৌকার গায়ে তাঁহার ঠিক পাশে লাগিল, তাহাও বোধকরি টের পাইলেন না। পিছনে শ্যামকান্ত ও

মালাধর বাহিরের নৌকার গলুয়ের দিকে কাছাকাছি বসিয়াছিল। তাহারা ডিঙির দিকে তাকাইয়া দেখিল, কিছু বলিল না।

খেয়া ঢালিপাড়ার ঘাটে গিয়া লাগিতেই কয়েক জনে কলরব করিয়া উঠিল।

কে? কে?

ভানুচাঁদ লাফাইয়া কূলে গিয়া নামিল। ঠোঁটের উপর আঙুল রাখিয়া সকলকে থামাইয়া দিল। ফিস-ফিস করিয়া বলিল, চুপ! চৌধুরি মশায়। অসুখ করেছে ওঁর।

সকলকে সরাইয়া রঘুনাথ আগে আসিয়া দাঁড়াইল। পালকি ঘাটের উপর নামাইতেই তাহাতে মুখ ঢুকাইয়া ব্যাকুল কণ্ঠে সে জিজ্ঞাসা করিল, খবর কি?

আর খবর! নরহরি খানিক ঠায় বসিয়া রহিলেন। তারপর ধীরে ধীরে বাহিরে আসিয়া পালকি ভর দিয়া দাঁড়াইলেন। কি যে বলিবেন, কি করিতে হইবে, কিছুই তিনি বুঝিতে পারিতেছেন না।

চাঁদ অস্ত গিয়া ইতিমধ্যে চারিদিকে ঝাপসা হইয়া উঠিয়াছে। তাহাতে নরহরির মুখের ভাবটা ঠিক ঠাহর পাইল না, কিন্তু দাঁড়াইবার সেই নির্বাক ভঙ্গিতে রঘুনাথের বুকের মাঝখান অবধি মোচড় দিয়া উঠিল। তাড়াতাড়ি সে পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, চৌধুরী মশায়, আমরা আছি কি করতে? বলুন কি করতে হবে?

কিছু না। বলিয়া নরহরি নিশ্বাস ফেলিলেন। ক্ষণকাল মৌন থাকিয়া বলিতে লাগিলেন, শিবনারায়ণের বউ মেয়েমানুষ হয়েও এমন তদ্বির করে রেখেছে—কিচ্ছু আর করবার নেই সর্দার। পরের ভরসায় লড়তে গিয়ে আমার এই দশা।

সামনে অন্তত পঞ্চাশ জোড়া চোখ নিঃশব্দে জ্বলিতেছে। মুখ তুলিয়া তাহাদের দিকে চাহিয়া নরহরি বলিলেন, হাঁ—পরের ভরসা বই কি! লাঠি ছাড়া আর সব-কিছু আমার কাছে পর। আমায় ধরে নিয়ে গেল মামলা করতে। ওরা শিখিয়ে দিল, হলপ করে

আদালতে বলে এলাম, আমরা চকের জমি বরাবর দখল করে আসছি—আমরাই আদায়-পত্তোর করছি—

ঢালির দল একসঙ্গে গর্জন করিয়া উঠিল, করছিই তো।

মৃদু হাসিয়া নরহরি বলিলেন, তা করছি। কিন্তু কাছারি অবধি নেই। অথচ বলে আসা হল, চরের উপর মস্ত কাছারি-বাড়ি—

নেই, তা হতে কতক্ষণ?

নরহরি কহিলেন, কাল সকালে তদন্তে আসবে—এই রাতটুকু পোহালেই।

শ্যামকান্ত ম্লানভাবে কহিল, তদন্ত অন্তত একটা হপ্তা সবুর করাবার চেষ্টা করলাম—তা কিছুতে শুনল না।

রঘুনাথ পিছনে দলের দিকে একনজর তাকাইয়া বলিল, পুরো একটা রাত তো রয়েছে—কি বলিস তোরা? আচ্ছা চৌধুরি মশায়, আমরা চললাম।

তারা চলিল। পিছন হইতে নরহরি বলিতে লাগিলেন, অনেক-দিনের কাছারি যে বাপু, রীতিমতো পুরাণো। ঝাড়ের টাটকা বাঁশের চাল, আর নতুন খড়ের ছাউনি হলে হবে না। অনর্থক খাটনি—ওসব করতে যাস নে তোরা। বলিতে বলিতে হঠাৎ কিন্তু এত উদ্বেগের মধ্যেও নরহরি হাসিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, মালাধর কাছারি পুরানো করা যায় কেমন করে বলতে পার? দলিলপত্তোর চালের কলসিতে রাখ, কাছারি-বাড়ি তো ঢুকবে না তোমার কলসির মধ্যে।

চলিতে চলিতে থমকিয়া দাঁড়াইয়া ঢালিরা নরহরির কথা শুনিল। মুখ ফিরাইয়া রঘুনাথ কহিল, চৌধুরি মশায়, মালাধর বলতে পারবে না, আমরা পারি—

নরহরি মুখ চাহিতে তার তীব্র চোখ দু'টার দিকে নজর পড়িল।

রঘুনাথ বলিতে লাগিল, ঐ যে গাবগাছের ধারে আটচালা ঘর দেখা যাচ্ছে—আমার ঠাকুরদাদা দক্ষিণের কারিগর এনে বড় শখ করে ও-ঘর তৈরি করেছিলেন। পল-তোলা সুন্দরির খুঁটি, রঙ-করা সাজপত্তোর, সেকেলে কাজকর্ম—অমন আর হয় না আজকাল—

শ্যামকান্ত বলিল, সে সব শুনে আর লাভ কি হবে?

রঘুনাথ হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বলিল, পাঁচ-শ' ভূতে ঐ ঘর কাঁধে নিয়ে রাত্রের মধ্যে চরের উপর বসিয়ে দিয়ে আসবে।

বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে নরহরি কহিলেন, তারপর?

ঘরের পুরানো ছাউনি, চাই কি মেঝের উপর পুরানো ভিটের মাটি আলগোছে বসিয়ে রেখে আসবে। হবে না তা হলে?

এতক্ষণে মালাধরের কথা ফুটিল। বলিল, হবে না কেন—খুব হবে। ধড়-ফড় করে তো বলে গেলে—সত্যি সত্যি পেরে উঠলে, নিশ্চয় হবে।

নরহরি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তোমার কি হবে?

ভালই হবে। সহজ প্রশান্ত হাসি হাসিয়া রঘুনাথ বলিল, লাভ হবে আমার, পুরানো দিয়ে নতুন পেয়ে যাব। আমার নতুন ঘর বানিয়ে দেবেন আপনারা।

শ্যামকান্ত তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া বলিল, সে তো দেব। তা ছাড়া বকশিশ দেব খুব ভালো রকম—

দেও দেও, না দেও না-ই দেও। ক্ষতি নেই বড়। হঠাৎ কেমন ধরনের অর্থহীন হাসি হাসিয়া রঘুনাথ বলিল, কোন অসুবিধে নেই কর্তা। পরিবার মরেছে ও-বছর, একটা মেয়ে যমুনা—তা তোমাদের ওখানেই নিয়ে তুলব না হয়—

তাজ্জব কাণ্ড! সকালে পথ-চলতি লোকেরা দেখিয়া অবাক হয়, কবে কখন এত সব ব্যাপার হইল? হঠাৎ বিশ্বাস হইতে চায় না—চক্ষু কচলাইয়া দেখিতে হয়, ব্যাপারটা স্বপ্ন কিনা। কাল দেখা গিয়াছে, দিগন্তবিসারী বালুক্ষেত্র—আজ সেখানে প্রকাণ্ড কাছারি-ঘর। চারিদিক ফিটফাট, মেজের আগাগোড়া সতরঞ্চি বিছানো, তার এক পাশে নিচু তক্তাপোষ, জাজিম পাতা—হাতবাক্স সেহা রোকড় খতিয়ান দাখিলার বহি···মালাধর এসব লইয়া মহাব্যস্ত। হুঁকাদানে সাজা-তামাক পুড়িয়া যাইতেছে, একটা টান দেওয়ার

ফুরসৎ হইতেছে না। পৈঠার দক্ষিণে ডালপালা-মেলানো কামিনী-ফুলের গাছ। দু এক করিয়া ক্রমে কৌতূহলী গ্রামের লোক চারিপাশে ভাঙিয়া আসিতে লাগিল। এমন সময় মাঠের মধ্যে পালকি।

কে আসে? হাকিম?

না না হাঙরমুখো ডাণ্ডা ঐ যে। ও ঠিক চৌধুরি মশায়।

পালকি হইতে নামিয়া ধীর মন্থর পদে কামিনীতলা দিয়া নরহরি চৌধুরি ফরাসে আসিয়া তাকিয়া ঠেস দিয়া বসিলেন। নূতন করিয়া তাওয়া চড়িল। খানিকক্ষণ নিবিষ্ট মনে ধূমপান করিয়া গড়গড়ার নলটা নামাইয়া রাখিয়া চারিপাশের লোকজনের দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া আবার তিনি পালকিতে চড়িলেন। পালকি এবার গ্রামের দিকে চলিল। তারপর আর এক কাণ্ড—বেলা প্রহরখানেক হইতে আর এক ধরনের মানুষ গ্রাম হইতে ঢালিপাড়ার দিক হইতে আসিতে লাগিল। ইহারা সব কাজের মানুষ। কেহ আসিয়াছে খাজনার টাকা লইয়া, কেহ জমির সীমানার গণ্ডগোল মিটাইতে।

মুহুরি দাখিলা লেখে, মালাধর টাকা বাজাইয়া হাতবাক্সে ফেলিয়া হুঁকার মাথা হইতে কলিকা নামাইয়া তাদের হাতে দিয়া বলে তারপর? মোড়লগাতির বকনাজোড়া নিয়ে এসেছ নাকি কৈলেস বেয়াই আজকাল বলছে কি? মেয়ে পাঠাবে না পুজোর সময়?

নানা কথাবার্তা ও কাজকর্মে ঘর গমগম করিতে থাকে।

বা-রে কাছারি জমিয়েছে। পাতাল ফুঁড়ে ঘর উঠল নাকি?

যারা কাজকর্মে আসা-যাওয়া করিতেছে, পথের লোকের মন্তব্য শুনিয়া রাগিয়া ওঠে।

কোথাকার লোক হে তোমরা? তিনপুরুষ ধরে এখানে খাজনা লেনদেন হচ্ছে, আর বলে কি না—

বড় জোর দুপুর নাগাদ হাকিম মহাশয় পৌঁছিয়া যাইবেন, এ প্রকার আন্দাজ ছিল। শ্যামকান্ত সেই দুপুর হইতে বসিয়া আছে

হাকিমের পৌঁছিতে কিন্তু সন্ধ্যা হইয়া গেল। এবং সম্বর্ধনার প্রথম প্রস্থ শেষ হইতে রাত্রি এক প্রহর।

খুশীমুখে ডেপুটি বলিলেন, এ কি করেছেন শ্যামকান্ত বাবু? না না, এ ভারি অন্যায়। এত সবের কি দরকার ছিল বলুন তো!

কিছু না—কিছু না। শ্যামকান্ত বিনয়ে ঘাড় নাড়িল। বলিল, নানান অসুবিধে এ জায়গায়। মনে তো কত ইচ্ছে হয়, কিন্তু সে কি হবার জো আছে? মালাধর, আর দেরি কোরো না, কাগজপত্তোর বের করে ফেল—একটা করে সমস্ত দেখিয়ে দাও। আমি বেশি রাত করতে দেব না হুজুর, তা আগে থাকতে বলে রাখছি। পালকি-বেহারা ঠিক রয়েছে, হুকুম হলেই নীলগঞ্জের ডাকবাংলায় পৌঁছে দিয়ে আসবে।

ডেপুটির মুখে হাসি ধরে না। বলিলেন, পালকিও রেখে দিয়েছেন নাকি? আপনার সকল দিকে লক্ষ্য শ্যামকান্ত বাবু। সত্যি বড় ভাবনা হয়েছিল, এই ঘুরঘুট্টি অন্ধকার—ঘোড়ার পিঠে এই সময় অদ্দূর যাওয়া······আর রাস্তাঘাটের যা দশা দেখে এলাম—বড় মুশকিল হত তা হলে। ডাকবাংলায় গিয়ে একবার পৌঁছুতে পারলে আর কোন অসুবিধে নেই। লোকজন নিয়ে এসেছি।

শ্যামকান্ত বলিল, সে জানি। সমস্ত খবর এসেছে আমার কাছে। আপনার খানসামা-বেয়ারারা নাক ডেকে ঘুমুচ্ছে এতক্ষণ।

ঘুমুচ্ছে? তার মানে?

মুখ টিপিয়া হাসিয়া শ্যামকান্ত বলিল, বসে বসে কি আর করবে বলুন। ডাকবাংলাটা সরকারের—কিন্তু আশপাশের এলাকা যে আমার! আমার লোকজন গিয়ে শাসাতে লাগল—'পড়েছ শমনের হাতে, খানা খেতে হবে সাথে।' রান্নাঘর থেকে ওদের তাড়িয়ে দিয়ে, আমরাই সব দখল করে ফেলেছি। খানিকক্ষণ বসে বসে অবাক হয়ে তারা কাণ্ড-কারখানা দেখল, শেষে হাই তুলতে লাগল। আমার লোক তাড়াতাড়ি বিছানা করে দিল। ওরা ক্ষিধে বাড়াবার জন্য একটু একটু আদা-জল খেয়ে শুয়ে পড়েছে।

বলিয়া সে সশব্দে হাসিয়া উঠিল।

কিন্তু মালাধর কাগজপত্রে হাত না দিয়া অকস্মাৎ ত্রস্তভাবে উঠিয়া বরকন্দাজদের হাঁকাহাঁকি লাগাইল।

হল কি?

হুজুর এইবার কাজে বসবেন—এখনো মশালগুলো জ্বালাচ্ছে না। দেখুন দিকি বেটাদের কাজ।

কিন্তু কাজে বসিবে কি, হুজুর অবাক হইয়া দেখিতেছেন সমস্ত মাঠ আলো করিয়া একের পর এক বিশ-পঁচিশটা মশাল জ্বলিয়া উঠিল। আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলেন, ব্যাপার কি শ্যামকান্তবাবু?

নিতান্ত লজ্জিত হইয়া শ্যামকান্ত বলিতে লাগিল, ঐ যে বললাম একটু আগে, কাজকর্ম তাড়াতাড়ি সেরে নিতে হবে। জায়গাটা বড্ড খারাপ। রাত্তিরে বাদার যত কেউটে সাপ উঠে এসে ঐ মেজের উপর, খাটের পায়ার কাছে, দেয়ালের উপর—সব জায়গায় কিলবিল করে বেড়ায়। সেবার হল কি—নিবারণ মুহুরি রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে ঢ্যাড়স কুটছে—ঝুড়ির মধ্যে মা-মনসা। তরকারি বের করতে গেছে, অমনি দিয়েছে ঠুকে। সে বিষ মোটে সাহায্য হল না। সাবধানের মার নেই—তাই ঐসব আলোর ব্যবস্থা করেছি। না না, হুজুর, আপনি ব্যস্ত হবেন না—আলো দেখে ভয় পেয়ে সাপ বাদা থেকে না-ও উঠতে পারে।

হাকিম ততক্ষণে উঠিয়া দাঁড়াইয়া জুতার ফিতা বাঁধিতে লাগিলেন। বলিলেন, পালকি ডাকুন। আজকে এসব থাক। কাল দিনমানে এসে তদারক করা যাবে।

মালাধর অতি সাবধানে আগে আগে আলো লইয়া চলিল। শ্যামকান্ত হাকিমকে বড় পালকিতে তুলিয়া নিজে ছোটটায় উঠিয়া বসিল। সে রাত্রি শ্যামকান্তও ডাকবাংলায় কাটাইল।

সকালবেলা মিনিট দশেকের মধ্যে তদন্ত হইয়া গেল। উভয় পক্ষের কথা শুনিয়া সাক্ষ্য লইয়া ডেপুটি ঘোড়ায় উঠিতে যাইতেছেন,

শ্যামকান্ত আসিয়া নিবেদন করিল, পালকি রয়েছে—আর একবার সরেজমিনে কাছারি-বাড়ির দিকে গেলে হত না?

হাকিম বলিলেন, কেন, তদন্ত কাল তো সেরে এসেছি।

নমস্কার করিয়া তিনি ঘোড়া ছুটাইলেন। হাকিমের সাঙ্গোপাঙ্গরাও বিদায় হইল। শ্যামকান্ত ও মালাধরের মধ্যে চোখাচোখি হইল একবার। মালাধর বলিল, আজ্ঞে হ্যাঁ—ঠিক হয়েছে বড়বাবু, ষোল আনা তদ্বির হয়েছে। সৌদামিনী ঠাকরুন পেরে উঠবেন না এবার—

(১৩)

বিছানায় পড়িয়া পড়িয়া কীর্তিনারায়ণের কানে অনেকগুলা ঢাকের আওয়াজ আসিতেছে। আওয়াজ স্পষ্ট নয়, ওপারে অনেক দূর হইতে আসিতেছে। খুশীতে মন ভরিয়া গেল, চড়ক আসিয়া গেল নাকি? সৌদামিনী একবার কি কাজে ঘরের ভিতর আসিলেন; তাঁকে জিজ্ঞাসা করিল, গাজনের বাজনার মতো লাগছে, হাজরাতলায় বাজাচ্ছে যেন—না?

ইহার জবাব না দিয়া সৌদামিনী ধমক দিলেন, রোদ চড়চড় করছে—এখনো শুয়ে পড়ে রয়েছ, ছিঃ।

কীর্তিনারায়ণ উঠিল কিনা, দেখিবার জন্য তা বলিয়া তিনি দাঁড়াইলেন না। যেমন আসিয়াছিলেন, তেমনি বাহির হইয়া গেলেন; গম্ভীর বিষণ্ন মুখ।

জানালার কাছে একটা নিমগাছের শাখাপ্রশাখা ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিল। একটুকরা ডাল ভাঙ্গিয়া দাঁতন করিবে, কিন্তু হাত বাড়াইয়া বিস্তর চেষ্টা করিয়াও কীর্তিনারায়ণ নাগাল পাইল না। উঠানে নামিয়া গিয়া গাছে চড়িল। একেবারে মগডালে উঠিয়া বসিয়া বসিয়া সে দাঁতন করিতে লাগিল। দূরে—যেদিক দিয়া বাজনার শব্দ আসিতেছে সেই দিকে, নজর করিয়া দেখিবার চেষ্টা করে। হাজরাতলায় সত্যই কি যেন একটা ব্যাপার হইতেছে, বোঝা গেল। ঢালিপাড়ার মেয়ে-পুরুষ বহু লোক বাঁধের উপর দিয়া ঐদিকে

যাইতেছে। মনে মনে হিসাব করিয়া দেখিল, চৈত্র-সংক্রান্তির অনেক দেরি, গাজনের বাজনা ইহা নয়।

নামিয়া সে চিন্তামণির খোঁজে গেল। খুঁজিতে খুঁজিতে দেউড়ি পার হইয়া নাটমণ্ডপের মধ্যে তাদের জন তিনেককে এক জায়গায় পাইল। কাঁধে লাঠি, চুপি চুপি কি বলাবলি করিতেছিল, কীর্তিনারায়ণকে দেখিয়া তারা চুপ করিল।

মুহূর্তকাল কীর্তিনারায়ণ নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিল। বসিবার জন্য কেহ না দিল একটা-কিছু আগাইয়া, না বলিল তাহার সঙ্গে কোন একটি কথা। ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে কীর্তিনারায়ণ বলিয়া উঠিল, কি হয়েছে বল তো ওস্তাদ-দাদা? মা কিচ্ছু বলে না, তোমরাও না—

চিন্তামণি ভারি গলায় বলিল, মামলা ডিসমিস হয়ে গেছে কর্তা ভাই।

গতরাত্রে খবরটা আসিয়াছে। এতক্ষণে উভয় তরফের সকলেই জানিতে পারিয়াছে। রায়ের মর্ম হইল, বরণডাঙার সৌদামিনী দেব্যা বউভাসি নামক একটা চক কিনিয়াছেন তাহা ঠিক, কিন্তু বিরোধীর জমি ঐ চকের এলাকাভুক্ত নয়। নরহরি চৌধুরির দখলি সম্পত্তি মিথ্যা করিয়া ঐ চকের মধ্যে পুরিয়া যোগসাজসে তাঁরা নিরীহ নির্দোষ ব্যক্তিকে হয়রানি করিতেছেন।

মামলায় হারিবার দুঃখ কীর্তিনারায়ণের বিশেষ উপলব্ধি হইল না, কিন্তু ওস্তাদের কণ্ঠে কান্নার আভাস তাহাকে আশ্চর্য করিয়া দিল। ব্যাপারটা ভালমতো না বুঝিয়া প্রশ্ন করিল, ডিসমিস হল কেন?

চৌধুরি আদালতে দাঁড়িয়ে ডাহা মিথ্যেকথা বলে এলেন বলে। ডাকাতি দাঙ্গাবাজি সে-ও যা হয় একরকম ছিল—বাঘা চৌধুরি বুড়ো বয়সে লাঠি-সড়কি ছেড়ে পুরোপুরি পাটোয়ারি হয়ে বসলেন এবার।

ঘৃণায় চিন্তামণির কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া আসে। বলিতে লাগিল, দেখ কি কর্তাভাই, মালাধর সেন আর নরহরি চৌধুরিতে কিছু তফাৎ নেই। গিন্নি-ঠাকরুন অত টাকা দিয়ে চক খরিদ করলেন, সব ভুয়ো হয়ে গেল। আগে ছিল, জোর যার মুল্লুক তার—এখন লোকে

জুয়াচুরি করে জমি চুরি করে, মিথ্যে দলিল বানিয়ে ধাপ্পা দেয়। ঝানু মানুষগুলোকে সনদ দিয়ে উকিল-মোক্তার বানিয়ে কোম্পানি বাহাদুর কসবায় বসিয়ে দিয়েছে। মিথ্যে বলবার জন্য তাদের ভাড়া করে লোকে মামলা চালায়।

ঢাক আবার জোরে বাজিয়া উঠিল। চিন্তামণি আর স্থির থাকতে পারে না। মণ্ডপ হইতে লাফাইয়া নামিয়া পড়িল।

বাজনা কিসের ওস্তাদ-দাদা ?

মামলায় জিতেছে, জাঁক করে তাই হাজরাতলায় পূজো দিচ্ছে। খুব ধুম-ধাড়াক্কা—তিন দিন ধরে খাওয়া দাওয়া চলবে, শুনতে পেলাম।

কীর্তিনারায়ণের মুখে ভাব-বিকৃতি ঘটিল না, সহজ ভাবে সে হাসিতে লাগিল। বলিল, খাওয়া-দাওয়ায় আমাদের তো কই নেমন্তন্ন করল না। করবে কেন—দিদির বিয়েয় মা ওঁদের করেন নি, সে কি ভুলে গেছেন চৌধুরী মশায় ?

অতিথিশালার সামনে অশ্বত্থতলায় চিন্তামণি আসিয়া দাঁড়াইল। ভক্ত বৈষ্ণব-সজ্জনেরা নয়—অনুগত লাঠিয়ালের দল এখন সেখানে থাকে। সকলে বাহির হইয়া আসিল।

খবর কি ওস্তাদ ?

খাচ্ছিস-দাচ্ছিস তোয়াজে রয়েছিস—খাজনা দিয়েছিস কখনো ? মালেকের মাল-খাজনা আদায় করতে এসেছি আজ।

এই খাজনা-আদায়ের অর্থ সবাই জানে। তারা আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। একজনে বলিল, এদ্দিনে এই তো প্রথম ডাকলে ওস্তাদ। আর কখনো কেউ আসে নি। ভুলে বসে আছি যে নিষ্কর লাখেরাজ খাচ্ছি নে—খাজনা দিতে হয়।

মালকোঁচা আঁটিয়া লাঠিহাতে মরদেরা একের পর এক বাহির হইয়া আসিল। কাঁচাসোনার মতো সকালবেলার রোদ মন্দিরের চবুতরায় আসিয়া পড়িয়াছে। মালতী চন্দন ঘসিতেছিল। বিয়ের পর বছর তিনেক স্বামীর ঘর করিয়া এখন সে বরণডাঙায় আসিয়া

আছে। স্বামীর ঘরে সুখী হইতে পারে নাই ; বাপের বাড়ি আসিয়া পূজা-অর্চনায় মাতিয়া আছে।

চমকিয়া উঠিল মালতী। এত লাঠি ? বিগ্রহের দিকে চাহিল। শ্যামঠাকুর প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাকাইয়া আছেন। বরণডাঙা লাঠি তুলিয়া এতকাল পরে আততায়ীর উপর শোধ লইতে চলিয়াছে—কষ্টিপাথরে খোদাই-করা ঠাকুরের অগ্নিদগ্ধ কালো মুখে বিদ্যুৎ খেলা করিতেছে যেন। অথবা তার নিজেরই হয়তো পরিবর্তন আসিয়াছে, চোখের দৃষ্টি বদলাইয়া গিয়াছে। নিজের দুঃখ ও অপমান এই বয়সে তার চিত্ত কঠিন করিয়া তুলিয়াছে। বেদীর উপর শ্যামসুন্দরের হাতে মোহন মুরলী ঠিকই রহিয়াছে—কিন্তু ঠাকুরের সামনে চোখ বুজিয়া মালতী ইদানীং যখন ধ্যানে বসে, তার মনের পটে চক্রধারী চতুর্ভুজের চিত্রটাই প্রখর হইয়া উঠে।

ঠাকুর-প্রণাম করিয়া চিন্তামণির দল ভিতর-উঠানে গেল। কোথায় ছিল কীর্তিনারায়ণ—ছুটিয়া ইহাদের মধ্যে আসিল। কিন্তু দাঁড়াইয়া থাকিতে দিল না চিন্তামণি—আড়কোলা করিয়া রোয়াকে যে একখানা জলচৌকি ছিল, তার উপর বসাইয়া দিল। হাঁক দিয়া উঠিল, মা-জননী কই গো ?

সৌদামিনী আসিলে বলিল, আশীর্বাদ নিতে এসেছি মা। এবার রওনা হব।

লাঠি উঁচাইয়া সকলে মাথা নোয়াইল। তারপর কীর্তিনারায়ণকে দেখাইয়া চিন্তামণি হাসিমুখে বলিল, কর্তাভাইকেও আমাদের সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি কাঁধের উপর তুলে নিয়ে।

মালতী বলিল, হাঙ্গামার মধ্যে ওকে আবার কেন ওস্তাদ-দাদা ?

নইলে দাঁড়িয়ে থেকে হুকুমটা কে দেবে শুনি ? হুকুম পেলে তখন দেখো এই বুড়ো হাড়ে ভেলকি খেলিয়ে দেব।

মালতী বলে, ওই একফোঁটা মানুষ—ও যাবে তোমাদের হুকুম দিতে। কি যে বল।

চিন্তামণি বলে, জাত-গোখরোর বাচ্চা দেখতে ছোট হলে কি হয়,

বিষ তার কম থাকে না। তুলতুলে গা-হাত-পা - তা বলে ভেব না, কর্তাভাই আমাদের তুলোর মানুষ। লাঠি নিয়ে দু-ভায়ে সেদিন একটুখানি পাল্লাপাল্লি হচ্ছিল, পালট মেরে ভাই আমার কাঁধের উপর এমন বাড়ি কষলেন যে চোখে তারা কাটল, মাথা ঝিম ঝিম করে উঠল, বসে পড়তে হল আমায়।

এই প্রসঙ্গ উঠিয়া পড়ায় কীর্তিনারায়ণ লজ্জায় মুখ নিচু করিল। এক নজরে সেদিকে চাহিয়া চিন্তামণি স্নেহকণ্ঠে মালতীকে প্রবোধ দিতে লাগিল, কোন ভয় নেই। কর্তাভাই খালের এপারে থাকবেন, এপার থেকে দুটো-একটা হাঁক ছাড়বেন, এইমাত্তোর। চেহারা দেখি না দেখি, গলার একটু আমেজ পেলেই হল। ঘোষকর্তা মশায়ের ছেলে, আমাদের অন্নদাতা দাঁড়িয়ে আদেশ করছেন—এতে বুকে কত জোর আসে, ভাবতে পারছ না দিদি। শুধু এতেই কেল্লা ফতে হয়ে যাবে।

সৌদামিনীর দিকে চাহিয়া হাসিয়া ফেলিয়া চিন্তামণি বলিল, মন খুঁত-খুঁত করে তো স্পষ্ট করে বল মা জননী। কাজ নেই—মনে মনেই আমরা কর্তা-ভাইয়ের মুখখানা ভেবে নেব।

চিঁড়া নারিকেল-সন্দেশ আর বাতাসা সৌদামিনী সকলের কোঁচড় ভরিয়া দিলেন। বসিয়া বসিয়া তারা খাইল। চিঁড়া খাইয়া ডাব খাইয়া পান-তামাক খাইয়া প্রহরখানেক বেলায় সকলে রওনা হইল। কিন্তু কীর্তিনারায়ণ তো সে অঞ্চলে নাই, কখন সরিয়া পড়িয়াছে। চিৎকার করিয়া সমস্ত বাড়ি তন্ন তন্ন করিয়া তাকে পাওয়া গেল না।

লাঠিয়ালদের কয়েক জন হাসিয়া কি বলাবলি করিতেছে। সৌদামিনীর মুখ রাঙা হইয়া গেল। চিন্তামণি ঘাড় নাড়িয়া বলে, না মা, যা ভাবছ কক্ষনো তা নয়। হতেই পারে না। কর্তামশাই যে বিদ্যেটুকু গচ্ছিত রেখে গেছেন, তার একটু-আধটু দেবার চেষ্টা করছি তো কর্তাভাইকে—ওঁর বুকের ভিতরটা অবধি আমি দেখতে পাই। তোমার পা ছুঁয়ে বলতে পারি মা, ভয়ে পালাবার ছেলে উনি নন। কি মতলব মাথায় এসেছে—কোথায় চলে গেলেন, এই যা একটু

ভাবনা। কিন্তু কর্তামশায়ের নাম কোন দিন মা খাটো হবে না কর্তাভায়ের হাতে—এ তোমরা নিশ্চিত জেনে রেখ।

এমন একটা রোমাঞ্চক ব্যাপার এতকাল পরে ঘটিতে যাইতেছে, আর কীর্তিনারায়ণ কি না খালের এপারে দর্শক হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিবে! এ প্রস্তাব মোটেই তার ভাল লাগে নাই। ঘাটে এক জেলে-ডিঙি ছিল, কারো অপেক্ষা না রাখিয়া আগে ভাগে সে পারে চলিয়া গেল। পারে গিয়া ভাবিতেছে, চিন্তামণির দলবল লইয়া পৌঁছিতে এখনো অনেক দেরি আছে, খাল বাহিয়া ডাকাতের বিলের দিকেই আগাইয়া যাওয়া যাক না। বিলে নৌকা-ডোঙা চালাইবার যে দাড়া পড়িয়াছে তার দু-ধারে পদ্মফুল আর পদ্মের চাক তুলিবার নেশায় তাহাকে পাইয়া বসিল।

আর একবার—তখন সে অনেক ছোট—এই বিলের মধ্যে এমনি পদ্ম তুলিতে গিয়া মারা পড়িবার দাখিল হইয়াছিল। ভানুচাঁদ আর সে সকলের অজান্তে চুরি করিয়া তালের ডোঙায় করিয়া আসিয়াছিল। এক জায়গায় অনেক পদ্ম দেখিয়া উৎসাহের বসে দু-জনেই একদিকে আসিয়া হাত বাড়ায়। জল উঠিয়া চক্ষের পলকে ডোঙা ডুবিল। ভানুচাঁদ কোন গতিকে টাল সামলাইয়া ডুবন্ত ডোঙায় রহিয়া গেল, কীর্তিনারায়ণ ছিটকাইয়া জলে পড়িল। জল নয়—জল ছিল বিঘৎখানেক মাত্র—জল থাকিলে তো ভাবনার কিছু ছিল না, সাঁতার দিয়া ভাসিয়া থাকা যাইত। বিপদ হইল জল না থাকার জন্য। পচাপাঁকের মধ্যে কীর্তিনারায়ণ আটকাইয়া গেল। যত ভাসিবার চেষ্টা করে, ততই আরও বেশি তলাইয়া যায়; হাঁটু হইতে ক্রমে কোমর অবধি ডুবিয়া গেল। রক্ষা, ভানুচাঁদ ইতিমধ্যে ডোঙার জল প্রাণপণে সেঁচিয়া ফেলিয়াছিল—অনেক টানাটানি করিয়া সে কীর্তিনারায়ণকে উদ্ধার করে।

এবারে ভানুচাঁদ নাই, সে একা। আপন মনে ফুল তুলিতেছে, আর সামনে যেখানটায় অনেক ফুল ফুটিয়া আছে লগি ঠেলিয়া সেদিকে আগাইতেছে। ডিঙির খোলে স্তূপীকৃত পদ্ম জমিয়া উঠিল।

এক সময় খেয়াল হইল, একেবারে নাককাটির খালের মাথায় আসিয়া পড়িয়াছে, অনতিদূরে চৌধুরিদের রান্নাবাড়ি। ভিতর-বাড়িতেই বা বিজয়োৎসবের বহরটা কি—একটু জানিয়া লইবার ইচ্ছা হইল। সুবিধা আছে—কসাড় হোগলা-বন, বাদামের ডাল জলের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে। ইহার ভিতরে ছোট্ট এই জেলে-ডিঙি কারও নজরে পড়িবার কথা নয়। এমন কি কূলে নামিয়া বাদামতলায় রান্নাঘরের ঘুলঘুলি দিয়া যদি এক নজর উকিঝুঁকিও দিয়া আসে, তাহা কেহ টের পাইবে না।

কিন্তু অদৃষ্ট মন্দ, টের পাইয়া গেল সুবর্ণলতা। সকাল হইতে সুবর্ণর মন ভাল নাই, মামলায় জয়লাভের খবর শুনিয়া অবধি জেঠাই-মার কথা মনে পড়িয়া বড় কষ্ট হইতেছে। আজিকার এই অপমানের পর তাঁর মুখভাব আন্দাজ করিবার চেষ্টা করিতেছে। কি করিতেছেন এখন তিনি? কীর্তিনারায়ণই বা কি করিতেছে? এখানকার এই পরিপূর্ণ সংসার ছাড়িয়া সেই যে চলিয়া গেলেন—তারপর তাঁরা কি রকম আছেন, ইহাদের কথা বলাবলি করেন কি না, এই সব জানিতে বড় ইচ্ছা করে। সুবর্ণ এখন বাহিরের ব্যাপারও বুঝিতে শিখিয়াছে। বড় রাগ হয় শ্যামকান্ত ও মালাধরের উপর। লাঠি শেখানোর উপলক্ষে নরহরিকে কাছাকাছি পাইয়াছিল, বড় ভাল লাগিত ঐ সময়টা। নরহরি একবারে শিশু হইয়া তার কাছে আসিতেন লাঠি-খেলার ব্যাপারে। কিন্তু মালাধর সেন আর তার দাদা চক্রান্ত করিয়া বাপকে তার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করিয়া অন্ধকার কুটিল পথে লইয়া চলিয়াছে। মামলা-মোকর্দমার তুমুল আয়োজনের মধ্যে লাঠি অবহেলিত হইয়া পড়িয়া আছে, নরহরিকে তাগাদা দিয়া দিয়া সুবর্ণ হয়রান হইয়া পড়িয়াছে। অভিমান করিয়া এখন আর কিছু বলে না।

হোগলাবন বিষম জোরে নড়িতেছে। হঠাৎ নজর পড়িয়া সুবর্ণলত চমকিয়া উঠিল। এত অগভীর জলে কুমীর আসিবার কথা নয় বাদামবনের ঘন পত্র-পুঞ্জের মধ্য দিয়া দৃষ্টি প্রাণপণে বিসারিত করিয় রহিল। রোদ ঢুকিবার ফাঁক নাই, দিন দুপুরেই রহস্যাচ্ছন্ন দুপুর-রাত্রি

বলিয়া মনে হয় নাককাটির খালের প্রান্তবর্ত্তী এই বাদামবনে গিয়া দাঁড়াইলে। সত্য-মিথ্যা যে সব কাহিনী ডাকাতের বিল ও এই খালের সম্পর্কে প্রচলিত, সমস্ত চকিতে সুবর্ণলতার মনের উপর দিয়া ভাসিয়া যায়। কে আসে—কবন্ধ ঘোড়-সওয়ার, শ্যামশরণ একদা যে অনুচরটির মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন অবাধ্যপনা করিয়াছিল বলিয়া? মুচে ভূত—খালের ধারে ধারে যারা নিচু হইয়া ভাগাড় হাতড়াইয়া বেড়ায়, মরা গরু-ছাগল কোথাও পড়িয়া আছে কিনা? কিম্বা সে আমলের ডাকাতের বিলের কোন ডাকাত-দল—যারা এখানে-ওখানে ঘাপটি মারিয়া থাকিত, সুযোগ বুঝিলে তে-রে-রে-রে করিয়া আসিত?

ভাল করিয়া দেখিবার জন্য সুবর্ণলতা নিচে নামিয়া গেল।

বড় জেদের মোকর্দমা, বিজয়োৎসবের আয়োজনও তাই অতি বিপুল। শ্যামগঞ্জ ছাড়াও পাশাপাশি দু-তিনটা গ্রামের ইতর-ভদ্র নিমন্ত্রিত হইয়াছে। কসবা হইতে শশিশেখরেরও আসিবার কথা। মালাধরের স্ফূর্তির অবধি নাই, চরকির মতো সে ঘর বাহির করিতেছে, সমস্ত উদ্যোগ-আয়োজনের ভার নিজে সে যাচিয়া কাঁধে লইয়াছে। শ্যামকান্ত যে ঘরে ওঠা-বসা করে, তার দরজা-জানালায় পর্দা ঝোলানো হইয়াছে, বিশিষ্ট অতিথিবর্গ বসিয়াছেন সেখানে। মাঝে মাঝে সেখান হইতে উচ্চ হাসির রোল উঠিতেছে।

এত বড় ব্যাপারের মধ্যে নরহরি চৌধুরি নাই। দোতলার অলিন্দে বসিয়া একাকী নিঃশব্দে গড়গড়া টানিতেছেন—এই উৎসবের নির্লিপ্ত নিরাসক্ত দর্শক-তিনি যেন।

শশিশেখর আসিয়া পৌঁছিতে নরহরির খোঁজ পড়িল; তাঁকে প্রণাম করিবে। নরহরি নিচে নামিয়া আসিলেন। নূতন করিয়া আবার মামলার আলোচনা উঠিল। তাঁর প্রশংসায় শশিশেখর পঞ্চমুখ—নরহরির ঐ রকম জোরালো সাক্ষ্যেই এমন আশ্চর্য ঘটনা সম্ভব হইয়াছে। মালাধরেরা পেশাদার সাক্ষি—হাকিম দু-এক

কথায় তাহা বুঝিতে পারেন। কিন্তু নরহরি সর্বপ্রথম এই আদালতের কাঠগড়ায় উঠিয়াছেন, প্রতিপক্ষের সামান্য মন্তব্যে চটিয়া আগুন হন—ইহাতে যে কেহ বুঝিতে পারে, তিনি নিতান্ত আনাড়ি এই ব্যাপারে। তাই সাক্ষ্যের প্রতিটি বর্ণ হাকিম বিশ্বাস করিয়াছেন। নহিলে বরণডাঙা দলিলপত্র যা দেখাইয়াছে --মামলা সঙ্গে সঙ্গে খতম হইয়া যাওয়ার কথা। নরহরির সাক্ষ্যের জোরেই সরেজমিন তদন্তের হুকুম হইল।

নরহরি বলিলেন, রঘুনাথ সর্দার আর ঐ ঢালিদের কথা কিন্তু ভুলে যেও না বাপু। বসতবাড়ি তুলে এনে কাছারি গড়ে দিল। আমি প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, পাকাপাকি রকমের ভালো ব্যবস্থা করে দিতে হবে ওদের।

আর প্রশংসা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল শ্যামকান্তর সম্পর্কে। তরুণ বয়সে আশ্চর্য তার বিষয়-বুদ্ধি। কৌশলে যেন রাত্রিকে একেবারে দিন বানাইয়া দিল। কসবার পদস্থদের কেমন অবলীলাক্রমে সে বাগাইয়া ফেলিয়াছে। এ যুগে শ্যামকান্ত হেন মানুষই দেখিতে দেখিতে সকলের উপর মাথা ছাড়াইয়া উঠে। মনিবের সম্পর্কে মালাধরও পরমোৎসাহিত। অসুবিধা অবশ্য আছে—বরিশালের মনিব চোখ মেলিয়া কিছু দেখিতেন না, শেষাশেষি হরিচরণ চাটুজ্জে কিছু গণ্ডগোল বাধাইয়াছিল এই মাত্র। সেই কণ্টকের উচ্ছেদ করিতে গিয়াই তো বউভাসির চক পুরানো মনিবের হাত ফসকাইয়া নানা টানা-পোড়েনের ভিতর দিয়া চৌধুরি-বাড়ি আসিয়া স্থিত হইয়াছে। এ মনিবের কাছে এক তিল ফাঁকি চলিবার উপায় নাই—ক্ষুরধার বুদ্ধি, চোখে কিছু না দেখিয়াও সমস্ত ধরিয়া ফেলে। তবে সুখের বিষয়, নিতান্ত অসম্ভব রকমের না হইলে মালাধরের উপরি পাওনা-গণ্ডায় তার কোন আপত্তি নাই। সেরেস্তার উপর হাত না পড়িলেই হইল—প্রজাদের নিকট হইতে যতদূর পার আদায়-উশুল করিয়া খাও। সাহস আছে, চতুরতা আছে—কাজ হাসিল করিবার জন্য ন্যায়-অন্যায় কোন পন্থায় আপত্তি নাই। ফাঁকিবাজি না চলুক—

এই মনিবের ফাই-ফরমায়েস খাটিয়া এবং ইহাকে পরামর্শ দিয়া সুখ পাওয়া যায়।

দুই-চারিটা কথা বলিয়া ভদ্রতা রক্ষা করিয়া নরহরি আবার উপরে উঠিয়া গিয়াছেন। ইহাদের চোখের আড়াল হইয়া যেন তিনি রক্ষা পাইলেন। যতক্ষণ ছিলেন, লজ্জায় ক্ষণে ক্ষণে বিচলিত হইয়া উঠিতেছিলেন। সাক্ষ্য দিয়া আসিবার পর মনে কেমন আচ্ছন্ন ভাব আসিয়াছে। তিনি উহাদের কেহ নন, উহাদের সঙ্গে কোনদিন তিনি মিলিতে পারিবেন না, ঐ দলে মিশিতে গিয়া নিজের অবমাননা ঘটাইয়াছেন—এমনি এক অনুশোচনা অহরহ তাঁকে বিদ্ধ করিতেছে।

মেঘ করিয়াছে। মেঘের আবরণে রোদ স্পষ্ট হইয়া ফুটে নাই। অন্যমনস্ক ভাবে নরহরি মুক্ত অলিন্দে ঘুরিয়া-ঘুরিয়া দেখিতেছেন। মাঝে মাঝে মেঘমুক্ত এক ঝলক রোদ পড়িয়া রূপার পাতের মতো মালঞ্চের সুবিস্তৃত জলধারা ঝিকমিক করিয়া উঠিতেছে। চিতলমারি খালের দিকে চাহিয়া নরহরি স্তব্ধ হইয়া দাঁড়াইলেন। মোহনার প্রান্ত হইতে চর দীর্ঘতর হইয়া খালের ভিতর অনেক দূর অবধি পরিব্যাপ্ত হইয়াছে, চিতলমারি মজিয়া আসিতেছে। আয়নার সামনে দাঁড়াইয়া নিজের দিকে একবার চাহিলেন। কপালের দু-দিক দিয়া টাক মস্তিষ্ক অবধি অগ্রসর হইয়াছে, সমস্ত মুখে বলিরেখা অবোধ্য অক্ষরে জীবনের কত কি বিচিত্র কথা যেন লিখিয়া দিয়াছে। তাঁদের দিন বিগত হইয়া আসিল। একদা মালঞ্চের উপর কোলাকুলি করিয়া যাহাদের বন্ধুত্ব মনে প্রাণে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, তারা আজ পরম শত্রু। কিন্তু মনিব সাজিয়া যে বাড়িতে তিনি বর্তমান আছেন, তাদের সঙ্গেই বা তাঁর সংযোগ ও হৃদ্যতা কতটুকু?

সুবর্ণলতা ছুটিয়া আসিল।

বাবা! বাবা!

হাঁপাইতেছে। একটু সামলাইয়া লইয়া বলিল কে এসেছে দেখে যাও বাবা—

কে?

তার আগেই কীর্তিনারায়ণ উঠিয়া আসিল। নরহরির মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হইয়া উঠে।

এস বাবা, এস—

কি অদ্ভুত কঠোরতা কিশোর কচি মুখখানার উপর। নরহরি বলিলেন বোসো—

তেজি ঘোড়ার মতো ঘাড় বাঁকাইয়া কীর্তিনারায়ণ দাঁড়াইয়া রহিল। বলিল, নেমন্তন্ন খেতে আসি নি চৌধুরি মশায়। আপনাদের নেমন্তন্ন করতে এসেছি।

নরহরি চমকিয়া চাহিলেন। বউভাসির চকের দিক দিয়া ধোঁয়ার কুণ্ডলী আর মাঝে মাঝে অগ্নিশিখা দেখা যাইতেছে। কীর্তিনারায়ণ হাসিয়া উঠিয়া বলিল, আমাদের লোকজন পৌঁছে গেছে তা হলে। চুরি করে রাতারাতি যে কাছারিঘর বেঁধেছিলেন দিনের বেলা সকলের মুকাবেলা ঐ দেখুন তা পোড়ানো হচ্ছে।

নরহরি কীর্তিনারায়ণের দিকে ভ্রূকুটি করিলেন।

বিশ্বাস করি না। আবার একনজর অগ্নিকাণ্ডের অভিমুখে চাহিয়া ব্যঙ্গের সুরে তিনি বলিলেন, বরণডাঙার দল খোলে হরেকৃষ্ট আওয়াজ তুলতে পারে—এই তো জানি। সেই হাতে ঘরে আগুন দিচ্ছে, এ আমার কিছুতে বিশ্বাস হয় না বাবা। আগে টের পেলে জায়গায় গিয়ে দেখে আসতাম, সত্যি হলে ঘোষগিন্নির উদ্দেশে নমস্কার করে আসতাম খেয়াঘাটে দাঁড়িয়ে।

কীর্তিনারায়ণ বলে, দেখবার অনেক আছে এখনো। একলা নয়—ঢালিদের সঙ্গে নিয়ে দল বেঁধে দু-চোখ ভরে দেখুন গে। বউভাসির চকের বাঁধ কাটবে এইবার আমাদের লোকেরা। জোয়ারের জন্য দেরি করছে, কোদাল হাতে বাঁধের উপর দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে।

স্তম্ভিত নরহরি বলিলেন, বাঁধ কেটে চক ভাসিয়ে দেবে আর অত ক্ষতি-লোকসান চোখ মেলে শুধুই আমরা দেখে আসব, এই মনে করেছ নাকি?

কীর্তিনারায়ণ বলিল, ক্ষতি-লোকসান অনেক হবে, তা ঠিক।

কিন্তু ধান রোয়ার মুখেই এই ব্যাপার, কাটবার সময়ও না জানি আরও কত নতুন নতুন উৎপাত আমদানি করবেন। ভেবে চিন্তে এবারের মতো তাই চক ভাসিয়ে দেওয়া সাব্যস্ত করা গেল। আপনার ঢালিরা গিয়া গায়ে দু-একটা আঁচড় দিয়ে আসতে পারে, কিন্তু কি করা যাবে—আমরাও তো চোখ বুঁজে ভূতের নৃত্য দেখতে পারি নে।

এমন ভঙ্গিতে কথা বলিতেছে যেন সে নরহরিরই প্রায় একবয়সি সমান প্রতিপক্ষ। রাগের চেয়ে কৌতুকই বেশি লাগিতেছে নরহরির। বলিলেন, চকটা কি তোমাদের?

আপনি কি জানেন না চৌধুরি মশায়?

আমি জানলে হবে কি? আদালত কি বলেছে?

আপনারা যেমন বলে এসেছেন, সেই সব শুনেই তো আদালতের বলা। আদালত যা খুশি বলুক গে, আমাদের যা বলবার বাঁধের উপর দশগ্রামের মানুষের সামনে দাঁড়িয়ে বলে যাব। নেমন্তন্ন করে যাচ্ছি, উৎসবের হৈ-চৈর মধ্যে ঠিক সময়ে পাছে খবরটা না পৌঁছয়।

বলিয়া চলিয়া যাইতেছিল, কিন্তু তার আগেই নরহরি বাহির হইয়া দরজায় শিকল তুলিয়া দিলেন।

কীর্তিনারায়ণ দরজায় লাথি দিয়া বলিল, কায়দায় পেয়ে আটকালেন?

নরহরি বাহির হইতে বলিলেন, পুরানো অভ্যাস বাবা। তোমার বাপকে আটকে রেখেছিলাম, শোন নি?

কেমন এক ধরনের হাসি হাসিয়া পুনশ্চ বলিলেন, দলিল-দস্তাবেজ জাল করে হলপ পড়ে মিথ্যে বলে এসে যারা ডঙ্কা মেরে বেড়াচ্ছে, তাদের গহ্বরে পা দিতে এলে তুমি কোন বিবেচনায়?

মুখে আসিয়া পড়িয়াছিল—বাঘের গহ্বরে। কথাটা ব্যঙ্গের মতো শোনাইবে বলিয়া নরহরি সামলাইয়া লইলেন।

সুবর্ণকে নরহরি চুপিচুপি বললেন, বাঁধে চললাম। দরজা খুলে

দিস না কিন্তু খবরদার! লাঠির আগে মাথা বাড়িয়ে দেবে ও ছেলে—মারা পড়বে।

সুবর্ণলতা কোন সময়ে নামিয়া গিয়া ডিঙা হইতে একরাশ পদ্ম লইয়া আসিয়াছে, অলিন্দে বসিয়া তাহারই মালা গাঁথিতেছিল। সে ঘাড় নাড়িল।

কাছারিঘর জ্বালাইয়া দিয়া চিন্তামণির দল খাল-ধারে বাবলা-ছায়ায় বসিয়া বসিয়া তামাক খাইতেছে। কোদালিরা বাঁধের উপর। সেখানে গাছপালা নাই—রোদ আজ প্রখর নয়, তাই রক্ষা। জোয়ার আসিয়া গেল, ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছে চিন্তামণিরা। ক্ষণে ক্ষণে তারা হুকার ছাড়িতেছে। ছোকরাদের মধ্যে বেশি উৎসাহী কয়েক জন বারম্বার উঠিয়া একরাশি দু-রাশি আগাইয়া উঁকিঝুঁকি দিয়া দেখিতেছে। কিন্তু শ্যামগঞ্জের জনপ্রাণী কেহ এখনো নজরে পড়িল না।

পুরাণে সেকালের যুদ্ধ-কাহিনী পড়িয়া একটা ছবি চোখের সামনে ফুটিয়া ওঠে। সামনাসামনি উভয়পক্ষের শিবির—অন্তঃপুরিকারাও সঙ্গে আসিয়াছেন, পিছনের অন্দর-অংশে যথারীতি তাঁদের বাটনা-বাটা কুটনা-কোটা ইত্যাদি চলিতেছে। সকালবেলা যুদ্ধ-যাত্রার মুখে বীরবৃন্দের পঞ্চব্যঞ্জন সহযোগে আহার-বর্ণনা কোথাও অবশ্য পড়ি নাই; তাহা হইলেও অনুমান করা যায়, মেয়েরা কখনও স্বামীপুত্রকে বাসিমুখে মহাহবে ছাড়িয়া দিতেন না। সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ-ক্ষান্তি ঘোষণা হইলে দেখা গেল, শত্রু-মিত্র পরস্পারের শিবিরে যাতায়াত করিতেছে। কতকটা পাশাখেলা অথবা আদালতে দু পক্ষের উকিলদের মামলা লড়িবার মতো। অনুষ্ঠানটা যতক্ষণ চলিতেছে, আক্রমণ প্রত্যাক্রমণ ততক্ষণই; তার পরেই মন থেকে ও-সমস্ত একেবারেই ধুইয়া মুছিয়া গেল। সম্মুখসমর—ছল চাতুরীর ব্যাপার একেবারেই ইহাতে চলে না। এরকম যুদ্ধে মরিলে অক্ষয় স্বর্গবাসের ব্যবস্থা পাকা হইয়া যায়।

সে যুগের সেই মনোভাব অতিক্রম করিয়া এই লাঠিয়েলারাও বেশি দূর আগাইতে পারে নাই। দেখ না—বাঁধ কাটিবে বলিয়া

দলবল সহ সেই কখন হইতে প্রতীক্ষা করিতেছে। তিন-চার ছিলিম তামাক পুড়িল—বিনা কাজে কতক্ষণ এমনভাবে বসে থাকা চলে। কিন্তু প্রতিপক্ষ না আসিয়া পৌঁছানো পর্যন্ত বাঁধের উপর কোদালের একটা কোপ দিবার উপায় নাই। নরহরি চৌধুরির লোক হইলে এতক্ষণ নিশ্চয় চুপ করিয়া থাকিত না। কিন্তু ডাকাত আর লাঠিয়ালে তফাত রহিয়াছে যে! শিবনারায়ণের শিষ্য-প্রশিষ্যের মধ্যে কেউ গোপনে কিছু করলে গুরু-দত্ত বিদ্যার অপমান হইবে। কাছারি জ্বালাইয়া এবং ঘন ঘন জকার দিয়া প্রতিপক্ষকে তারা তাই এমন করিয়া বারম্বার আহ্বান জানাইতেছে।

আসিতেছে এতক্ষণে, অবশেষে আসিয়া পৌঁছিল। বাঁধের পথে নয়—জলপথে, খালের উপর দিয়া। প্রবল জোয়ারের বেগে পাঁচখানা বড় ডিঙি চকের বাঁধের গায়ে লাগিতে না লাগিতে ঢালিরা হৈ-হৈ করিয়া নরম কাদায় লাফাইয়া পড়িল। চিন্তামণির দলও লাঠি উঁচাইয়া বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়াছে। ঝপ্‌পাস করিয়া বাঁধে একসঙ্গে দশখানা কোদাল পড়িল। এই সময় রোদ ফুটিল, উদ্যত বল্লমের ফলায় রোদ পড়িয়া ঝকমক করিয়া উঠিল। তীরের মতো ঘোড়া ছুটাইয়া নরহরি চৌধুরি ওদিক দিয়া আসিয়া পড়িলেন। অনেকদিন পরে আজ আবার রক্ত টগবগ করিয়া ফুটিতেছে। বুড়া হইয়াছেন, এবং এক চিন্তামণি ছাড়া লাঠি-সড়কিতে জেলার মধ্যে তাঁর জুড়ি নাই। কিন্তু যৌবনের গতিবিধি নিগূঢ় অন্ধকার পথে চলিয়াছিল, উন্মুক্ত আলোয় প্রকাশ্য সংগ্রামের এই অভিজ্ঞতা তাঁর পক্ষে নূতন বলিলেই হয়। শিবনারায়ণের সঙ্গে বন্ধুত্ব হইলে বড় আশা হইয়াছিল, এই বিষয়ে নব দীক্ষা লইবেন—দুই বন্ধু কাঁধে কাঁধ মিলাইয়া সারা অঞ্চল তোলপাড় করিয়া তুলিবেন। কিন্তু শিবনারায়ণের তখন মত ঘুরিয়া গেছে। এতকাল পরে চিরদিনের মতো চোখ বুঁজিবার আগে বোধকরি আজ এই একটি দিনের জন্য—বন্ধু এখন আর নয়—শত্রু-পক্ষের মুখোমুখি দাঁড়াইবার সুযোগ হইল। পাশাপাশি দাঁড়াইবার আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন, শেষ অবধি মুখোমুখি দাঁড়াইতে হইল।

শ্যামগঞ্জের তুলনায় বরণডাঙ্গার দল সংখ্যায় নগণ্য। কিন্তু কোদালিদের আগলাইয়া চিন্তামণি ও তার সাকরেদরা লোহার প্রাচীরের মতো দাঁড়াইয়াছে। ইহার সামনে শ্যামগঞ্জের ঢালিরা থমকিয়া দাঁড়াইল। ঝপাঝপ কোদাল পড়িতেছে, খালের জল চকে ঢুকিবার একটুকু পথ পাইয়া গেলে রক্ষা থাকিবে না। নরহরি গর্জন করিয়া উঠিলেন, রঘুনাথ সর্দার!

রঘুনাথ পিছন ফিরিয়া তাঁর দিকে চাহিল। সে মুখে কি দেখিতে পাইল সে-ই জানে—ইহাদের প্রথা মতো লাঠি উঁচাইয়া সম্ভাষণ করিল ওস্তাদ চিন্তামণিকে। চিন্তামণিও প্রত্যুত্তর দিল। তারপর বাঘের মতো দু-পক্ষ পরস্পরের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িল। চিন্তামণির হাতের লাঠি দুই খণ্ড হইয়া গেল। অনেক কালের অব্যবহার—ঘুন ধরিয়া গিয়াছিল বোধ হয়। লাঠির টুকরা চিতলমারির স্রোতে মুহূর্তমধ্যে অদৃশ্য হইল। ক্ষতবিক্ষত চিন্তামণিও ঝোঁক সামলাইতে পারিল না, জলে পড়িল।

আহা-হা!

হাতের বল্লম ফেলিয়া দিয়া রঘুনাথ ওস্তাদকে ধরিতে গেল। বরণডাঙার লোক ইতিমধ্যে এদিকটা একেবারে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে, রঘুনাথেরই বল্লম কে-একজন ছুঁড়িয়া মারিল। ফলার অর্ধেকখানি হাঁটুর নিচে গেল বিঁধিয়া। রক্তচক্ষে তীরবর্তী মানুষগুলার দিকে চাহিয়া রঘুনাথ বল্লম টানিয়া উপড়াইল। ফিনকি দিয়া রক্ত ছুটিয়াছে। তীব্র স্রোতে চিন্তামণির অসাড় দেহ পাক খাইয়া ডুবিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। রঘুনাথ সাঁতরাইয়া ধরিবার চেষ্টা করিল, কিন্তু ক্ষমতা নাই। যন্ত্রণা-বিকৃত মুখে অবশেষে খালের ধারে জলকাদার উপর সে বসিয়া পড়িল।

লাঠির টুকরার সঙ্গে চিন্তামণিও কোন দিকে ভাসিয়া গিয়াছে। বরণডাঙার দশ-বারোজন খালের জল তোলপাড় করিয়া তার খোঁজ করিতেছে। নরহরি চিৎকার করিয়া উঠিলেন, আটকাও ওদের—একটা প্রাণী ও-পারে ফিরে যেতে না পারে!

কিন্তু কণ্ঠস্বরে নিজেরই লজ্জা হইল। গলার জোর নাই। ঢালিরা হতভম্ব হইয়া তাঁর দিকে তাকাইয়া আছে। ঝাঁপ দিয়া পড়িয়া বিরুদ্ধ-দলের লাঠিয়ালদের ধরিয়া ফেলিবার উৎসাহ নাই কারও। নরহরির কণ্ঠে যেন ভাঙা-কাঁসরের আওয়াজ বাহির হইতেছে—আগেকার গাম্ভীর্য, লোকের মনে ত্রাস জাগাইবার সে সামর্থ্য আর নাই। বউভাসির চকের ভিতর কলকল্লোলে জোয়ারের লোনা জল ঢুকিতেছে। বাঁধের উপর যে নালা কাটিয়া দিয়াছে ভাঙিয়া চুরিয়া দেখিতে দেখিতে তাহা সুপ্রশস্ত হইয়া গেল। নরহরি দেখিতে লাগিলেন।

অনেকক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর একজনের নজরে পড়িল, দুই বাঁক দূরে কেয়াঝাড়ের শিকড়ের জালে চিন্তামণি আটকাইয়া আছে। সন্তর্পণে শবদেহ তুলিয়া ধরিয়া সাঁতার কাটিয়া সাকরেদরা বরণডাঙার পারে নামাইল। চক্ষু মুদ্রিত, ক্লান্ত বৃদ্ধ যেন ঘুমাইয়া আছে। দু-চোখের দৃষ্টি বিস্ফারিত করিয়া নরহরি এপার হইতে দেখিতে লাগিলেন।

আর সেই সময় শ্যামগঞ্জের পাষাণ কক্ষের ভিতর কীর্তিনারায়ণ ছটফট করিতেছে। শত্রুপক্ষের সঙ্গে প্রথম লড়াইয়ের মুখেই নিজের বোকামির জন্য সে বন্দী হইয়া রহিল—দাঁড়াইয়া থাকিয়া চোখে দেখিবার যে ব্যবস্থা চিন্তামণি করিয়াছিল, তারও সুযোগ হইল না। নরহরি ফিরিয়া আসিয়া দরজা খুলিলেন, তখন দুপুর গড়াইয়া গিয়াছে। দাঙ্গার বৃত্তান্ত ছড়াইয়া পড়িয়াছে, উৎসব-কোলাহল স্তব্ধ হইয়াছে। কীর্তিনারায়ণ কিছু জানে না। বাহিরে আসিয়া দেখিল, তার জন্য স্নানের জল তুলিয়া রাখিয়াছে—সুবর্ণলতা তাড়াতাড়ি তেল-গামছা আগাইয়া আনিল। সে দাঁড়াইল না, ধাক্কা দিয়া সুবর্ণকে সরাইয়া দিয় দ্রুতপায়ে চলিয়া গেল।

আবার নূতন মামলা দায়ের হইল—ফৌজদারি। দাঙ্গা ও খুন-জখমের ব্যাপার—সরকার-পক্ষ বাদী এবার। অনেক তদ্বির হইল, জলের মতো অর্থব্যয় হইল। বোধকরি তারই ফলে আসামীদের তেমন গুরুতর দণ্ড হইল না—তিন মাস হইতে তিন বৎসর অবধি জেল।

নরহরিরই কেবল সাত বৎসর। ক'জনে ছাড়াও পাইয়া গেল। খোঁড়া পা লইয়া মনিবের পিছু পিছু রঘুনাথ জেলে ঢুকিল। বাঘা চৌধুরিকে জেলে পুরিবে, এ অঞ্চলের কেউ কোনদিন ইহা স্বপ্নেও ভাবিতে পারে নাই।

তৃতীয় অধ্যায়

(১)

আবার একদিন নরহরি জেলের বাহিরে আসিলেন। শ্যামকান্ত ও শশিশেখর ফটকে অপেক্ষা করিতেছিল। বিশীর্ণ চেহারা, অন্ধকার মুখ, চলিতে গিয়া পা টলে—কে বলিবে, এই বাঘা চৌধুরির নামে একদা মালঞ্চের তীরবর্তী অঞ্চল সন্ত্রস্ত থাকিত।

শশিশেখরের খুব পশার বাড়িয়াছে ইতিমধ্যে কসবার মধ্যে এখন সে বড় উকিল। নিজের বাড়ি তৈয়ারি হইতেছে। আর একটা বড় আনন্দের সংবাদ নরহরিকে দিল—যা লইয়া এত বিরোধ, সেই বউভাসির চক এখন পুরোপুরি শ্যামগঞ্জের কবলে। বাকি খাজনার দায়ে নিলাম হইয়াছিল, নিলাম খরিদ করিয়া চৌধুরি তরফ এখন নির্ব্যূঢ় স্বত্বে ষোল আনার দখলিকার। কি কৌশলে যে ইহা সম্ভব হইল, ইহার মধ্যে মালাধর শশিশেখর আর শ্যামকান্ত কার কতখানি হাত আছে, তার বিস্তারিত আলোচনা এ জায়গায় চলিতে পারে না—এত অল্প সময়ে সম্ভবও নয়। তবে আর একটা ব্যাপার প্রত্যক্ষ হইয়াছে—নিলাম হইয়া যাওয়ার সময় ঘোষ-গিন্নি এত জেদাজেদির সম্পত্তি ঠেকাইবার জন্য নিলাম-রদের চেষ্টা মাত্র করেন নাই। হয়তো এখন বুঝিতে পারিয়াছেন, একা স্ত্রীলোক গণ্ডমূর্খ লাঠিবাজ এক ছেলের ভরসা করিয়া এত বড় প্রতিপক্ষের সঙ্গে টক্কর দিয়া সম্পত্তি রক্ষা করিতে পারিবেন না, শুধু অর্থব্যয়ই সার হইবে। আর বখরার সময় শিবনারায়ণ টাকাকড়ি যা পাইয়াছিলেন, তা-ও নিশ্চয় ফুরাইয়া আসিল এতদিনে। ঘোষ-গিন্নির তাই সুমতি হইয়াছে, নিলামের পর আর উচ্চবাচ্য করেন নাই।

শশিশেখরের বাড়িতে তাঁকে কিছুতে লওয়া গেল না—শহরের লোকজনের দৃষ্টির আড়ালে গ্রামে ফিরিতে পারিলে নরহরি যেন বাঁচিয়া যান। তিলার্ধ কোথাও বিশ্রাম করিলেন না, সোজা নদীর ঘাটে আসিয়া নৌকায় চড়িয়া বসিলেন।

বাড়ির সামনে দাঁড়াইয়া নরহরি চিনিতে পারেন না, বছর সাতেকের মধ্যে এমন পরিবর্তন! সে আমলের সদর-বাড়ি এখন পিছনে পড়িয়াছে, বাড়ির মুখ অন্যদিকে। নাককাটির খালের পাশ দিয়া নূতন এক পাকা-রাস্তা মালঞ্চের খেয়াঘাটে গিয়াছে, নদীর ওপার হইতে সেই রাস্তা চলিয়া গিয়াছে একেবারে কসবা অবধি। রান্নাবাড়ি ভাঙিয়া দিয়া বাদামবন কাটিয়া পাকা-রাস্তার ধারে সদর হইয়াছে এখন। হাল আমলের হালকা দালান-কোঠা উঠিয়াছে—নূতন পাঁজার পুরু ইটে গাঁথা পাতলা দেয়াল। একদিকের দু-তিনটা কামরা শ্যামকান্তর অফিস ও খাস-কামরা—চেয়ার টেবিল শৌখিন দেয়ালগিরি আর টানা-পাখায় কেতাদুরস্ত ভাবে সাজানো। অপর দিককার ঘরগুলায় জমিদারি সেরেস্তা। সেখানে সাবেক রীতিতে ফরাসের উপর হাতবাক্স সামনে লইয়া আমলারা কাজকর্ম করিতেছে বটে, তবে কাছারি সকাল-বিকাল না হইয়া দশটা-পাঁচটায় বসিয়া থাকে। মালাধরই সর্বেসর্বা। কিন্তু গা এলাইয়া কাজ করিবার দিন আর নাই। যতক্ষণ অফিস চলে, নিশ্বাস ফেলিবার ফুরসৎ কারও হয় না। খুব করিৎকর্মা লোক শ্যামকান্ত; এত প্রজাপাটক বিষয়-সম্পত্তি—ইতিমধ্যেই সমস্ত একেবারেই যেন মুঠোয় পুরিয়া ফেলিয়াছে।

বাড়ি আসিয়া অবধি নরহরি মোটে সোয়াস্তি পাইতেছেন না। মনে হইতেছে, কোন জায়গা হইতে একদিন বিদায় লইয়াছিলেন—আর এ কোথায় ফিরিয়া আসিলেন? নিজের বাড়ি জেলের বেশি হইয়া উঠিয়াছে তাঁর পক্ষে। ঘড়ি-ধরা কাজকর্ম-নাওয়া-খাওয়া-শোওয়া—একটু দেরী হইলে সরস্বতী আসিয়া দাঁড়াইয়া থাকে।

মুখে কিছু বলে না, দাঁড়াইয়া মিটিমিটি হাসে—নরহরি উহাতে বিষম অতিষ্ঠ হইয়া উঠেন। সরস্বতী ইতিমধ্যে পুরাদস্তুর গৃহিণী হইয়া পড়িয়াছে এ বাড়ির, বয়সের তুলনায় ভারিক্কি হইয়াছে। একটি মেয়ে হইয়াছে, মা হইয়া গৌরব আর অহঙ্কারে যেন সে ফাটিয়া পড়িতেছে। ঠিক ঐ শিশু মেয়েটির মতোই নরহরিকে সে ভাবিতে চায়, তেমনই তাঁর খবরদারি করিয়া বেড়ায়। নরহরির ধরন-ধারণ ও কথাবার্তা কচি ছেলের মতো মূল্যহীন জানিয়াই সে প্রশ্রয় দিয়া থাকে।

আর মুশকিল সুবর্ণলতার। নরহরি ফিরিয়া না আসা পর্যন্ত বাড়ির মধ্যে সে একরূপ একা হইয়াছিল। সরস্বতী গৃহস্থালিতে মাতিয়া উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে সখিত্বের বন্ধন ছিঁড়িয়া গেল তার আর সুবর্ণলতার মধ্যে। নরহরি লাঠি শিখাইতেন—রঘুনাথ ছাড়া পাইয়া আসিয়া মনিবের সেই কাজের ভার লইল। রোজ বিকালে আসিয়া লাঠি শেখায়। শ্যামকান্ত আপত্তি করে নাই, সুবর্ণলতার সম্পর্কে নরহরির যেরূপ অভিপ্রায়, তার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার সে ভরসা পায় না। প্রয়োজনও বোধ করে না। হাতে খড়ি নয়—হাতে লাঠি লইয়া এই নরহরিদের শিক্ষা শুরু হইয়াছিল। শ্যামকান্তর বিষয়ে নরহরি নিজের মতলব খাটাইতে পারেন নাই—কতকটা ঐ সময়ে নৌকাবক্ষে খালে বিলে ঘোরাঘুরি করিতে হইত বলিয়া আর কতকটা শিবনারায়ণের প্রভাবে পড়িয়া। মেয়ের বেলা ঐ সব অসুবিধা আর ছিল না।

জেলার বিশিষ্ট লোক বলিয়া জেলের মধ্যে নরহরি খাতির পাইতেন। প্রচুর অবসর ছিল—সেই সময় বসিয়া বসিয়া এক মহাভারতের পুঁথি নকল করিয়াছেন। নিজের রচনাও কিছু কিছু আছে তার ভিতর। তুলট কাগজে গোটা গোটা পরিচ্ছন্ন অক্ষরে লেখা—পাতার উপর পাতা জমিয়া পুঁথি বিপুলায়তন হইয়াছে। উপরে ও নীচে মলাটের মতো পাতলা চন্দনকাঠের পাটা—পাটা দু-খানিতে দুটি ছবি আঁকা—সপ্তরথীর অন্যায়-সমরে অভিমন্যু-বধ আর

দুর্গম পার্বত্য পথে পাণ্ডবদের মহাপ্রস্থান। প্রতি সন্ধ্যায় পুঁথিপাঠের পর নরহরি প্রণাম করিয়া সযত্নে পুঁথি রেশমি সুতোয় জড়াইয়া তুলিয়া রাখিয়া দেন।

অপরাহ্ণে বসিয়া বসিয়া তিনি সুবর্ণলতার লাঠিখেলা দেখিতেছিলেন। খোঁড়া রঘুনাথ, সে লড়িতে পারে না—কেবলমাত্র কায়দাটা দেখাইয়া দেয় আর মুখে মুখে নির্দেশ দান করে। খেলা করে যমুনা আর সুবর্ণলতা। দেখিয়া দেখিয়া নরহরির কৌতুক লাগে; মনের গ্লানি মুছিয়া যায়। এতক্ষণে শ্যামগঞ্জের ভিতর একটুখানি যেন নিজের জায়গা খুঁজিয়া পান। খেলার পরই সন্ধ্যার আগে অন্যান্য দিন রঘুনাথ যমুনার হাত ধরিয়া ঢালিপাড়ায় চলিয়া যায়। সেই যে ঘর ভাঙিয়া বউভাসির কাছারি গড়িয়া দিয়াছিল, সে ঘর অদ্যাপি বাঁধিয়া দেওয়া হয় নাই। রঘুনাথ শ্যামকান্তকে কিছু বলেও নাই এ সম্বন্ধে। বাপে মেয়ে ক-বছর ধরিয়া খুড়তুতো ভাই ত্রিলোচনের বাড়ি আছে।

আজ খেলার পর তারা চলিয়া যাইতে পারিল না, নরহরি সকলকে লইয়া মহাকালীর মন্দিরে আরতি দেখিতে গেলেন। দীর্ঘ ঘাস জমিয়াছে উঠানে; তাহার মধ্য দিয়া সরু একপেয়ে পথ সিঁড়ি অবধি গিয়াছে। আমের ডাল ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে মন্দিরের চূড়ার উপর; ডাল হইতে গুলঞ্চলতা নামিয়া আসিয়াছে। হতশ্রী চেহারা। দেখিয়া বুঝিতে পারা যায়, মানুষজন এদিকে বড় একটা আসে না—সেরেস্তার ব্যবস্থা মতো পুরোহিত আসিয়া কোনরকমে পূজার নিয়ম-রক্ষা করিয়া যান।

তারপর নিজের কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া নরহরি রেড়ির তেলের দীপের সামনে তাঁর সেই হাতে-লেখা পুঁথি পড়িতে লাগিলেন। রঘুনাথ অন্ধকার কোণটায় দু-হাঁটুর মধ্যে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া থাকে, সে ইহাতে কোন রস পায় না, অস্পষ্ট আলোয় তার অচঞ্চল দেহ-ছায়া প্রাচীন যুগের বিলুপ্তাবশেষ অতিকায় কঙ্কালের মতো দেখায়।

অম্বুবাচী লাগিয়াছে, নরহরির খেয়াল ছিল না। দৈবাৎ জানিতে পারিলেন। কি কাজে কাছারি-ঘরের দিক দিয়া যাইতেছিলেন,

বারান্দায় চাষী-প্রজাদের ভিড়। সেরেস্তা ছাড়িয়া মালাধর বাহির হইয়া আসিয়াছিল। তাকে ঘিরিয়া প্রজারা বলিতেছিল, অম্বুবাচীতে চাষ বন্ধ—তাই এত লোক তারা একত্র হইয়া আসিতে পারিয়াছে; মালাধর আজকেই যেন দয়া করিয়া হুজুর হাজির হইবার ব্যবস্থা করিয়া দেন। দয়াটা যে নিতান্ত অহৈতুকী হইবে না, মালাধরের চাপা কথাবার্তার মধ্যে তাহা বেশ প্রকট হইতেছে।

লোনা লাগিয়া গত বৎসর ফসল হয় নাই, লোকগুলা কিছু পরিমাণ খাজনা মকুবের দরবারে আসিয়াছে। নরহরি উদাসীন তৃতীয় পক্ষের মতো পথপ্রান্তে দাঁড়াইয়া শুনিয়া আসিলেন।

রঘুনাথ তখন আসিয়া গিয়াছে, লাঠি শুরু হইবে এবার। নরহরি বলিলেন, অম্বুবাচীর খবর রাখ সর্দার?

রঘুনাথ ঘাড় নাড়িল।

কই, টের পাচ্ছি না তো তোমাদের ভাবগতিক দেখে—

ভারি গলায় রঘুনাথ বলিল, সেসব রেওয়াজ উঠে গেছে চৌধুরি মশায়। কেউ আসে না, কারও আর ওসব দিকে ঝোঁক নেই। নইলে কি উঠোনের উপর পায়তারা ভাঁজতাম—বোঠে বাইতে বাইতে হাত ব্যথা হয়ে যেত না এতক্ষণ?

সেইসব দিনের কথা নরহরির মনে পড়ে—যেন গত জন্মের কথা। অম্বুবাচীর প্রথম দিন নৌকা-বাইচ হইত। এক এক গ্রামের এক এক নৌকা—আট দশ ক্রোশ দূর হইতেও নৌকা আসিত। পাল্লার নৌকা ছাড়া বাইচ দেখিবার জন্যও অনেকে আসিত, নৌকায় নৌকায় মালঞ্চের জল দেখিবার জো থাকিত না। নদীর দু-পারে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করিয়া দাঁড়াইত। চিতলমারির মোহানা হইতে পাল্লা শুরু হইত। নাককাটির খালের মুখ ছাড়িয়া আরও প্রায় ক্রোশখানেক আগাইয়া গরিব-কালিবাড়ি নামক এক জায়গা—বিচারকেরা সেইখানে বড় বড় বাচাড়ি-নৌকা নোঙর করিয়া এ-নৌকা ও-নৌকার মধ্যে কাছি টাঙাইয়া অপেক্ষা করিতেন—কারা আগে আসিয়া বৈঠা দিয়া সেই কাছি স্পর্শ করিতে পারে।

শ্যামগঞ্জের বাইচ ডিঙিতে নরহরি নিজে উঠিয়া বসিতেন। বৈঠা ধরিতেন না—মাঝখানে দাঁড়াইয়া দু-হাত আন্দোলিত করিয়া জোরে বৈঠা বাহিতে সকলকে উৎসাহ দিতেন। সেদিন তিনি নূতন কাপড়-চাদর পরিয়া আসিতেন—সেই কাপড়-চাদর মাঝি বখশিশ পাইত। আর সকলে পাইত একখানি করিয়া গামছা। বাইচে হারুক কিম্বা জিতুক, চৌধুরির এ বখশিশ তারা পাইবেই। এ ছাড়া বিজয়ী দলের জন্য থাকিত সুবৃহৎ একটি পিতলের ঘড়া, আর দলের প্রত্যেকের জন্য একখানি নূতন উড়ানি।

দ্বিতীয় দিন চরের উপর ঢালিরা কুস্তি লড়িত, ঢালিখেলা ও লাঠিখেলা করিত। নরহরি তাদের সঙ্গে যোগ দিতেন। সে একদিন গিয়াছে।

নরহরি প্রশ্ন করিলেন, কালকেও এমনি ঘরকুণো হয়ে থাকতে হবে নাকি? না—না—না, এক্ষুণি তুমি চলে যাও সর্দার, পাড়ায় যারা আছে তাদের বল গিয়ে। গাঙ-পারে লোক পাঠিয়ে দাও। চণ্ডীদা'র চরে সবাই এসে কাল যেন জমায়েত হয়।

আপনি চরে যাবেন চৌধুরি মশায়?

হ্যাঁ—

লাঠি ধরবেন আপনি?

নরহরি ঘাড় নাড়িলেন। হাসিতে রঘুনাথের মুখ ভরিয়া গেল। তাহলে মানুষজন দেখবেন কি রকম ভেঙে এসে পড়ে! এবারে বরণডাঙা কানা হয়ে যাবে।

নরহরির চমক লাগিল। ঘোষ-গিন্নি এই দিকে ঝুঁকিয়াছেন নাকি। শিবনারায়ণের মাথা খারাপ হইয়া গিয়াছিল, সুমতি হইয়াছে তাঁর স্ত্রী-পুত্রের?

তারপর যেন অনেকটা নিজের মনেই বলিলেন, তবে আর বউভাসি ছেড়ে দিল কেন এত সহজে?

কিন্তু সৌদামিনী নহেন। কীর্তিনারায়ণ বড় হইবার পর তিনি ধর্মকর্মে মন দিয়াছেন, সংসারের সঙ্গে সম্পর্ক এখন নিতান্ত যেটুকু

নহিলে নয়। বিষয়-আশয় যে ক্রমশ হস্তচ্যুত হইতেছে, তা অনেকটা ঐ উদাসীনতার জন্মই। লাঠিখেলার উদ্যোগ-আয়োজন সমস্ত কীর্তিনারায়ণের। ভানুচাঁদটা আবার ওপারে গিয়া জুটিয়াছে, দুজনে বড় মিলিয়াছে, অহরহ তারা এসব লইয়াই আছে।

মাটিতে থুতু ফেলিয়া রঘুনাথ বলিল, দল ছেড়ে ভানু ওপারে গিয়ে উঠেছে। আমরা ফিরে আসব, সে ক'টা দিনও সবুর করল না হতভাগা।

কিন্তু আশ্চর্য, নিজ দলের ঢালির এমন দুষ্কার্যে নরহরি রাগ করিলেন না। বলিলেন দল আর রয়েছে কোথায়—যে দল ছাড়বার কথা উঠবে? এপারে পড়ে থাকলে শুধু লাঠি নয়, হাতেও ঘুন ধরে যেত। কাঁচা বয়স—পারবে কেন টিকে থাকতে?

একটু হাসিয়া কৌতূহলের স্বরে প্রশ্ন করিলেন, ভানুচাঁদ খুব আজকাল মাতব্বরি করে বেড়ায় বুঝি? বন-গাঁয়ে শিয়াল রাজা হয়েছে?

রঘুনাথ ঘাড় নাড়িয়া বলে, কার কাছে মাতব্বরি করবে, কে মানতে যাচ্ছে ওকে? বাপের বেটা কীর্তিনারায়ণ। সাকরেদের হাতে সার্থক লাঠি তুলে দিয়েছিল চিন্তামণি-ওস্তাদ। এক একদিন ভানুচাঁদকে উনি নাস্তানাবুদ করে ছেড়ে দেন। আমি এপার থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখি, দেখে আর পলক ফেলতে ইচ্ছে করে না।

সাবেক কালের মতো ঢালিদের মধ্যে বাঘা চৌধুরি নিজে লাঠি ধরিয়া দাঁড়াইবেন—বার্তা লইয়া রঘুনাথ পরমোৎসাহে ছুটিল। ঢালিপাড়া হইতে নানা দিকে দলবল পাঠাইয়া দিল। কিন্তু পরদিন যথাকালে চরে আসিয়া দেখা গেল, লোকজন সামান্যই আসিয়াছে। লাঠি খেলিবার জন্য রঘুনাথ যাদের জোগাড় করিয়া আনিয়াছে, লাঠি ভর দিয়া আছে তাই রক্ষা—লাঠি কাঁধে তুলিতে গেলে সেই ভারেই বোধকরি মাটিতে পড়িয়া যাইবে। যারা দেখিতে আসিয়াছে, তারাই এইসব বলিয়া হাসাহাসি করিতে লাগিল।

ওপারে বড় জমজমাট। পিঁপড়ার সারির মতো বাঁধ ধরিয়া মানুষ

গিয়া জমিতেছে। নরহরি এপারের দর্শক ক'টির উদ্দেশে বলিলেন, তোমরাও চলে যাও বাপসকল, সাঁকো পার হয়ে তাড়াতাড়ি জায়গা নাওগে। আমরা চেষ্টা করে দেখলাম, পেরে উঠলাম না। কেউ চায় না আমাদের, দেখতেই পাচ্ছ।

রঘুনাথ করুণ দৃষ্টিতে চাহিয়াছিল। নরহরি হাসিলেন—কান্নার মতো করুণ হাসি। বলিলেন, নদীর এক কূল ভাঙে আর এক কূল গড়ে—নিশ্বাস ফেলে কি হবে? ভাঙা-কূল আগলে দাঁড়িয়ে থাকতে আমারও ভাল লাগছে না রঘুনাথ। যদি বয়স থাকতো তাহলে ওদের ঐ নতুন কূলে ভানুচাঁদের মতোই গিয়ে নতুন ঘর বাঁধতাম।

সন্ধ্যারতি হইয়া গিয়াছে, ঠাকুর দালানে ভিড় নাই। ম্লান ঘৃতের দীপ জ্বলিতেছে। সেই আলোয় মালতী একা—খেলনার মতো ছোট খাটখানিতে শ্যামঠাকুরের শয্যা রচনা করিতেছে, মশারি খাটাইতেছে। সহসা সে চমকিয়া উঠিল। থামের ছায়ায় দাঁড়াইয়া একজন নিস্পন্দ কাঠের পুতুলের মতো বিগ্রহের দিকে চাহিয়া আছে। মুখ দেখা যাইতেছে না—সুবিশাল দীর্ঘদেহ।

কে?

নরহরি মুখ ফিরাইলেন।

মালতী আশ্চর্য হইয়া গেল। চোখে দেখিয়াও বিশ্বাস হইতে চায় না।

খুড়োমশায়?

নরহরি বলিলেন, হ্যাঁ মা, আমিই এসেছি।

মালতী সাগ্রহে হাত জড়াইয়া ধরে। বাড়ির ভিতর চলুন আপনি।

এতক্ষণে নরহরি ভাল করিয়া তার দিকে তাকাইলেন, তাকাইয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। মেয়েটার জীবন ব্যর্থ হইয়া গেছে, এ খবর ইতিপূর্বেই কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন। কচি মুখখানির উপর বিষাদের কথা যেন কঠিন অক্ষরে লেখা হইয়া রহিয়াছে। যার সঙ্গে বিয়ে হয়,

পরে জানা গেল—আগে একবার তার বিয়ে হইয়াছিল, সে পক্ষের এক ছেলে বর্তমান। যে প্রাসাদ দেখাইয়া দিয়াছিল, সেটা বরের নয়—তার জ্ঞাতি সম্পর্কীয় একজনের। ঘোষ-গিন্নি নরহরিকে জানাইয়া ভাল করিয়া খোঁজ-খবর লইয়া যদি সম্বন্ধ করিতেন, তবে কি এমন হইতে পারিত?

মালতী মাকে খবর দিতে ছুটিয়া গিয়াছে। পুরানো দিনের কথা নরহরির মনে আসে। মহাকালী-মন্দিরে যে কথা জোর করিয়া আদায় করিয়াছিলেন, সে প্রতিশ্রুতি—হ্যাঁ, তিনিই ভাঙিয়াছেন। ঘোষ-গিন্নি আর কি বিশ্বাস করিবেন তাঁকে?

সৌদামিনী আসিয়া বলিলেন, ঠাকুরপো, বাড়ি ঢুকলে না, অতিথি-অভ্যাগতের মতো মন্দিরের চাতালে বসে পড়েছ। রাগ পুষে রেখেছ এখনো এদ্দিন পরে?

নরহরি বলিলেন, রাগ-অভিমানের ও-পারে আজকে আমি বউঠান। সন্দেহ হচ্ছে, আমার মৃত্যু হয়ে গেছে।

একটু থামিয়া ম্লান হাসিয়া আবার বলিতে লাগিলেন, জেলে গিয়েছিলাম—সে অপমান দু-দিনে জুড়িয়ে যেত। কিন্তু বেরিয়ে এসে দেখছি, শ্যামগঞ্জ আলাদা রকমের হয়ে গেছে। সারা জীবন কাটিয়ে সাত বছরের ফাঁকে সমস্ত আনকোরা নতুন লাগছে। বিকালবেলা খাল-পার থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে আপনার কীর্তিকে দেখছিলাম। কি হাত খুলেছে, মরি মরি! আমার চেনা মানুষ, চেনা দলবল আবার যেন দেখতে পেলাম আজ চারদিন পরে। স্থির থাকতে পারলাম না বউঠান, সাঁকো পেরিয়ে পায়ে পায়ে আপনার বাড়ি চলে এসেছি।

সেই রাতে নরহরি বরণডাঙায় থাকিয়া গেলেন সৌদামিনীর আগ্রহাতিশয্যে। পুরানো দিনের অনেক কথাবার্তা হইল। খাল মজিয়া আসিতেছে। এখন আর খেয়ানৌকার প্রয়োজন হয় না, বাঁশের সাঁকোয় পারাপার চলিয়া থাকে। প্রহরখানেক রাত্রে মেঘ-ভাঙা জ্যোৎস্না উঠিল। চারিদিককার মাঠ, গাছপালা, নিষুপ্ত খোড়োঘর, রূপার পাতের মতো দূর-বিস্তৃত মালঞ্চের জলধারা বড়

অপরূপ দেখাইতে লাগিল। জ্যোৎস্নার আলোয় দেখা গেল, অতিথিশালার দাওয়ায় মানুষগুলা শুইয়া বসিয়া অলস বিশ্রামে গল্পগুজব করিতেছে। অনেক দিন আগেকার সুপরিচিত দৃশ্যগুলি—নরহরির অন্তরতল অবধি আনন্দে আলোড়িত হইয়া উঠিল। মৃত্যুলোক হইতে জীবন-রাজ্যে ফিরিয়া আসার আনন্দ।

আহারের জায়গা হইয়াছে। নরহরি বলিলেন, খেতে বসব বউঠান, তার আগে একটা প্রার্থনা মঞ্জুর করতে হবে। নিতান্ত বেহায়া বলেই মুখ ফুটে বলতে পারছি, অনুমতি দিন—কীর্তিনারায়ণের সঙ্গে মেয়েটার বিয়ে দিয়ে আপনার পাদপদ্মে এনে রেখে যাই। সুবর্ণলতা? সৌদামিনী আশ্চর্য হইয়া বলিতে লাগিলেন, বলেন কি চৌধুরি ঠাকুরপো? আমার ছেলে লেখাপড়া করল না, কত গরিব আমরা আপনার তুলনায়! বিরোধ কারও সঙ্গে আর রাখব না, স্থির করেছি। কিন্তু এই সম্বন্ধ নিয়ে আবার যে মন-কষাকষি শুরু হবে।

আমি তো উপযাচক হয়ে এলাম।

শ্যামকান্তর নিশ্চয় আপত্তি হবে।

নরহরি ঘাড় নাড়িয়া সায় দিলেন, তা হবে হয়তো। ওদের পথ আলাদা। বললাম তো ওদের ঐ দল আমি চিনতে পারি নে। কিন্তু তাকে খুশী করতে গিয়ে অচেনা ঘরে অজানা পাত্রের হাতে মা-মরা মেয়ে আমিই বা কেমন করে বিসর্জন দিই বলুন বউঠান?

হাতজোড় করিলেন নরহরি। বুড়া হইয়া একি অবস্থা হইয়া দাঁড়াইয়াছে বাঘা চৌধুরির?

সৌদামিনী বিহ্বল কণ্ঠে বলিলেন, পায়ে রেখে যাবার কথা-টথা খবরদার আর মুখ দিয়ে বের করবেন না ঠাকুরপো। সুবর্ণ আমার হেলাফেলার ধন? সত্যি সত্যি যদি এত বড় অনুগ্রহ করেন, মালতীর সঙ্গে ভাগাভাগি করে বুকখানা জুড়ে থাকবে আমার মা-লক্ষ্মী।

সেদিন ঘড়িতে দশটা বাজিতেই নরহরি সেরেস্তায় ফরাসের উপর

চাপিয়া বসিলেন। মালাধর ও আমলারা তাজ্জব হইয়াছে—নরহরির এই মূর্তি কেউই প্রায় দেখে নাই। সাবেক আমলে কখনো কখনো তিনি এইরূপ আসিয়া কাছারি গরম করিতেন। কিন্তু সে শিবনারায়ণ আসিবার পূর্বে—সেই সময়ের কর্মচারী বড় কেউ আর বাঁচিয়া নাই। বসিয়া প্রথমটা নানা খবরাখবর লইলেন, খুব হুকুম ছাড়িতে লাগিলেন। ঢালিপাড়ায় তিন জন বরকন্দাজ পাঠাইয়া দিলেন, পাড়ার সকলকে এখনই ডাকিয়া আনিতে হইবে।

ঢালিরা আসিয়া পৌঁছিলে নরহরি শ্যামকান্তকেও ডাকিয়া পাঠাইলেন। ইঙ্গিতে ঢালিদের কাছে আসিয়া বসিতে বলিলেন। জীবন-মরণ সন্ধিপথে অনেক কালের সহযাত্রী শিথিল ন্যুব্জদেহ এই মানুষগুলিকে গভীর দৃষ্টিতে তিনি দেখিতে লাগিলেন। পরমাত্মীয়দের কতদিন এমনভাবে দেখেন নাই! সহসা প্রশ্ন করিলেন, ইনাম পাস নি তো তোরা?

নরহরি কি বলিতে চান, না বুঝিয়া তারা ফ্যালফ্যাল করিয়া তাকাইল। নরহরি হাসিয়া বলিলেন, তোরা বেকুব—মুখ ফুটে কোনোদিন কিছু চাইতে শিখলি নে। কিন্তু আমারই কর্তব্য এটা—তোরা না চাইলেও আমাকে গছিয়ে দিতে হবে।

শ্যামকান্ত আসিলে বলিলেন, বসতঘর ভেঙে এনে দিয়েছিল রঘুনাথ। সবাই এরা লাঠি খেয়েছে, হাত-পা ভেঙেছে, জেলে পচেছে – এদের ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা কি করেছ শ্যামকান্ত?

শ্যামকান্ত মুখ নিচু করিল। এত মানুষ সবাই চুপচাপ, নরহরির মুখের দিকে চাহিয়া বাক্‌শক্তি হঠাৎ যেন বিলুপ্ত হইয়া গেছে।

নরহরি উচ্চ কণ্ঠে বলিলেন, বউভাসির চকের সমস্ত জমি আমি তোদের দিলাম।

সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেল। চকের ভিতর জমি দু হাজার বিঘার কম নয়। উহার জন্য এত দাঙ্গাহাঙ্গামা, খুনজখম—নরহরিকে জেলে পর্যন্ত যাইতে হইল। জেল হইতে নরহরি মাথা খারাপ হইয়া ফিরিয়াছেন নাকি।

শ্যামকান্ত জিজ্ঞাসা করিল, যত জমি—সমস্ত দিলেন ?

সমস্ত। ওরা অনেক দিয়ে এসেছে আমাদের—এই বাড়ি যেদিন এসে দখল করলাম, সেই তখন থেকে। জন প্রতি দশ-পনের বিঘা না হলে কাচ্চা-বাচ্চা মা-বউর পেট ভরাবে কিসে ? আর পেটও ওদের এক একটা ঢাকাই জালা—খাইয়ে দেখলে না তো কোন দিন। আমি দেখেছি।

নরহরি হাসিয়া উঠিলেন। ঢালিদের দিকে চাহিয়া বলিলেন, কাজ থাকল না তোদের আর কারও। আর কোন দিন চৌধুরি-বাড়ি ডাক পড়বে না। আমি হেরেছি, হেরে গিয়ে এতকাল জেলে পচে এলাম সাঙ্গোপাঙ্গো নিয়ে—

হাসিয়া অনেকটা যেন নিজের মনে বলিতে লাগিলেন, শিবনারায়ণ আমাদের গালি দিত, ব্রতচুর আমরা। কে কানে নিল তার কথা ? সেই তো হারল সকলের আগে। এবার আমরাও সরে যাচ্ছি। শ্যামকান্তর জিত—ওদের কাল, ওরাই জিতুক। শুনলি তো ? তোরা এখন সব শিষ্টশান্ত হয়ে চকের জমি চষবি, খাবি-দাবি, থাকবি—

প্রজাপাটক এবং বাহিরের যত লোক উপস্থিত ছিল, সকলে নরহরির আকাশ-ফাটানো জয়ধ্বনি করিতে লাগিল।

গোলমাল থামিলে আবার নরহরি বলিতে লাগিলেন, দিনকাল বদলে গেছে রে, আইন বড্ড কড়া। গাঙে গাঙে বেড়ানো কি দাঙ্গা-ফ্যাসাদে ঝাঁপিয়ে পড়া আর চলবে না। ভালমানুষ হতে হবে, মালাধর আর শ্যামকান্তর পরামর্শ নিয়ে প্রতি পদ খুব সামাল হয়ে চলতে হবে।

ঢালিরা বলে, গোলা থেকে ধান পাঠানো বন্ধ তা হলে চৌধুরি মশায় ?

নরহরি ঘাড় নাড়িলেন। বলিলেন, এখনই কি পেয়ে থাকিস নিয়মমতো ?

ছিলাম ঢালি, আমাদের পুরোপুরি চাষা বানিয়ে দিলে ?

এমন হইল, কেহ আর চোখের জল রাখতে পারে না। সকলের হইয়া গেলে নরহরি রঘুনাথকে ডাকিলেন, শোন সর্দার, কাছে এস—

ডুবন্ত মানুষ তীরের তৃণমুষ্টি যেভাবে চাপিয়া ধরে, নরহরি তেমন ভাবে রঘুনাথকে বুকে টানিয়া লইলেন।

তুমি হলে সর্দার, বন্দোবস্ত আলাদা তোমার সঙ্গে। লাঠি ধরে একলা বিশজনের মহড়া দিতে পার, ঢাল সড়কি নিয়ে দু-শ লোকের ব্যূহ ফুঁড়ে বেরোও, জোয়ারের মালঞ্চ হাসতে হাসতে সাঁতারে পার হয়ে যাও, রাতের মধ্যে আটচালা কাছারিঘর উড়িয়ে এনে চকে বসাও— জেল থেকে ছেড়ে দিয়েছে, কিন্তু আমি তোমায় কয়েদ করে রাখলাম।

ম্লান হাসি হাসিয়া রঘুনাথ বলিল, আমার নতুন ঘর দুয়োর আর হল না তা হলে?

ছাড়বই না মোটে, ঘরের গরজটা কি? দু-জন আমরা সেকালের সাথী এক সঙ্গে থাকব। আমি যা খাব, তুমি তাই খাবে। যদি কোথাও যাই, তুমি থাকবে সঙ্গে। যেদিন চোখ বুঁজব, ছুটি সেই দিন—তার আগে নয়। একেবারে একা পড়ে গেছি, একজন কাউকে না পেলে থাকি কি করে ভাই?

বলিতে বলিতে কেউ যাহা কোন দিন দেখে নাই—দু-ফোঁটা অশ্রু বাঘা চৌধুরির কপোল বাহিয়া ঝরিয়া পড়িল।

রঘুনাথ বলিল, ব্যবস্থা মন্দ নয়। ওরা তবু চাষী হয়ে থাকল, আমি গোলাম।

ইতিমধ্যে জনতা বাড়িয়াছে। লোকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। রঘুনাথের কথা ডুবিয়া গেল তার মধ্যে।

নরহরি উঠিলেন, এবার বাড়ির ভিতর যাইবেন। রঘুনাথ বলিল, আজকের দিনটা আমার ছুটি চৌধুরি মশায়। যমুনার যা হোক একটা ব্যবস্থা করে আসি। আর—

প্রাচীন ঢালি-সর্দারেরও চোখ দু'টা চকচক করিয়া উঠিল, মুহূর্তকাল কথা বলিতে পারিল না। শেষে সামলাইয়া লইয়া বলিল, আর আমাদের লাঠিগুলো বোঝা বেঁধে তুলে রেখে দিয়েছিলাম—আপনার হুকুম নিয়ে বোঝা আবার খুলব, এই মনে করে। সেগুলো মালঞ্চে ভাসিয়ে দিয়ে আসিগে।

নরহরি ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

আজকে নয় সর্দার। আর একদিন একটিবার শুধু লাঠির দরকার হবে। বরঞ্চ বোঝা খুলে ওদের তেল মাখাতে বলে এস।

শ্যামকান্ত শিহরিয়া উঠে। মালাধরও প্রমাদ গণিল। বউভাসির চকের মতো কোনখানে আবার একটা ধুন্ধুমার বাধাইবার মতলব আছে নাকি?

(২)

সাবেক আমলে যেটা সদর ছিল, এখন অব্যবহার্য অবস্থায় পড়িয়া থাকে, নরহরি সেই দিকটায় নূতন চুনকাম করাইলেন। বিয়ে থাওয়া এই প্রান্তে হইবে। সদরের মাঠে শ-খানেক খড়ের চালা হইল, আবার তার পাশের উলুক্ষেতটাও সাফ করিতে লোক লাগাইয়া দিলেন। ঢালির দল সড়কি লাঠি ফেলিয়া আপাতত ঘর বাঁধিতে লাগিয়াছে। অবাক হইয়া সকলে জিজ্ঞাসা করে, দুটো জায়গা কি হবে চৌধুরি মশায়?

চৌধুরি হাসিয়া বলিলেন, একটায় থাকবে মানুষ, আর একটায় ছাতি। বাবাজীবনের দলটা নেহাৎ ছোট নয় তো! আর ওর একজনকেও কি ছেড়ে আসবেন, ভেবেছিস? তোরা ভাল রকম তৈরি থাকবি কিন্তু বাপধনেরা।

আর যাইবে কোথায়! বিয়ের দিন দশেক বাকি, ঢালির উৎসাহের প্রাবল্যে এখন হইতে লাফাইতে শুরু করিল। কীর্তিনারায়ণের দলের নামডাক চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, রঘুনাথের পুরানো দল একটা দিনের জন্য অন্তত ঐ নূতন দলের সঙ্গে মোকাবিলার সুযোগ পাইবে! ক্রমশ এমন হইয়া উঠিল, একটি লোক আর নরহরি ডাকিয়া পান না। কাজকর্ম ফেলিয়া সকলে খালধারে গিয়া লাঠি ভাঁজিয়া ভাঁজিয়া হাত চোস্ত করিতেছে।

যেন আকাশের চাঁদ ধরা দিয়াছে। মেয়ের বিয়ে দিতে বসিয়া

নরহরি মনের আনন্দে দু-হাতে খরচপত্র করিতেছেন। কোন কিছুতে ত্রুটি রাখিবেন না।

সেদিন পূর্ণিমা রাত। আর এমনি দৈবচক্র, বর্ষাকালের আকাশে একখানিও মেঘ নাই, ফুটফুটে জ্যোৎস্না হাসিতেছে। মশাল জ্বালিয়া বাজনা বাজাইয়া মুহুর্মুহু তোপ দাগিয়া বরপক্ষ ফটকের সামনে আসিল। আগে পিছে কীর্তিনারায়ণের লাঠিয়ালেরা লাঠি উঁচাইয়া জয়ধ্বনি করিয়া চলিয়াছে। এমন সময়ে বজ্রকণ্ঠের হুকুম আসিল। ডঙ্কা থামাও—এটা চৌধুরি-বাড়ি।

ভানুচাঁদ বরের পালকির মধ্যে মুখ ঢুকাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, কি করব?

কীর্তিনারায়ণ চোখ পাকাইয়া বলিল, খোকা হয়ে গেলে ভানু? আমরা কবে কার হুকুম মেনে চলে থাকি?

মানে, বিয়ে কিনা—এটা হল গিয়ে শ্বশুরবাড়ি। ভানুচাঁদ অপ্রতিভ মুখে আমতা-আমতা করিয়া সরিয়া গেল। আরও শতগুণ চিৎকার উঠিল।

শ্যামগঞ্জের ঢালিরা ওদিকে বুক ফুলাইয়া ফটক আটকাইয়া দাঁড়াইয়াছে। খবরদার!

কথাবার্তা আর কিছু নয়—লাঠির পরে লাঠি। তেল-চকচকে পাঁচ-হাতি লাঠি। লাঠির প্রতি গিরায় লোহার আংটা-মারা। সেই লোহায় লোহায় আগুন ছুটিতেছে। মরদ-জোয়ানের তাজা রক্তে বাঁশের লাঠি লাল হইয়া যাইতে লাগিল।

হঠাৎ, বাবা গো!—ভানুচাঁদ ভূমি লইয়াছে। চৌধুরি-পক্ষের ক'জন অমনি ছোঁ মারিয়া আহতকে তুলিয়া লইয়া চলিল সদর-মাঠের খড়ের চালার একটিতে। সহসা দৈববাণীর মতো উপর হইতে গম্ভীর কণ্ঠে ভাসিয়া আসিল, ওগো কুটুম্বর দল, কেন মারামারি করছ? পেরে উঠবে না। তার চেয়ে চুপচাপ ঢুকে পড়। চৌধুরি-বাড়িতে ডঙ্কা দিয়ে কেউ ঢুকতে পায় না।

মাথা তুলিয়া সকলে দেখিল, নরহরি চৌধুরি অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন।

বরপক্ষ পিছাইতে পিছাইতে প্রায় এক রশি পিছাইয়া আসিয়াছে। কণ্ঠ নিস্তেজ। ভানুচাঁদ নাই, তাই কারও যেন আর বুকে বল নাই। আবার একজনে পালকির কাছে হুকুম লইতে গেল, কি হবে?

কাপুরুষ। বলিয়া বর রুখিয়া উঠিল। চোখ দিয়া আগুন ছুটিতেছে। দাঙ্গা-ক্ষেত্রের একধারে ষোল বেহারা পালকি লইয়া নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া ছিল। কীর্তিনারায়ণ স্থান-কাল ভুলিয়া গেল; একটা লাঠি ছিনাইয়া লইয়া হুঙ্কার দিয়া সে পালকির মধ্যে খাড়া হইয়া দাঁড়াইল। পালকির ছাউনি চড়-চড় করিয়া মাথার সঙ্গে সঙ্গে শূন্যে উঠিল। লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে এক লাফে সে ঝাঁপাইয়া পড়িল। আবার আকাশ-ফাটানো জয়ধ্বনি। সিংহ গর্জন করিতে করিতে ডাইনে বামে সামনে তীরগতিতে চতুর্মুখী খেলা খেলিয়া বেড়াইতেছে। বরের সজ্জায় আরও অপরূপ দেখাইতেছে তাকে। নরহরির সে আমলের নাম-করা ভাল ভাল ঢালি—সকলে ধূলায় লুটোপুটি খাইতে লাগিল। দুঃখে কি আনন্দে বুড়া চৌধুরির চোখের কোণ চক-চক করিয়া উঠিল, আর তিনি থাকিতে পারিলেন না। অন্তঃপুরে কনে-চন্দন পরিয়া নানা অলঙ্কারে সাজিয়া মেয়ে রাজ-রাজ্যেশ্বরী হইয়া বসিয়া ছিল, গিয়া তার হাত ধরিয়া ডাকিলেন, সুবর্ণ, দেখবে মা, তোর বাবার বাবা এসেছে। উঃ, খেলোয়াড় বটে! দেখে যা—

সুবর্ণলতার হাত ধরিয়া টানিতে টানিতে চৌধুরি আবার অলিন্দে আসিয়া দাঁড়াইলেন। বর তখন দলবল লইয়া ফটকের মধ্যে ঢুকিয়াছে। কপাল কাটিয়া রক্ত দরদর করিয়া পড়িতেছে। চারিদিকে মুহুর্মুহু জয়ধ্বনি। সেকেলে পুরানো বড় বড় মকর-মুখো থাম, চক-মিলানো উঠান, বিপুলায়তন কতকগুলি···জয়ধ্বনি তার মধ্যে গমগম করিয়া কক্ষ হইতে কক্ষান্তরে প্রতিহত হইয়া ফিরিতে লাগিল। বিমুগ্ধ দৃষ্টি প্রাণপণে বিস্ফারিত করিয়া নরহরি বলিলেন,

যদি বয়স থাকত মা আজ জামাইয়ের সঙ্গে একহাত লড়ে দেখতাম। সার্থক লাঠি ধরা শিখেছে—

কিন্তু সুবর্ণলতার সোনার মতো মুখখানি আজ অন্ধকার। সহসা মেয়ের চোখ ছল ছল করিয়া আসিল। বলিল, তুমি লড়বে না বাবা, খোঁড়া রঘুনাথও গাড়ু-গামছা বয়ে বেড়াচ্ছে, চৌধুরি-উঠোনে তাই আজ অমন করে জকার দিয়ে বেড়াতে পারল।

তা হোক, তা হোক—জামাই আজ আমাদের হারিয়ে দিল। বলিতে বলিতে মেয়ের দিকে চাহিয়া বুড়া চৌধুরির উচ্ছ্বাস থামিয়া গেল। বলিলেন, তোর বুঝি অপমান হল? আ আমার কপাল!

মেয়ের চোখ মুছাইতে গিয়া হি-হি করিয়া তিনি হাসিয়া আকুল।

সদর-মাঠের সেই একশ' চালায় দু'পক্ষের ঢালি লাঠিয়ালের বাসা। আর উলুক্ষেত মারিয়া তাদের ছাতা রাখিবার জায়গা হইয়াছে। তালপাতার ছাতা বন্ধ হয় না—মানুষের যা জায়গা লাগে, ছাতারও তাই। বরপক্ষের যারা আহত, চৌধুরির ঢালিরা তাদের রক্ত ধুইয়া দিতেছে, আবার চৌধুরির দলে যারা হাত-পা ভাঙিয়াছে তাদেরও সেবা দু-দলে মিলিয়া মিশিয়া হইতেছে। এমন লাঠালাঠি শেষ হইয়াছে, একই ঘরে এ-দলের ও-দলের একত্র বিছানা।

কিন্তু মুশকিল হইল বরের। মাথায় কাপড়ের পটি বাঁধিয়া বিয়ে হইয়া গেছে, তখন জয়ের আনন্দে মাথার চোট একটুও বাজে নাই। বাসর হইয়াছিল, কত কত মেয়েরা আসিয়াছিল, লাবণ্যমতীরা প্রশংসমান চোখে বার বার তার দিকে তাকাইতেছিল। এ বাসরে আজ লঘু হাসি-পরিহাস জমিতে পারে নাই—ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবল ঐ একটি কথা। সবাই বলে—কি চমৎকার! এত সব ব্যাপারের মধ্যে কখন যে মাথা ফাটিয়া সামান্য ক-ফোঁটা রক্ত পড়িয়াছে—সে কথা মনে পড়িবার ফুরসৎ কোথায়?

কিন্তু এখনকার অবস্থা আর এক রকম। সে-সব মানুষ-জন চলিয়া গেছে। কোণের দিকে মিটিমিটি একটি প্রদীপ। কীর্তিনারায়ণের

মাথার রগ ফাটিয়া যেন ছিঁড়িয়া পড়িতে লাগিল, অথচ মুখ ফুটিয়া প্রকাশ করিবার জো নাই—শত্রুপক্ষের মেয়েটি খাটের কোণে।

নিস্তব্ধ রাত্রি। দারুণ যন্ত্রণায় কপাল চাপিয়া ধরিয়া কীর্তিনারায়ণ জানলার ধারে আসিয়া দাঁড়াইল। জ্যোৎস্না হাসিতেছে। ঝুপসি-ঝুপসি গাছগুলার মাথার উপরে জোনাকি উড়িয়া বেড়াইতেছে। তার উপরে—অনেক উপরে অনন্ত তারকাশ্রেণী। একটুও হাওয়া নাই। ঝিঁঝিঁ ডাকিতেছে, একটা কুয়োপাখী একটানা ডাকিয়া চলিয়াছে।···কীর্তিনারায়ণ সন্তর্পণে তাকাইয়া দেখিল, শত্রুপক্ষের মেয়েটির একদম সাড়া-শব্দ নাই, জড়সড় হইয়া একই ভাবে পড়িয়া আছে। ঘুমাইতেছে বোধ হয়।

তুত্তোর! দেয় বলে, দিকগে—

বিরক্ত হইয়া কীর্তিনারায়ণ আসিয়া শুইয়া পড়িল। এক হাতে রগ চাপিয়া আর এক হাতে পাখা লইয়া জোরে বাতাস করিতে লাগিল।

তারপর কখন এক সময়ে তন্দ্রার ভাব আসিয়াছে, হাতের পাখা খসিয়া পড়িয়াছে। ঘুমের মধ্যে কীর্তিনারায়ণের নাকে আসিল অতি-স্নিগ্ধ একটা গন্ধ, যেন ঝিনঝিন করিয়া ভারি মিষ্ট সুরে কঙ্কণ বাজিতেছে, বাজনার তালে তালে পাখীর পালক দিয়া বুঝি কে মধুর হাওয়া করিতেছে, কপালের ক্ষত জায়গায় অনেকগুলো গন্ধ-ভরা ফুল রাখিয়া দিয়াছে···খপ করিয়া সবল মুঠিতে সে ধরিয়া ফেলিল—ফুল নয়—একখানি হাত। চোখ খুলিতে না খুলিতে সুবর্ণলতা অতি অবহেলায় হাত ছাড়াইয়া লইয়া সরিয়া দাঁড়াইল। এত সুন্দর হইয়াছে সুবর্ণলতা, এত বড় হইয়াছে, এমন কোমল মাদকতাময় তার স্পর্শ!

ঘুম ভাঙিয়া কীর্তিনারায়ণ এক মুহূর্তে সকল ব্যথা ভুলিয়া খাড়া হইয়া বসিল। বিস্ময়ে ক্ষণকাল কথা ফুটিল না। বলিল, আমার হাত থেকে তুমি হাত ছাড়িয়ে নিলে?

সুবর্ণলতা কথা কহে না।

কপালে হাত দিয়া দেখিয়া বলিল, এখানে চন্দন লাগিয়েছ তুমি?

শত্রুপক্ষের মেয়েটি তখন উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে।

কীর্তিনারায়ণ বাধা দিয়া বলিল, যেও না। পরীক্ষা হোক। হাত দাও—আবার ধরি। আমি ঘুম-চোখে ধরেছিলাম, তাই ছাড়াতে পেরেছ।

সে ধরিতে গেলে সুবর্ণ ছোট্ট পাখীটির মতো যেন উড়িয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

শেষরাতে অস্তগামী চাঁদের আলো বিছানায় লুটাইয়া পড়িয়াছে। হঠাৎ কীর্তিনারায়ণের ঘুম ভাঙিল। দেখে, সুবর্ণলতা ইতিমধ্যে আবার কখন আসিয়া ঘুমাইয়া আছে। পরের মেয়ে—অজানা অচেনা নয় যদিচ, তবু বিপক্ষ দলের লোক—গায়ে আর হাত দিল না। ডাকিল, ওগো কন্যে, শোন—শোন—

হাঁকাহাঁকিতে সুবর্ণ জাগিয়া চোখ মেলিল। কি বুঝি স্বপ্ন দেখিতেছিল, ক্ষীণ মধুর একটু হাসি মুখে লাগিয়া আছে। সন্ধ্যায় চৌধুরি-বাড়ির অপমানের ছায়ামাত্র আর মুখে নাই। কীর্তিনারায়ণ বলিল, দেখ, একটা পরীক্ষা হওয়া দরকার—

বিয়ের পর এই প্রথম সুবর্ণলতা কথা বলিল, মৃদুস্বরে বলিল, আর একদিন—

ভয় পেয়ে গেলে? হো-হো করিয়া কক্ষ ফাটাইয়া পালোয়ান বর হাসিতে লাগিল। বলিল, এই যে শুনেছিলাম খুড়ো মশায় নিজে তোমায় কুস্তি-কসরৎ শেখাতেন, রঘুনাথও শেখাত। খালি হাত, লাঠি, সড়কি—যা তোমার খুশি। আমার কিচ্ছু আপত্তি নেই। আমার হাত যখন ছাড়িয়ে গেলে—ঘুমই হোক যা-ই হোক, একটু-কিছু আছে নিশ্চয়। এস—পরীক্ষা হয়ে যাক—

বধূ মধুর হাসিয়া বলিল, বেশ তো লোক। আমি ঘুমুব না বুঝি, আমার ঘুম পাচ্ছে।

তাহলে হার স্বীকার কর। বল, যে আমি ঘুমিয়ে ছিলাম বলে হাত ছাড়াতে পেরেছ, নইলে কখনো পারতে না। বল—

তা-ই, তা-ই। বলিয়া স্বচ্ছন্দে পরাজয় মানিয়া সুবর্ণলতা ঘুমাইতে লাগিল।

এ রকম আপোষে জিতিয়া কিন্তু কীর্তিনারায়ণের মনের মধ্যে কাঁটা বিঁধিতে লাগিল; ঘুম হোক, যা-ই হোক—তবু কীর্তিনারায়ণের হাতের মুঠি। বড় বড় মরদে হিমসিম খাইয়া যায়, আর মেয়েমানুষ হইয়া সে হাত ছাড়াইয়া চলিয়া গেল।

বর ও বধূ বরণডাঙায় গিয়াছে। কীর্তিনারায়ণ দিন-রাত পরীক্ষার সুযোগ খুঁজিয়া খুঁজিয়া বেড়ায়। কিন্তু বধূর পাত্তা পাওয়া ভার। সারাদিন উৎসব উপলক্ষে আগত কুটুম্ব মেয়েদের সঙ্গে হাসিয়া দেখিয়া-শুনিয়া কাজকর্ম করিয়া বেড়ায়, গভীর রাত্রে নিদ্রা-কাতর চোখে ঘরে আসে। আসিয়াই ঘুমাইয়া পড়ে, তখন আর জাগাইয়া তুলিতে মায়া হয়। এমনি করিয়া দিন কাটিয়া যায়, পরীক্ষা আর ঘটিয়া উঠে না।

একদিন ফাঁক পাইয়া কীর্তিনারায়ণ সুবর্ণলতার হাত ধরিয়া ফেলিল। বলিল আজ আর ছাড়ছি নে। কিন্তু ধরিয়াই তখনি ছাড়িয়া দিল। ছি-ছি—এই তাহার প্রতিপক্ষ! হাত তো নয়, যেন একমুঠা তুলা! যেখানটায় ধরিয়াছে, কাঁচা-হলুদের মতো রং একেবারে লাল টকটকে হইয়া উঠিয়াছে। হাসিয়া বলিল, আচ্ছা কুস্তিগির তো! লাঠি-কুস্তি শিখে শিখে এই শরীর বানিয়েছ?

কীর্তিনারায়ণ এতক্ষণে নিশ্চিন্তে নিশ্বাস ফেলিতে পারিল।

(৩)

আশ্বিন মাস, বাড়িতে পূজা। আবার বধূ আসিল। সৌদামিনীর শুচি-ব্যাধি সম্প্রতি উদ্ভট রকমের হইয়া দাঁড়াইয়াছে। লোকজনের অভাব নাই, মুখের কথা মুখে থাকিতেই পরম শুদ্ধাচারে বাড়িতে সর্বরকম উদ্যোগ-আয়োজন হইতে পারে। কিন্তু তাঁর উহাতে তৃপ্তি

হয় না, ঘাটে বসিয়া ত্রিসন্ধ্যা আহ্নিক সারিয়া যান। চাতালে বসিয়াও শান্তি নাই, সেখানে কত লোকের আসা-যাওয়া, কত কি অনাচার! জলের ধারে একদিকে একটি প্রকাণ্ড তেঁতুল-গুঁড়ি; ঐটি তাঁর একান্ত নিজস্ব। ধুইতে ধুইতে কাঠখানা প্রায় সাদা হইয়া উঠিয়াছে।

পূজামণ্ডপে ঢাক বাজিতেছে, অষ্টমীর অঞ্জলি দিতে যাইবার কথা। সকাল সকাল সুবর্ণলতা আসিয়াছে, শাশুড়ি আসিয়াছেন, এবাড়ি-ওবাড়ির আরও ক'টি মেয়ে আসিয়াছে। পুকুর শুকাইয়া গিয়া তেঁতুল-গুঁড়ি হইতে অনেকটা দূরে জল সরিয়া গিয়াছে। সুবর্ণলতা তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিল, দূর হইতে জল আনিয়া গুঁড়ি ধুইতে মার বড় কষ্ট হইতেছে। মাথার উপর খররৌদ্র, এত বেলা পর্যন্ত এখনো তিনি জলগ্রহণ করেন নাই।···সাঁতার দিয়া তীরবেগে সেইখানে গিয়া গুঁড়িটা দু-বাহু বেড়িয়া ধরিল।

সৌদামিনী হাঁ হাঁ করিয়া উঠিলেন, ছুঁয়ে দিলি পাগলি মেয়ে?

নেয়েছি তো। হাসিয়া ফেলিয়া সুবর্ণ বলিল, কাঠখানা জলের দিকে একটু সরিয়ে দিই—দেব মা?

হুঁ, হাত-পা ভেঙে কাণ্ড কর একখানা।···ওকি? ওকি? ওকি?

সকলের চক্ষু কপালে উঠিয়াছে। বধূ স্বচ্ছন্দে গুঁড়ি তুলিয়া জলের ধারে ফেলিয়া দিল।

আর-আর মেয়েরা ছুটিয়া কাছে চলিয়া আসিল। সকলের মধ্যে পড়িয়া সুবর্ণ লজ্জারক্ত মুখে আঙুলের নখ খুঁটিতেছে। সৌদামিনী আহ্নিক ভুলিয়া একেবারে তাকে কোলে জড়াইয়া ধরিলেন। আনন্দ-প্রদীপ্ত মুখে পরম স্নেহে বধূর চিবুক তুলিয়া বলিতে লাগিলেন, সুখে থাক মা-লক্ষ্মী। আমার কীর্তিনারায়ণের জোড়া হয়ে চিরদিন বেঁচে-বর্তে থাক!

মুখ তুলিয়া সুবর্ণলতা আস্তে আস্তে কহিল, কেউ যেন বলে দেয় না মা, তাহলে অনর্থ হবে।

তাহা সকলেই জানে। হাসি মুখে সৌদামিনী মেয়েদের শাসন করিয়া দিলেন, কেউ তোরা বলবি নে কিন্তু—খবরদার!

মায়ের অসুবিধাটা কীর্তিনারায়ণেরও নজরে পড়িয়াছে। পূজা-বাড়ির নানা কাজকর্মের মধ্যে করি-করি করিয়াও এ ক'দিন হইয়া ওঠে নাই, আজ তেল মাখিয়া কোমরে গামছা বাঁধিয়া একেবারে সে পুকুরের সেই দিক দিয়া নামিল।

ভানুচাঁদও নাহিতে আসিয়াছিল, কীর্তিনারায়ণ জিজ্ঞাসা করিল, যাত্রা শুনে সব তো তোরা বেহুঁশ হয়ে ঘুমুচ্ছিলি, এদিকে এলি কখন?

ভানুচাঁদ ঘাড় নাড়িল, আসে নাই তো।

গুঁড়িটা দেখাইয়া মহাবিস্ময়ে কীর্তিনারায়ণ তাকাইয়া রহিল।

তবে?

স্নান ঐ পর্যন্ত। মনের মধ্যে হঠাৎ বিদ্যুদ্দীপ্তির মতো একটা কথা জাগিল, কীর্তিনারায়ণ ভিজা কাপড়ে অন্তঃপুরে ছুটিল। সৌদামিনী ভগবদগীতা পড়িতেছিলেন; খালি চোখে দিব্য পড়িতে পারেন। আর কপালে হোমের ফোঁটা পরিয়া স্নিগ্ধ তদগত মুখে সুবর্ণলতা ও মালতী পাশাপাশি বসিয়া পাঠ শুনিতেছিল। ঝড়ের মতো ছুটিয়া আসিয়া কীর্তিনারায়ণ প্রশ্ন করিল, গুঁড়ি কে সরিয়েছে মা?

এক নজর চাহিয়া মুখ টিপিয়া হাসিয়া সৌদামিনী পুনশ্চ পড়ায় মন দিলেন।

বধূর সঙ্গে কীর্তিনারায়ণের একবার চোখাচোখি হইল, বধূ মুখ নামাইল। অধীর কণ্ঠে কীর্তিনারায়ণ কহিতে লাগিল, ভানুচাঁদও ওটা একা নাড়তে পারে না। আজকে সবাই যাত্রা শুনে ঘুমুচ্ছে—তুমি কোথায় লোক-জন পেলে, কারা সরিয়ে দিল? ও তো এক-আধটা লোকের কাজ নয়—

পড়া থামাইয়া সৌদামিনী বলিলেন, একটা লোকেরই কাজ। তুই এখন নাইতে যা দিকি।

কে লোক? বল বল, নইলে তোমার পায়ে মাথা খুঁড়ে মরব!

কীর্তিনারায়ণ যেন ক্ষেপিয়া উঠিল, বুকের উপর থাবা মারিয়া

বলিতে লাগিল, আমি—আমি—এ অঞ্চলের মধ্যে একটা মাত্র লোক আছে, যে একলা ঐ কাঠ তুলতে পারে—সে তোমার ছেলে। আর পারতেন হয়তো নরহরি চৌধুরি—জোয়ান বয়সে। নরহরি চৌধুরির মেয়ে তুলেছে কিনা—সেই কথাটা তুমি আমায় বল মা। আমি একবার ওর সঙ্গে লড়ে দেখব তা হলে।

বলিয়া সুবর্ণর দিকে এমন তাকাইতে লাগিল যে ভয় পাইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইল। চেঁচামেচিতে আর মেয়েরা যে যেখানে ছিল, আসিয়া ভিড় করিয়াছে। মালতী সুবর্ণর হাত ধরিল। ফিস-ফিস করিয়া ভয়ের ভঙ্গিতে বলিল, পালিয়ে আয় শিগগির। ভাই আমার বড্ড রেগে গিয়েছে। মেরে বসতে পারে।

রোখ প্রায় সেই রকমই। মালতী ঘাটে ছিল না, কাজেই সবটা জানে না। বৃত্তান্তটা ভাল করিয়া শুনিবার জন্য হাসিতে হাসিতে সুবর্ণকে লইয়া সে দরজা দিল। দরজার উপর দমাদম লাথি পড়িতেছে। কীর্তিনারায়ণের চিৎকারে চারিদিক চৌচির হইয়া যাইতেছে। বলিতেছে, দুয়োর খোল দিদি। চৌধুরির মেয়ে ফাঁকে ফাঁকে জিতে যাবে, সে আমি কিছুতে হতে দেব না।

লাথির পর লাথি। খিল ভাঙিয়া দরজা খুলিয়া গেল। দুই হাত কোমরে দিয়া তীব্রদৃষ্টিতে বধূর মুখে চাহিয়া কীর্তিনারায়ণ প্রশ্ন করিল, তুমি গুঁড়ি সরিয়েছ ?

বধূর এত যে ভয়, কোথায় যেন চলিয়া গেল। মৃদু হাসিয়া বলিল, আমি কি পারি ?

কীর্তিনারায়ণ বলিল, খুব পার। তোমরা বাপে-মেয়ে কি পার আর কি না পার, কিছু বলবার জো নেই। শোন, তোমায় না হারিয়ে আজকে আমি জলস্পর্শ করব না, এই আমার শপথ।

সুবর্ণলতা বলিল, কতবার আমি তো হেরে গেছি।

ছাই হেরেছ। সব মিছামিছি। বাঘা চৌধুরির মেয়ে তুমি, হারতে যে পার না, তা নয়—তবে অত সহজে নয়।

পিতৃগর্বে বধূর মুখ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠিল। বলিল, আমার বাবার

হাতে লাঠি কবেই বা দেখলে তুমি! আমিও ভাল করে দেখতে পেলাম কি?

তারপর নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, তবু তো আমাদের হারিয়ে দিয়ে বাড়ির মধ্যে জকার দিয়ে এসেছ।

কীর্তিনারায়ণ চোখ ঘুরাইয়া রীতিমতো ক্রুদ্ধকণ্ঠে কহিল, হার না ছাই! চৌধুরি মশাই লাঠি ধরলে কারও সাধ্য ছিল? তারপর বলিল, শোন চৌধুরির মেয়ে, ঐ খিল-ভাঙা দুয়োর তুমি চেপে ধর। বাইরে থেকে আমি ধাক্কা দিয়ে খুলব! তোমার বাপের দোহাই— ইচ্ছে করে হারতে পারবে না।

মালতী কানে কানে কহিল, ধর্। জব্দ হোক। বড্ড ওর আস্পর্ধা হয়েছে।

তখন পিতার উদ্দেশে প্রণাম করিয়া সুবর্ণলতা দরজা চাপিয়া দাঁড়াইল। ঐরাবতের বেগে কীর্তিনারায়ণ ধাক্কা দিতেছে, কবাট একবিন্দু নড়ে না। কখন বা মুহূর্তকাল স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া যেন শক্তি সঞ্চয় করিয়া লয়, আবার দ্বিগুণ বিক্রমে ঝাঁপাইয়া আসিয়া পড়ে। বন্ধ কবাট এতটুকু ফাঁক হয় না। সৌদামিনী এতক্ষণ ইহাদের পাগলামিতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিতেছিলেন। তিনি পূজার দালানে চলিয়া গেলেন। অনেকক্ষণ কাটিয়া গেল। কীর্তিনারায়ণের সমুদয় রক্ত যেন ঘাম হইয়া ঝরিয়া পড়িতেছে, পরিশ্রান্ত সারাদিনের অভুক্ত পালোয়ান অবশেষে হাঁপাইতে হাঁপাইতে মেঝের উপর বসিয়া পড়িল। অমনি দুয়ার খুলিয়া বধূ পাখা লইয়া তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিল।

কীর্তি বলিল, থাক পাখা—

কেন? বধূর মুখের উপর অভিমানের ছায়া।

কীর্তিনারায়ণ বলিল, আমি হারি নি এখনো। তুমি ঘরে যাও, আমি আবার দেখব।

বধূ বলিল, আমি হেরেছি। আমি আর পেরে উঠছি নে। ঘরে আমি যাব না।

খবরদার। বলিয়া কীর্তিনারায়ণ হুঙ্কার ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। তোমার গুরুর দোহাই, কক্ষনো হারতে পারবে না।

বধূ জেদ ধরিল, হারব-ই। এক্ষুণি যদি তুমি নেয়ে এসে খাওয়া-দাওয়া না কর, এই আমি বসে রইলাম—উঠব না, হেরে যাব।

বলিয়া পরম নির্ভয়ে কীর্তিনারায়ণের সামনে সে আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিল।

কীর্তিনারায়ণ কিছু নরম হইয়া কহিল, শপথ করেছি যে—

হোক গে শপথ।

নড়িয়া চড়িয়া বধূ আরো ভালো হইয়া বসিল।

বলপরীক্ষা মুলতুবি রাখিয়া অগত্যা কীর্তিনারায়ণকে স্নানে যাইতে হইল।

তারপর কোনগতিকে গোগ্রাসে ভোজন সারিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, চল এইবার—

স্বর্ণ বলিল, ঠিক তুমি জিতবে। তোমার সঙ্গে কি পারি? সকাল থেকে খাওয়া-দাওয়া করনি, কেবল খেটে বেড়িয়েছ—তাই অতক্ষণ লড়তে পেরেছিলাম।

স্বামী কিন্তু বিশেষ ভরসা পাইল না। চিন্তিত মুখে বলিল, দেখি তো—

জয় সত্যসত্যই অতি অভাবিত ভাবে হইয়া গেল। দু'টা কি তিনটা ধাক্কা দিয়াছে, দড়াম করিয়া দরজা খুলিল। টাল সামলাইতে না পারিয়া কীর্তিনারায়ণ মেজের উপর পড়িয়া গেল।

বধূ খাটের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া আছে। বলিল, হেরে গেলাম।

কিন্তু হারিয়া যে রকম মুখভাব হইবার কথা, মোটেই তাহা নয়। বরঞ্চ যেন সন্দেহ হয়, সে টিপিয়া টিপিয়া হাসিতেছে।

কীর্তিনারায়ণ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিতে লাগিল। তারপর গর্জিয়া উঠিল, বিশ্বাসঘাতক! যা বললে, তাই-ই করলাম! শপথ ভাঙলাম, স্নান করলাম, খেলাম, আর শেষকালে কি না—

চোখ ফাটিয়া জল আসিতে চাহিল। বলিল, এটা কি তোমার

উচিত হল সুবর্ণলতা—আশা দিয়ে নিরাশ করা? ফাঁকে ফাঁকে জিতবার মতলব! আচ্ছা তুমি না হয় বাইরে যাও—আমি দুয়োর চাপি।

না, দুয়োর দেব। সুবর্ণলতা দরজা ভেজাইয়া দিয়া আদেশের ভঙ্গিতে কহিল, উঠে এস। ধুলোয় থেক না বলছি।

কীর্তিনারায়ণ গুম হইয়া বসিয়া রহিল। বলিল, না—

এস—বলিয়া সুবর্ণলতা হাত ধরিতেই এক ঝটকায় সে হাত ছাড়াইয়া লইল। সঙ্গে সঙ্গে হো-হো করিয়া হাসি। রাগ-অভিমান কোথায় চলিয়া গেল, বিপুল উল্লাসে কীর্তিনারায়ণ হাসিয়া ফাটিয়া পড়িতে লাগিল। বলিল, এইবার তুমি সত্যি সত্যি হেরেছ সুবর্ণলতা। দেখ, হাত ছাড়িয়ে নিলাম, রাখতে পারলে না।

সন্ধ্যা গড়াইয়া গিয়াছে। কোথায় শিউলিফুল ফুটিয়াছে, তার গন্ধ আসিতেছে। পূজা-বাড়িতে ঢাক-ঢোল বাজিয়া উঠিল। অমনি নাটমণ্ডপের দিক দিয়া শত শত কণ্ঠের কোলাহল—

ছোট হুজুর! ছোট হুজুর!

কীর্তিনারায়ণ চমকিয়া বলিল, আমি যাই।

কোথায়?

আজ বীরাষ্টমী। আজকের দিনে বরাবর আমি একটু লাঠি নিয়ে বেরুই। হাজার হাজার লোক দেখতে আসে। ঐ তারা সব ডাক দিচ্ছে।

মহা উৎসাহে সে উঠিয়া দাঁড়াইল।

বধূ বলিল, বা রে! সবাই পূজোর দালানে গেছে, একলা এই পুরীর মধ্যে—আমার ভয় করবে না বুঝি?

মুখ ফিরাইয়া কীর্তিনারায়ণ হাসিল। বলিল, এমন ভীরু—ছিঃ। আর এক দফা হার হয়ে গেল কিন্তু।

তখন সুবর্ণ ঝাঁপাইয়া স্বামীর বুকে পড়িয়া সজল চক্ষে কহিল, সবাই ওঁরা ফিরে আসুন, তারপর তুমি যেও। এখন আমি যেতে দেব না—যাও দিকি, কেমন—

হাজার লোকে অধৈর্য হইয়া মুহুর্মুহু বাহিরে ডাকাডাকি করিতেছে। বাহু-বেষ্টনে বন্দী পালোয়ান কি আর করিবে—ধীরে ধীরে খাটের উপরে আসিয়া বসিল। জল-ভরা মুখের উপর মধুর হাসি হাসিয়া স্ুবর্ণলতা কহিল, ও বীরপুরুষ, হার হল কার?

চিন্তিত মুখে কীর্তিনারায়ণও তাই ভাবিতেছে, তাই তো, এ হইল কি? এতদিন ধরিয়া এত শিখিয়া এত লোককে হারাইয়া আসিয়া শত্রুপক্ষের মেয়ের কাছে অবশেষে হার হইয়া যায় নাকি?

অন্দর সদর-বাড়ির মধ্যে যে উঠান, বিশ-পঁচিশ জন সেই অবধি ধাওয়া করিয়া আসিল। একেবারে কীর্তিনারায়ণের জানালার নিচে আসিয়া ডাকাডাকি লাগাইল, ছোট হুজুর!

সে এমন কাণ্ড, মরা মানুষও নড়িয়া চড়িয়া ওঠে। কিন্তু নিরুপায়, কীর্তিনারায়ণ বিপন্ন চোখে স্ুবর্ণর দিকে চাহিয়া চুপ রহিল।

স্ুবর্ণলতা পরম নির্বিকার। এত যে চিৎকার, তার যেন কিছুই কানে যাইতেছে না। বাঘা চৌধুরির মেয়ে সে—বাঘে-গরুকে একঘাটে জল খাওয়াইয়া ছাড়িতেন যিনি। সেই চৌধুরির সকল ইজ্জত এরাই ডুবাইয়া দিয়াছে, নরহরিকে আজ একরকম বিবাগী বলিলেই হয়। মা ও ছেলে এ ব্যাপারে কেউই কম যান নাই। আজ স্ুবর্ণলতা কি হাসিমুখে সেই শত্রুতার প্রতিশোধ লইতে বসিয়াছে?

কীর্তিনারায়ণ বিরক্ত হইয়া কহিল, ওগো শুনতে পাচ্ছ?

নিতান্ত ভালমানুষের মতো বধূ বলিল, ইচ্ছে যদি হয় তো চলে যাও—

কীর্তিনারায়ণ রাগিয়া উঠিল। স্বরের অনুকৃতি করিয়া কহিল, ইচ্ছে যদি হয়···। মুখে তো দিব্যি বলে দেওয়া হল—কিন্তু হাত দিয়ে বেড়া দেওয়া, ইচ্ছেটা হয় কি করে?

কালো কৌতুকচঞ্চল চোখ দু'টি নাচাইয়া স্ুবর্ণ বলিল, হাত ছাড়িয়ে যাও। পার না? এই জোরের বড়াই করে বেড়াও? ও মহাবীর, এই মুরোদ?

কীর্তিনারায়ণের শিরার মধ্যে রক্ত চনচন করিয়া উঠিল। ভাবিয়াছে কি মেয়েটা? চলিয়া যাওয়া যায় কিনা, একটু দেখাইয়া দিবে নাকি? কিন্তু তা পারিয়া উঠিল না। কথায় কথায় এত খোঁচাইয়া জ্বালাইয়া মারে, তবু মুখখানার দিকে তাকাইয়া মায়া হয় বড়। শুভ্র নিটোল সুকোমল অঙ্গ—একটা আঙুলের ভর সহে না, রক্ত যেন ফাটিয়া পড়ে। এমন অসহায় যে মানুষ—কি করিয়া তার উপর শোধ লওয়া যায়, ভাবিতে গিয়া লাঠিয়াল বর দিশেহারা হইয়া উঠিল। ভাবিল, দূর হোকগে ছাই—কি-ই বা বোঝে সুবর্ণ, আর কি-ই বা বলে! আর হাত সে স্বচ্ছন্দে ছাড়াইয়া লইতে পারে, তাহা তো আগেও দেখিয়াছে। হারিয়া যে হার স্বীকার করে না, তার কথায় রাগ করা বৃথা। জানালায় মুখ বাড়াইয়া নিচের লোকদের বলিয়া দিল, আমি যাব না—তোমরা যাও।

সুবর্ণলতা তখন স্বামীকে ছাড়িয়া একটু দূরে চৌকির উপর গিয়া বসিল। আলতা-পরা পা দু'খানি আপন মনে দোলাইতে লাগিল, আর টিপিটিপি হাসি। অর্থাৎ পারিলে না তো?

রাগ আর কত সামলান যায়! এক লাফে কীর্তিনারায়ণ সোজা হইয়া দাঁড়াইল। মুখের দিকে চাহিয়া রুক্ষ স্বরে কহিল, হাসছ যে?

আমার রোগ।

রোগ সেরে দিতে পারি, বুঝলে? কীর্তিনারায়ণ গর্জিয়া উঠিল, চাঁদমুখ থেকে হাসি নিঙড়ে মুছে দিতে পারি। এমন করতে পারি, কান্নায় পথ দেখতে পাবে না।

মেরে? তা তুমি পার। তখন এমন করলে, দিদি তো কেঁপেই খুন। বাবা গো বাবা, এত ভয় মালতী-দিদির? তোমাদের সবারই বড় ভয়।

বলিবার ভঙ্গিটি এমন, রাগিয়া থাকাও মুশকিল।

কীর্তিনারায়ণ বলিল, আশ্চর্য! তোমার কিন্তু একফোঁটা ভয় নেই। চৌধুরি-বাড়ির মেয়ে কি না! কিন্তু আমি মারব-টারব না—

এখান থেকে শুধু চলে যাচ্ছি—তুমি একলা-একলা বসে ঢোলের বাজনা শোন আর হাস—

বলিল বটে, কিন্তু যাইবার ভাব নয়। এক মুহূর্ত নীরবে বধূর মুখে চাহিয়া আবার আরম্ভ করিল, শুনি, চৌধুরি মশায় আর রঘুনাথ মিলে কুস্তি-কসরৎ শিখিয়ে বীর কন্যে তৈরী করেছেন। নাটমণ্ডপে ঐ তো হাজার মানুষ হল্লা করছে আর একটুখানি একলা থাকা যায় না? এখানে সাপ না বাঘ?

সুবর্ণ বলিল, ভূত—

সদম্ভে কীর্তিনারায়ণ বলিতে লাগিল, ভূতের বাপের সাধ্য নেই বরণডাঙার দেউড়ি পার হবে। ভূত-টুত পিশে গুঁড়ো করে দেব না? নতুন এসেছ এখানে—আমাদের প্রতাপ জান না তো!

তবু সুবর্ণর কণ্ঠস্বরে ভয় যেন উছলিয়া পড়িতে লাগিল। বলিল, আমি যে দেখছি, সত্যি—নিজের চোখে—

চোখে নয় মনে। বাপের বাড়ি থেকে সঙ্গে করে নিয়ে এসেছ। …কোথায় কি দেখছ? দেখাও দিকি।

এস। দেয়ালে বিলম্বিত আয়নার কাছে বধূ তৎক্ষণাৎ স্বামীকে ভূত দেখাইয়া দিল। তারপর হাসিয়া লুটোপুটি।

তখনই আবার হাসি থামাইল। তাকাইয়া দেখে, কীর্তিনারায়ণের মুখ কি রকম হইয়া গেছে, চোখে জল আসিবার মতো। ভারি অপ্রতিভ হইয়া গেল, ভয়ও হইল একটু। তাড়াতাড়ি কাছে গিয়া মুখের নিচে মুখটি নামাইয়া বলিতে লাগিল, রাগ করলে? ঠাট্টা বোঝ না—একটা ঠাট্টা গো। ভূত কাকে বলে জান মশায়?

অভিমানে অপমানে কীর্তিনারায়ণের ওষ্ঠ দু'টি স্ফুরিত হইতেছে। বলিল, না—জানি নে। কিন্তু এটা জানি, হক-না-হক তুমি আমার মান-মর্যাদা নষ্ট করে আমোদ পাও। শ্যামগঞ্জ আর বরণডাঙার চির-শত্রুতা, সবাই জানে। কেউ কাউকে কসুর করে নি। এবার আর কোনদিকে সুবিধা না পেয়ে চৌধুরি মশায় মেয়ে লেলিয়ে

দিয়েছেন। বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে তিনি এসেছিলেন, আমরা নই। রাগ তুমি কার উপর দেখাও সুবর্ণলতা?

কিসে কি আসিয়া গেল, সুবর্ণ একেবারে এতটুকু হইয়া গেল। কীর্তিনারায়ণ বলিতে লাগিল, আমি ভূত কি আর-কিছু—একফোঁটা মেয়ে, তুমি তার জানবে কি? জিজ্ঞাসা করে দেখো তোমার বাবাকে, জিজ্ঞাসা করে এস তিনটে জেলার মধ্যে যে যেখানে আছে, আর জিজ্ঞাসা করগে ঐ বাইরে যারা হল্লা করে মরছে—

কিন্তু বেশিক্ষণ দমিয়া থাকার মেয়ে সুবর্ণ নয়! আ-হা—বলিয়া সে মুখ ঘুরাইয়া লইল। আবার চাপা হাসি-ভরা উজ্জ্বল মুখে স্বামীর দিকে তাকাইল। বলিল, পুরুষের একেবারে মান গিয়েছে! আর নিজে যে আমায় যা-তা এক ঝুড়ি অপমান করছেন—আমি যদি রাগ করি?

বিস্মিত হইয়া কীর্তিনারায়ণ প্রশ্ন করিল, আমি অপমান করেছি তোমায়? কি বলেছি—বল?

সুবর্ণ দস্তুরমতো ঝগড়া আরম্ভ করিল, আর কি বলবে শুনি? আমি একফোঁটা মেয়ে—তার মানে, কোন কাণ্ডজ্ঞান নেই—একদম গাধা। আর বাবা আমায় লেলিয়ে দিয়েছেন—মানে, আমি কুকুর। আর আমার ভয় বড্ড বেশি—মানে বাবার নাম ডোবাচ্ছি। আর কোনটা বলতে বাকি রাখলে?

এ সব আমি বলেছি?

গম্ভীর মুখে সুবর্ণ বলিল, না বলে থাক মানে তো দাঁড়াল ওই—

খুব মানে বোধ হয়েছে। না—না—ওর হয়তো আবার মানে হয়ে যাবে, আমি নির্বোধ বললাম। মহা মুশকিল দেখছি। এই রকম উল্টো মানে করলে যে কথা বলাই দায়!

বিব্রত মুখে কীর্তিনারায়ণ চুপ করিল।

সুবর্ণলতা বলিল, আর নিজে বড্ড সোজা মানে ধরেন কিনা! শোন তবে, ভূত বললাম কেন।

ঠোঁটে ঠোঁট চাপিয়া এক মুহূর্ত বোধকরি গল্পটি ভাল করিয়া

রচিয়া লইল। বলিল, বিয়ের দিন সমস্ত বেলা না খেয়ে বসে বসে ঝিমুচ্ছি, বাবা চুলের মুঠি ধরে হিড়-হিড় করে টেনে নিয়ে গেলেন, দেখ্ হারামজাদী, তোর বরের কাণ্ড। উঠোনে দেখতে পেলাম, অগুন্তি মাথা—চেঁচিয়ে বাড়ি ফাটাচ্ছে। আমি বললাম, কই বাবা, ও তো ভূতপ্রেতের দল। ঠাস করে গালে এক চড় কসিয়ে বাবা বললেন, ওরে কাণি ঐ দেখ—। আমি তা বুঝব কি করে? মানুষে বিয়ে করতে যায় চেলী-টোপর পরে দিব্যি কার্তিক ঠাকুরের মতো। লাঠি হাতে মালকোঁচা মেরে হাঁউ-মাঁউ-খাঁউ করতে করতে যাওয়া—ওসব তো ভূতের কাণ্ড।

বলিয়া নিতান্ত ভালোমানুষের মতো মুখ করিয়া রহিল।

নিজের বীরত্বের কথায় মেঘ কাটিয়া কীর্তিনারায়ণের মুখ প্রসন্ন হইল। তা ছাড়া একটু আগেই নাকি মনের ঝাল ঝাড়িয়া অনেক কিছু বলিয়া ফেলিয়াছে, সুবর্ণলতা কিছুই গায়ে লয় নাই, সেই শ্লেষের বাক্যগুলি এখন ফিরিয়া আসিয়া তাকেই মনে মনে লজ্জা দিতে লাগিল। ক্ষীণ হাসি হাসিয়া কীর্তিনারায়ণ বলিল, তা হলে একা আমারই কপাল ফাটে নি? চুলের উপর, গালের উপর তোমারও কিছু কিছু ঘটেছিল? অত রাগ তাই আমার উপর?

রাগ অনেক রকমের। এক নম্বর—। বলিতে বলিতে হাস্যমুখী তরুণীর চোখে বুঝি এতক্ষণে দুই বিন্দু অশ্রু ঝকমক করিয়া উঠিল। বলিল, এক নম্বর—তোমরা আমার বাবাকে জেলে দিয়েছিলে, সে তাঁর মরার বাড়া। বেরিয়ে এসে—কেবল ঐ আমার বিয়ের দিনটি ছাড়া, কেউ কোন দিন তাঁকে হাসতে দেখে নি।

গম্ভীর স্বরে কীর্তিনারায়ণ বলিল, কিন্তু তার আগে চিন্তামণি-ওস্তাদকে ঘায়েল করেছিলে তোমরা—সেটা ভুলো না। আমার চিন্তামণি-দাদা!

স্বর্গগত ওস্তাদের উদ্দেশ্যে দুই হাত জোড় করিয়া কীর্তিনারায়ণ প্রণাম করিল।

যেন কি হইয়াছে—ঘুরিয়া ফিরিয়া কেবলি পাঁক উঠিয়া পড়ে।

যেন আদালতে দুই পক্ষে সওয়াল-জবাব চলিয়াছে। সুবর্ণলতা চুপ করিল। কিন্তু নীরবতা আরও বিশ্রী। হাসিয়া জোর করিয়া কণ্ঠে তরলতা আনিয়া বধূ আরম্ভ করিল, আর দুই নম্বর—চৌধুরি-উঠোনে তোমরা জকার দিয়ে এলে। শ্যামশরণের আমলে শুনেছি নবাবের লোক হাতী-ঘোড়া নিয়ে এসে ফিরে গিয়েছিল, ঢুকতে পারে নি। তুমি তাই করে এলে, সহজ লোক তুমি? আর, তিন নম্বর—কথায় কথায় চটে ওঠ, যা চুকে-বুকে গেছে তাই নিয়ে খোঁটা দাও, হার মানলেও আমার সঙ্গে লড়তে এস।

হঠাৎ কৃত্রিম ক্রোধে তর্জনের ভাবে সুবর্ণলতা বলিয়া উঠিল, দেখ, মানা করে দিচ্ছি। আর ফের যদি ঐ রকম করবে কোনদিন—তা হলে, তাহলে—

তাহা হইলে কি যে করিবে চারিদিকে তাকাইয়া সাব্যস্ত করিবার চেষ্টা করিল। বলিল, তাহলে এই তোমার গলায় ঝুলে পড়ে চোখ বুজে মরে থাকব।

সমস্ত ঝগড়া দ্বন্দ্ব মিটাইয়া এক মুহূর্তে নিবিড় বাহু-বেষ্টনে বধূ প্রিয়তমের কণ্ঠ বাঁধিয়া চোখ বুজিল।

লোকেরা গিয়া খবর দিল, ছোট হুজুর আসিবেন না। কেন? সে কথা জিজ্ঞাসা করিতে তাদের সাহসে কুলায় নাই। ভানুচাঁদ নাছোড়বান্দা লোক। এত মানুষ-জন আসিয়াছে, ছোট হুজুর বুক ফুলাইয়া সকলের মধ্যে না দাঁড়াইলে কিছুতে সে শান্তি পাইবে না। একাকী সে পুনরায় তত্ত্ব হইতে আসিল।

শরীর-গতিক ভাল আছে তো ছোট হুজুর?

কীর্তিনারায়ণ উত্তর দিল, তোমরা যা পার, কর গিয়ে ভানু। আমার যাওয়া হবে না—মাথা ধরেছে।

বলিয়া খাটের উপর চুপচাপ শুইয়া পড়িল।

এই বীরাষ্টমীর দিনটি বিশেষ একটা দিন। শুইয়া শুইয়া কীর্তিনারায়ণের কত কথা মনে হইতে লাগিল। বউভাসির চক লইয়া

যখন নরহরির সঙ্গে বড় বাধিয়া ওঠে, আদালতে মিথ্যার জিত হইল—মায়ের আর চিন্তামণির মুখে দীপ্যমান অপমানের অগ্নিশিখা এখনো সে মনে করিতে পারে। মা আজ ধর্মকর্ম লইয়া মাতিয়া আছেন; দেবতা-গোঁসাই ছাড়া সংসারের কুটাগাছির খবর রাখেন না। আজিকার ভক্তিস্নিগ্ধ তদ্গত মুখখানি দেখিয়া কিছুতে প্রত্যয় হইবে না, ইনি সেই সে-আমলের সৌদামিনী ঠাকরুন। কীর্তিনারায়ণের বয়স তখন আর কতটুকুই বা। এমনি এক বীরাষ্টমীর দিন—সেদিন আবার ঝড়বৃষ্টি বড় চাপিয়া পড়িয়াছে, তারই মধ্যে সৌদামিনী ছোট্ট ছেলেকে চিন্তামণি-ওস্তাদের সঙ্গে ঠেলিয়া নাট-মণ্ডপে পাঠাইয়া দিলেন। পিছে পিছে নিজেও চলিলেন। চিন্তামণি সস্নেহে কহিল, ভয় কিসের কর্তা-ভাই? লাঠি ধর, এই এমনি করে। লাঠি সে ধরিতে গেল। মা গর্জন করিয়া উঠিলেন, আগে গুরুবন্দনা কর। গুরুবন্দনা করিতে গেলে ফুটফুটে কোমল অতি-সুন্দর বালককে চিন্তামণি তার লোহার দেহে জড়াইয়া ধরিল। সে গুরু নাই, সে আমলের নাম-করা লাঠিয়ালদের ক'জনই বা আছে! কিন্তু প্রথম দিনের সে লাঠিখানা আজও রহিয়াছে। প্রতি বৎসর এই দিনটিতে নাটমণ্ডপে দাঁড়াইয়া সে দেবী-প্রণামের সঙ্গে সঙ্গে গুরুর নামে জকার দিয়া তারপর সেই লাঠিখানি উঁচু করিয়া তুলে। দূর-দূরান্তর হইতে মানুষ কীর্তিনারায়ণের লাঠিখেলা দেখিতে আসে, বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তারা তাকাইয়া দেখে। এবং যে-লোকে আজ গুরু চিন্তামণি সাঙ্গোপাঙ্গো লইয়া লাঠি-বাজি করিয়া বেড়াইতেছে, আকাশ ভেদ করিয়া বোধকরি সেই অবধিও তার জকার পৌঁছিয়া যায়। তিন সালে এই পূজার সময়টা প্রবল বান ডাকে, রাস্তার উপর হাঁটু-জল; রোয়াকে বসিয়া ছিপ ফেলিয়া লোকে পুঁটিমাছ ধরিতে শুরু করিয়াছিল। সেবারেও বাদ যায় নাই, লাঠি মাথায় করিয়া জল ঝাঁপাইয়া আসিয়া কীর্তিনারায়ণ জনহীন নাটমণ্ডপে গুরুবন্দনা সারিয়া গিয়াছিল।...কিন্তু ভীরু মেয়েটা আজ এমন গণ্ডগোল বাধাইল যে কি করিবে কীর্তিনারায়ণ ভাবিয়া ঠিক করিতে

পারে না। মাথাধরার ছুতা করিয়া অন্ধকার মুখে সে পাশ ফিরিয়া শুইল।

ইহাতেও নিস্তার নাই। সুবর্ণ বলিল, ডাহা মিথ্যে কথাটা বললে?

ও-পক্ষ নিরুত্তর। সুবর্ণ বলিতে লাগিল, মাথা তো ধরি নি, গলার ঐখানটা ধরেছিলাম শুধু। খিলখিল করিয়া হাসিতে লাগিল।

গুড়-গুড় করিয়া ঢোল বাজিয়া উঠিল। লাঠির ঠকাঠক ও সহস্রের বাহবা ধ্বনি একটা মহল পার হইয়া আসিয়া কীর্তিনারায়ণের বুকের মধ্যে মুগুর মারিতে লাগিল। উঠিয়া বসিয়া অধীর হইয়া বলিল, আমার মাথা ধরেছে, তেষ্টা পাচ্ছে, বুক কাঁপছে, হাতদুটো কামড়ে খেতে ইচ্ছে হচ্ছে। সব হচ্ছে। আর ইচ্ছে হচ্ছে, জানালা দিয়ে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করি। দোহাই তোমার, তুমি হেসো না অমন করে।

বালাই! হাত কামড়ে খায় কখনো? জল আনছি।

বলিয়া দুষ্ট চাহনি চাহিতে চাহিতে সুবর্ণলতা বাহির হইয়া গেল। গেল তো গেল আর আসিবার নাম নাই।

বাহিরে অবিরত আনন্দ-কোলাহল। কান আর পাতা যায় না।

দুত্তোর—বলিয়া কীর্তিনারায়ণ জোরে জোরে পায়চারি করিতে লাগিল। তারপর আরও খানিকক্ষণ পরে এক পা দু' পা করিয়া সিঁড়ি বাহিয়া নামিতে লাগিল। উঠান পার হইয়া ধীরে ধীরে নাটমণ্ডপের সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

জনতা জকার দিয়া ওঠে। ভানুচাঁদ সঙ্গে সঙ্গে সসম্ভ্রমে কীর্তিনারায়ণের দিকে লাঠি আগাইয়া ধরিল। কোলাহল মুহূর্তে একেবারে নিস্তব্ধ। কারও চোখে বোধ করি পলক পড়িতেছে না।

বিনোট—এই খেলার নাম। দেখিয়া মুগ্ধ হইবারই মতো। লাঠি তার হাতের মুঠায় আসিয়া যেন অকস্মাৎ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে; ডাহিনে বামে মাথার উপর পায়ের নিচে লাঠিই যেন আপন ইচ্ছায় অতিদ্রুত চলাফেরা করিতেছে। কীর্তিনারায়ণ ঘুরাইতেছে না, আলগোছে কেবল যেন তার ডান হাতখানির উপর রহিয়াছে।

লোকের চোখে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে লাঠি, বোঁ-ও-ও মৃদু মনোরম একটা আওয়াজ শোনা যাইতেছে।

ভানুচাঁদ একটু দূরে গিয়া কীর্তিনারায়ণকে তাক করিয়া ঢিল ছুঁড়িল। লাঠির গায়ে গুঁড়া-গুঁড়া হইয়া ঢিল মাটিতে ছড়াইয়া পড়িল। দেখাদেখি আরও অনেকে ছুঁড়িতেছে, নানা দিক হইতে ঢিল আসিয়া পড়িতেছে। একটিও কীর্তিনারায়ণের গায়ে কেহ লাগাইতে পারিল না। লাঠির উপর পড়িয়া ঠক-ঠক শব্দ হইতেছে, কোনটি ছিটকাইয়া কোন কোনটি ভাঙিয়া ধূলি হইয়া পড়িতেছে। 'বাহবা' 'বাহবা' রব উঠিল চারিদিকে—জন-সমুদ্র আনন্দে উচ্ছ্বসিত হইল।

কিন্তু একি! ঢিল নয়—স্থলপদ্মের একটি গুচ্ছ মাথায় আসিয়া পড়িয়াছে উপরের দিক হইতে। উপর হইতে আক্রমণ হইবে, আন্দাজ করিতে পারে নাই। অতিথিশালার ছাতের উপর মেয়েদের জায়গা—সেইখান হইতে আসিল নাকি? দেবীর নির্মাল্য বলিয়া মনে হইতেছে। রক্ষা, মাথায় পড়িয়াছে—মাটিতে পড়িয়া খেলার এই উন্মত্ত ঝোঁকে পদপিষ্ট হইয়া যায় নাই। কে ফেলিল? মা পূজার ঘরে এখনো। মালতী? কিংবা ঘোমটা-ঢাকা পরম লজ্জাবতী ঐ যে একজন দেয়ালের ধারে গুঁটিসুটি হইয়া আত্মগোপনের চেষ্টা করিতেছে? কখন আসিল স্বর্ণলতা? জল আনিতে গিয়া এইখানে আসিয়া পড়িয়াছে তাহা হইলে! ফুলের আঘাত করিয়া সে হারাইয়া দিল, না—ফুল দিয়া অভিনন্দন জানাইল তাকে? মীমাংসা হওয়ার দরকার।

বিনোট চলিতে থাকুক, এ কাহিনীর আমি এইখানে আপাতত ছেদ টানিয়া দিলাম। ইহারা সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকুক—রূপকথার শেষে যে রকমটা হইয়া থাকে। আমার তো মনে হইতেছে, রূপকথাই শুনাইয়া আসিলাম এতক্ষণ ধরিয়া।

খরস্রোতে যুগ বহিয়া চলিয়াছে—জোয়ার-প্রমত্ত মালঞ্চ কত ক্ষীণবেগ ইহার তুলনায়। স্রোতের খড়কুটার মতো পাশে ঠেলিয়া

দিয়া গিয়াছে অতীতের মানুষ, অতীত-মানুষের ঘর-বাড়ি, আশা-আনন্দ-সাধনা। সেই মানুষগুলির পরমতম কাম্য পরের নবীন দলের নিকট সারহীন কল্পনা-বিলাস বলিয়া ঠেকে। অতীত স্মৃতির কয়েকটি টুকরা আমি এই সাজাইয়া-গুছাইয়া ধরিলাম উদ্ধত জীবন্ত বর্তমানের সামনে। সেকালের ইহাদের রূঢ় বাস্তবতা যুগান্তরে ক্ষয়িত হইয়া গিয়া কুহেলিকায় সমাচ্ছন্ন হইয়া মধুর স্বপ্নটুকুই কেবল উত্তর-পুরুষের জন্য রহিয়া গিয়াছে। মানুষের জীবনে একদা সত্য-সত্যই এরূপ ঘটিত, তোমাদের হয়তো বিশ্বাস হইবে না। বিশ্বাস না হউক, একেবারে মন্দ লাগিবার কথা তো নয়।

রাষ্ট্রিক রদবদলের আঘাত তখনও দেশের স্নায়ু-কেন্দ্রে পৌঁছে নাই। শুধু দু-চারিটি জানাশোনা গ্রাম এবং চেনা-জানা মানুষগুলি লইয়াই সমাজ। দূরের হাওয়া—বাহিরের কথাবার্তা একটু আধটু হয়তো আসিয়া পৌঁছে, কিন্তু মন অবধি পৌঁছে না। তারপর তরঙ্গ আসিয়া পড়িল। দীর্ঘদিনের জীবনব্যবস্থা টলমল করিয়া উঠিল। সেই তরঙ্গ-বিস্তার আজ তো চোখের উপরেই দেখিতেছি। আমরা দুলিতেছি, ভাসিতেছি, অশ্বের মতো বল্গা পরাইয়া তার উপর আধিপত্য লাভের চেষ্টা করিতেছি। পরবর্তী এ সব কথা শুনিতে চাও তো আবার একদিন আসর করিয়া না হয় শুনাইয়া যাইব।

নরবাঁধ

ছোটকাকার বিয়ের বরযাত্রী হইয়া চলিয়াছিলাম। ত্রিশ ক্রোশ পথ পায়ে হাঁটিয়া কানাইডাঙার ঘাটে নৌকা চাপিতে হইবে।

সে আজিকার কথা নয়, তখন বয়স আমার নয় কি দশ। এই উপলক্ষে বেগুনি রঙের ছিটের জামা এবং একজোড়া মোজাজুতা কেনা হইয়াছে। সেই নূতন জামা গায়ে দিয়া অতি সন্তর্পণে পথ চলিতেছি, ধূলা না লাগে। আর আর ছেলেরা যাইতেছিল, তাহাদের বেগুনি জামা নাই, অনুকম্পার সহিত মাঝে মাঝে তাহাদিগকে তাকাইয়া দেখিতেছি। মেঠো পথে খারাপ হইয়া যাইবার আশঙ্কায় জুতাজোড়া পরিতে মন সরে নাই, খবরের কাগজে জড়াইয়া বগলে লইয়াছি। বরের পাল্কি ও বাজনদার আগে আগে চলিয়া গিয়াছে, পিছনে পড়িয়া আমরা। ক্রমে বেলা পড়িয়া আসিল। ডোঙাঘাটা ছাড়াইলাম, তারপর সাগরদত্তকাটি গ্রামের খেজুরবন, তারপর ভাঙা-মসজিদ, সারি সারি তিনটা তেঁতুলগাছ, শেষে কুমোরপাড়ার বড় বাঁশবাগানটা পার হইয়া একেবারে ফাঁকা বিলের মধ্যে।

ধানের সময়। ধানবন ওপারের গাছপালার গোড়া অবধি চলিয়া গিয়াছে, ধানের গোছায় কোনখানে বিলের জল দেখিবার উপায় নাই। আর দেখিলাম, তেপান্তর ভেদ করিয়া উত্তর-দক্ষিণে সোজাসুজি সারবন্দি চলিয়া গিয়াছে বড় বড় শিরিষ গাছ। বিলের মধ্যে অমন করিয়া গাছ পুঁতিয়া রাখিয়াছে কে? বড় আশ্চর্য লাগিল।

দ্বারিক দত্ত গ্রাম সম্পর্কে ঠাকুরদাদা, বুড়া লাঠি ঠক ঠক করিয়া পাশে পাশে যাইতেছিলেন। কথাটা জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি কহিলেন, শুধু কি গাছ? এইটুকু এগিয়ে আয়, দেখবি কত্তো বড় রাস্তা। বল্লভ রায়ের নাম শুনিস নি?

নামটা বরাবরই শুনিয়া থাকি, সেই রাস্তার উপর দিয়া তবে আজ যাইতে হইবে।

রাস্তার উপর গিয়া যখন উঠিলাম, বিস্তার দেখিয়া সত্যসত্যই তাক লাগিয়া গেল। দত্তবুড়াকে পুনরায় কি একটা প্রশ্ন করিতে যাইতেছিলাম, কিন্তু দেখি হাতের লাঠিটা ফেলিয়া একটা শিরিষ-গাছের গোড়ায় বসিয়া পড়িয়া ইতিমধ্যেই তিনি ভাবে গদগদ হইয়াছেন। বলিতে লাগিলেন, দেখেছ ভায়ারা, লক্ষ্মী ঠাকরুণের দয়াটা একবার দেখ। মরি মরি, যেন দুহাতে ঢেলেছেন।···এই পুঁটিমারির বিলে আমার লাখেরাজ ছিল আড়াই বিঘে। সে কি আজকের? রূপচাঁদ রায়ের দত্ত দেবোত্তর। নিবারণ চক্কোত্তি ডাহা ফাঁকি দিয়ে নিলে। ওর ভাল হবে কখনো।

মন্মথচরণ কহিল,—আবার বসে পড়লেন কেন দত্তমশায়? চলুন—চলুন, জায়গা খারাপ, আঁধার না হতে এতটুকু পার হতে হবে।

দত্ত মহাশয় আঙুল দিয়া আর একটা গাছের গোড়া নির্দেশ করিয়া কহিলেন, ও মন্মথ, তুমিও একটুখানি বসে নাও না। ছোট ছোট ছেলেপিলে হাঁটিয়ে নিয়ে যাচ্ছ, না জিরিয়ে নিলে ওদের হাঁপ ধরে যাবে যে।

বলিয়া বুড়া নিজেই প্রবল বেগে হাঁপাইতে লাগিলেন।

কিন্তু সকলে সমস্বরে না—না করিয়া দত্তের প্রস্তাবটা উড়াইয়া দিল।

সে কি করে হবে? নরবাঁধ পার না হয়ে বসাবসি নেই। লাখ টাকা দিলেও রাত্তিরবেলা অশ্বত্থতলা দিয়ে যাওয়া যাবে না। তাড়াতাড়ি হেঁটে চলুন মশাইরা সব। তাড়াতাড়ি, খুব তাড়াতাড়ি—আরো।—

ফলে উলটা-উৎপত্তি হইল। বিশ্রাম তো পড়িয়া মরুক, ইহার পর যে কাণ্ড আরম্ভ হইল, তাহাকে হাঁটিয়া যাওয়া কোনক্রমে বলা চলে না। ছোট বড় গুণতি করিয়া আমাদের দলে বরযাত্রী জন চল্লিশের

কম হইবে না। এবার একা দ্বারিক দত্ত নয়, সকলেই দস্তুরমতো হাঁপাইতে লাগিল।

হরিজেঠা আসিয়া আমার হাত ধরিলেন। বলিলেন, শিবু, আর একটু—উই যে সামনে মস্ত উঁচুমাথা অশ্বত্থগাছ—ঐ ঐ, ঐখানে। নরবাঁধটা পার হয়ে তারপর আস্তে আস্তে চলব।

আমার কান্না পাইতেছিল। বলিলাম, আর কতদূর?

জেঠা বলিলেন, কানাইডাঙা? পথ আর বেশি নেই। নরবাঁধের পর বাঁয়ে একটা ভাঙাড়—সেইটা দিয়ে রসিটাক এগুলে গাঙ পড়বে।

সন্ধ্যার আগেই বড় একটা খালের ধারে পৌঁছান গেল। জেঠা বলিলেন, এই নরবাঁধ। এদিক ওদিক তাকাইয়া দেখি, বাঁধের চিহ্ন কোন দিকে কিছু নাই, কেবল খালটি মাত্র। লাখ টাকা দিলেও রাত্রিবেলা যে অশ্বত্থতলা দিয়া এই চল্লিশটা মানুষ একসঙ্গে যাইতে স্বীকার করিবে না, সেই গাছটি দেখিলাম। কেন যে সকলের এত ভয়, ডালপালা-মেলা সুপ্রাচীন গাছের চেহারা দেখিলে তৎক্ষণাৎ বোঝা যায়। আমার তো সেই দিনের বেলাতেই গা ছম-ছম করিতে লাগিল।

সকলে কাপড়-জামা খুলিয়া পুঁটুলি বাঁধিয়া লইল। আমি হরি জেঠার কাঁধে চড়িলাম এবং আমার কাঁধে কাগজে-মোড়া সেই নূতন জুতাজোড়া। জিজ্ঞাসা করিলাম, জেঠা, বাঁধ কই?

দুইধারে বাঁশের খোঁটা পোঁতা, তাহার মধ্যে দিয়া জল ভাঙিয়া সকলে চলিয়াছি। সেই বাঁশ দেখাইয়া জেঠা কহিলেন, বাঁধ ভেসে গেছে বর্ষার টানে, বাঁশগুলো আছে। আবার মাঘ মাসে জল কমলে চাষীরা নতুন করে বেঁধে দেবে।

কে-একজন পিছনে আসিতেছিল, তাহার নামটা মনে নাই, কহিল চাষা-বেটাদের বুদ্ধি দেখ না—ফি বছর এই রকম গতর ঘামিয়ে পয়সা খরচ করে বাঁধ-বাঁধবে, তার চেয়ে একবার এক পাঁজা ইট পুড়িয়ে যদি দুইধার পাকা করে বেঁধে দেয়, ব্যস।

দ্বারিক দত্ত কোথায় ছিলেন, হঠাৎ দেখি জলের মধ্যে লাঠি খোঁচাইতে খোঁচাইতে কাছে আসিয়া পড়িয়াছেন। বলিলেন, কি বললেন, পাকা ইটের গাঁথনি হলেই বাঁধ টিকে থাকবে? সে আর হতে হয় না। বল্লভ রায়ের টাকা তো কম ছিল না বাপু, পারলেন না কেন? টাকায় এসব হয় না। একটা নরবলি দিয়ে এইটুকু চড়া পড়েছে, সহস্র নরবলি হলে তবে যদি মা-কালী খুশি হয়ে খাল ভরাট করে দেন—

ভয়ে সর্বদেহ কণ্টকিত হইয়া উঠিল। এইখানে মানুষ বলি হইয়াছিল নাকি? আবার হয়তো অনাগত দিবসে কে কবে আসিয়া সহস্র বলি দিয়া আগাগোড়া খাল ভরাট করিয়া দিবে। জল বাড়িতে বাড়িতে ক্রমে হরি জেঠার বুক অবধি তলাইয়া গেল। আমি চুপটি করিয়া কাঁধের উপর বসিয়া আছি। দ্বারিক দত্তর উদ্দেশে প্রশ্ন করিলাম, ও বুড়ো দাদা, এখানে নরবলি হয়েছিল নাকি?

দ্বারিক দত্ত উত্তর দিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু হরি জেঠার বোধকরি মনে মনে ভয় হইয়াছিল। বিরক্তভাবে প্রশ্ন থামাইয়া দিলেন, বক বক কোরো না শিবু, শক্ত কয়ে ধরে বোসো।

তখন হইল না, কিন্তু সেই দিনই রাত্রিবেলা গল্পটা শুনিয়াছিলাম। পানসিতে উঠিয়া বরযাত্রিদলের ভয় কাটিয়া মুখ আবার প্রসন্ন হইল। দুই জোড়া পাশা পড়িল এবং তাহার উৎসাহ ও চিৎকার উদ্দাম হইয়া ক্ষণে ক্ষণে নদীর বুক কাঁপাইয়া তুলিতে লাগিল। কেবল দ্বারিক দত্ত মহাশয় দল-ছাড়া! পাশাখেলা জানেন না, বৃথাই চুল পাকাইয়াছেন। একাকী গলুয়ের উপর বসিয়াছিলেন। আমি কাছে গিয়া চুপিচুপি বলিলাম, বুড়ো দাদা, গল্প বলো।

গল্প? কিসের গল্প শুনবি?

বলিলাম, ঐ নর-বাঁধের।

হাতে কাজ নাই, দ্বারিক দত্ত তখনই প্রস্তুত। আরম্ভ করিলেন, তবে শোন—

পুঁটিমারির বিল হইতে ক্রোশ সাতেক দক্ষিণে, এখন সেখানটা ভদ্রা নদী গ্রাস করিয়াছে, কতকগুলি অনেক কালের বড় বড় ঝাউগাছ নদীতীর আঁধার করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। ঐখানে বল্লভ রায় মহাশয়ের বাড়ি ছিল। ঢাকার নবাব সরকারে চাকরি করিতেন, নবাবের ভারি বিশ্বাস তাঁহার উপর। দেউড়ির কাছে একখানা প্রকাণ্ড সেগুনকাঠ পড়িয়াছিল, তেমন কাঠ আজকালকার দিনে ভূভারতে কোথাও হয় না। বল্লভ একদিন কাঠখানা চাহিয়া বসিলেন।

নবাব ঐ পথে সর্বদা আসিতেন যাইতেন। কিন্তু নবাব-বাদশার তো নিচের দিকে তাকাইবার নিয়ম নাই, কাজেই খেয়াল ছিল না। প্রশ্ন করিলেন কিসের কাঠ? কত বড়?

বল্লভ দুই হাতে আন্দাজি আয়তন দেখাইলেন এবং বলিলেন, দেশে গিয়ে একখানা কুঁড়ে বাঁধবার ইচ্ছে করছি, সেইজন্য।

হুকুম হইয়া গেল। নবাবের বারো হাতী লাগাইয়া তবে সেই কাঠ গাঙে নামাইতে হয়। তারপর বড় ভাউলের সঙ্গে বাঁধিয়া ভাসাইয়া আনা হইয়াছিল। এ' এক কাঠে বল্লভের তিন মহল বাড়ির কড়ি-বরগা হইয়া গিয়াছিল। যাঁহারা রায় মহাশয়ের বড় অন্তরঙ্গ ছিলেন, তাঁহারা খুব গোপনে আর একটা কথা বলিতেন, বল্লভ নাকি বাষট্টিখানা সোনার ইট নবাবের তোষাখানা হইতে সরাইয়া ঐ ভাউলের খোলে পুরিয়া বাড়ি আনিয়াছিলেন। সত্য মিথ্যা সেই স্বর্গীয়েরাই জানিতেন, কিন্তু ইহার পর বল্লভ রায় আর ঢাকায় ফিরিয়া যান নাই।

ভদ্রার উভয় কূল দিয়া একেবারে ভৈরব অবধি জায়গা-জমি কিনিয়া ও কাড়িয়া কুড়িয়া তিনি রাজ্য করিতে লাগিলেন। ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে মাহিনা-করা ঢালির দল ঢাল-সড়কি লইয়া পাহারা দিত। সেই দলের সর্দারের নাম ছিল মৃত্যুঞ্জয় দাস। অমন খেলোয়াড় আর হয় না। এখনো এ অঞ্চলের লাঠিয়ালের লাঠি ধরিবার আগে

মৃত্যুঞ্জয়ের নামে মাটি হইতে ধূলা তুলিয়া মাথায় ও কপালে মাখিয়া থাকে।

শোনা যায়, মৃত্যুঞ্জয়ের বাড়ি ছিল পূর্ব অঞ্চলে পদ্মাপারে। যৌবনে খুন-ডাকাতি দাঙ্গা করিয়া খুব নাম কিনিয়াছিল, তারপর বয়স ভারি হইলে নিজেই ডাকাতের দল গড়িল। কিন্তু বউ মরিয়া যাইবার পর যেন কি হইল। আঁতুড় ঘরে বউ মরিয়াছিল, ছেলেটি বাঁচিয়া উঠিল। ক্রমে সে বছর পাঁচেকের হইল, সকলে কুড়োন বলিয়া ডাকিত। সেই কুড়োনকে লইয়া মৃত্যুঞ্জয় শান্ত ভালোমানুষ হইয়া ঘর পাতিল। বড় ছেলের নাম যাদব, তাহাকে ফিরাইতে অনেক চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু যাদবের নূতন বয়স, রক্ত গরম—বাপের কথা শুনিল না, দলে রহিয়া গেল।

কিন্তু ঘর করা কপালে ঘটে নাই।

বয়সকালে যাহাদের সহিত শত্রুতা সাধিয়া আসিয়াছে, এখন যো পাইয়া একদিন রাত্রে তাহারা চার-পাঁচশ লোকে বাড়ি ঘিরিয়া ফেলিল। জাগিয়া উঠিয়া মৃত্যুঞ্জয় দেখে, মশালের আলোকে চারিদিক আলো-আলোময়। যেন সিংহের বিক্রম বুকের মধ্যে আসিল। কুড়োনকে কাঁধে করিয়া লাঠি ঘুরাইতে ঘুরাইতে ব্যূহ ফুঁড়িয়া বাহির হইয়া গেল, এতগুলি মরদের মধ্যে কাহারও এমন সাধ্য হইল না যে একটা হাত উঁচু করিয়া তোলে।

তারপর দেশ ছাড়িয়া ঘুরিতে ঘুরিতে আসিয়া পড়িল বল্লভের সীমানার মধ্যে। বল্লভের তখন রাজ্য পত্তনের মুখ, এমন গুণী লোক পাইয়া বাঁচিয়া গেলেন।

মৃত্যুঞ্জয়কে করিতে চাহেন ঢালিদলের সর্দার। মৃত্যুঞ্জয় কিন্তু কিছুতেই রাজি নয়,—বলে, না রায়মশায়, এসব আর নয়। জীবন নিয়ে খেলা আর করব না, বউ মরবার সময় কিরে করেছি।

বল্লভ নাছোড়বান্দা। বলিলেন, দাঙ্গা-ফ্যাসাদে কোনদিন তোমায় পাঠাব না, তুমি কেবল আমার ঢালিদের খেলা শিখিও।

শেষ পর্যন্ত মৃত্যুঞ্জয় রাজি না হইয়া পারিল না। বলিল, বেশ,

তাই হল। তোমার নুন যখন খাব, তোমার জন্ত জীবন দিতে পারব—কিন্তু কারো জীবন কখনো নেব না, এই চুক্তি।

তারপর কত বড় বড় দাঙ্গা হইয়াছে, মৃত্যুঞ্জয় সে সবের মধ্যে না যাইয়া পারে নাই। কিন্তু এমন আশ্চর্য কায়দায় লাঠি চালাইত, যে তাহার হাতে আর একটা লোকও মরে নাই।

এসব যে আমলের কথা তখন বল্লভের চুলে পাক ধরিয়াছে, তাঁহার মায়ের বয়স আশির উপর। গঙ্গাহীন দেশ, চাকদার এদিকে আর গঙ্গা নাই। মরণকালে বুড়া মায়ের গঙ্গালাভ হইবে না, এই আশঙ্কায় শেষের ক'টা দিনের জন্ম মাকে চাকদায় পাঠান ঠিক হইল। রায় মহাশয়ের মা যাইতেছেন, সহজ কথা নয়। লাঠিয়াল-পাইক সাজিল, চাল-ডাল-ঘি লইয়া বিস্তর লোকজন আগে আগে ছুটিল, পথের মধ্যে জায়গা পরিষ্কার করিয়া পরম শুদ্ধাচারে হবিষ্যান্ন প্রস্তুত হইবে। তিন চারি দিনের পথ। ষোল বেহারা হুম হুম করিয়া বুড়িকে বহিয়া লইয়া চলিল।

জ্যোৎস্না রাত, সাত ক্রোশ বেশ কাটিল, একশ পাইক জকার দিতে দিতে চলিয়াছে, কিন্তু সাত ক্রোশের মাথায় গিয়া পড়িল ঐ দুরন্ত খাল। পাড় ভাঙিয়া ডাক ছাড়িয়া দুই পাশের ধানবন দলিয়া মথিয়া হু হু বেগে খাল ছুটিতেছে, টানের মুখে কুটাটি ফেলিলে দুই খণ্ড হইয়া যায়। জলে নামিয়া খাল পার হইবে, কাহার সাধ্য!

পাল্কি নামাইয়া সমস্ত রাত সেই খালের পাড়ে বসিয়া। তারপর সকালে অনেক কষ্টে একখানা ডিঙ্গা যোগাড় করিয়া খালে আনিয়া পাল্কি পার করিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু এত লোকজন বোঠে বাহিয়া গলদ্‌ঘর্ম, ডিঙা কিছুতে খালে ঢুকিল না। দুইদিন সেখানে সেই অবস্থায় কাটাইয়া অবশেষে সকলে ফিরিয়া আসিল।

মা ফিরিয়াছেন শুনিয়া বল্লভ সকল কাজকর্ম ফেলিয়া তাড়াতাড়ি দেখা করিতে আসিলেন। কিন্তু মা কথা কহিলেন না। এত কান্নাকাটি, কিছুতেই না। তারপর অকস্মাৎ উচ্চৈঃস্বরে কান্না—সে কি ভয়ানক কান্না। নিজের পোড়া অদৃষ্টের কথা, মরিবার আগে

গঙ্গাস্নানটাও হইল না—এই দুঃখ। বল্লভ রায়ের ভারি মনে লাগিল, কঠিন দিব্য করিলেন তিন মাসের মধ্যে ঐ খাল বাঁধিয়া একেবারে চাকদা পর্যন্ত সোজা রাস্তা তৈয়ারি করিয়া সেই রাস্তায় মাকে নিজে পৌঁছাইয়া দিয়া আসিবেন, তাহা না পারিলে তিনি অব্রাহ্মণ। পরদিন হইতে হাজার লোক কাজে লাগিল। বল্লভ রায়ের ঢালাও হুকুম খাল বাঁধিয়া চাকদা পর্যন্ত রাস্তা করিতেই হইবে, উহাতে সর্বস্ব খরচ করিয়া পথের ফকির হইতে হয়, সে-ও স্বীকার। এপারে ওপারে রাস্তা বাঁধিতে বেশি বেগ পাইতে হইল না, কিন্তু খাল লইয়াই বাধিল যত মুশকিল।

এখন আর খালের কি আছে? দুই কূল মজিয়া বিল হইয়াছে, মাঝখানে ক্ষীণ জলধারা। বর্ষার সময় টান হয়। কিন্তু সে-সব দিনের তুলনায় একেবারে কিছুই নয়। বল্লভের লোকজন জলের মধ্যে বাঁশ পুঁতিয়া রাজ্যের খড় সেই বাঁশের গায়ে বাঁধিয়া জলের বেগ কমাইবার কত চেষ্টা করিতে লাগিল, নৌকার পর নৌকা বোঝাই ইট ও মাটি খালে ঢালিল, কিছুতেই কিছু হয় না, সমস্ত ভাসাইয়া লইয়া যায়। অথচ খাল বাঁধিতে না পারিলে প্রতিজ্ঞা পণ্ড হয়।

তিন মাসের আর তিন দিন বাকি। বল্লভ তো ক্ষেপিয়া গিয়াছেন, দিনের মধ্যে পঞ্চাশ বার জয় মা চণ্ডিকে, মুখ রাখিস মা—বলিয়া চিৎকার করেন এবং খালের ধারে নিজে থাকিয়া রাতদিন তদারক করিতেছেন। কোন উপায় হইতেছে না। তিন দিনের মধ্যে সুরাহা না হইলে খালের জলে ডুবিয়া মরিবেন, মনে মনে মতলব আছে। সঙ্কল্পের কথা কাহাকেও বলেন নাই, তবে ভ্রূকুটিময় ভীষণ মুখ দেখিয়া লোকজন মনে করে, ঝড় আসন্ন।

সেদিন গভীর রাত্রিতে সকলে ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। আকাশভরা মেঘ। বল্লভের চোখে ঘুম নাই, তাঁবু হইতে বাহির হইয়া একাকী নূতন বাঁধা রাস্তায় পায়চারি করিতেছেন। এত অন্ধকার যে কোলের মানুষ দেখা যায় না। এমন সময় হু হু করিয়া হাওয়া বহিয়া গেল।

এত বড় সাহসী মানুষ, তবু বল্লভের গা'টা ছমছম করিয়া উঠিল। ফিরিয়া তাঁবুতে আসিয়া শুইয়া পড়িলেন, এবং আশ্চর্য ব্যাপার—সঙ্গে সঙ্গেই চক্ষু ঘুমে ঢুলিয়া পড়িল।

স্বপ্নে দেখিলেন, সশরীরে দেবী চণ্ডিকা—সে কথা বলিতে সর্বাঙ্গ শিহরিয়া ওঠে, একেবারে সত্যসত্যই কালীমূর্তি। তিনি যেন হাতের খাঁড়া নাড়াইয়া বল্লভকে ইসারা করিলেন, বল্লভ পিছু পিছু খালধার অবধি আসিয়া দাঁড়াইলেন। তারপর দেবী দেখিতে দেখিতে বাতাসে মিলাইয়া গেলেন। হঠাৎ ঝপ্‌পাস শব্দে কি একটা খালে পড়িল, জল ছিটকাইয়া উঠিল। বল্লভ দেখিলেন, স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন, একটা কবন্ধ দেহ জলের টানে একবার ভাসিয়া উঠিয়া পলকের মধ্যে তলাইয়া গেল, আর তাঁহার চোখের সামনে শূন্যে নিরালম্ব ঝুলিতেছে মুণ্ডটি। বড় বড় চোখ ঠিকরাইয়া বাহির হইতেছে, গলা দিয়া রক্তের ধারা বহিয়া খালের জল লাল হইয়া গেল। মুণ্ডটার দিকে ভাল করিয়া তাকাইলেই যেন চিনিতে পারিবেন, কিন্তু চাহিতে পারিতেছেন না। এমন সময় সর্বাঙ্গে অননুভূতপূর্ব কম্পন জাগিয়া উঠিল, বল্লভের ঘুম ভাঙিল। আগাগোড়া ঘামে ভিজিয়া গিয়াছে, আর চুপ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। উঠিয়া তখনই গিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে ডাক দিলেন: মৃত্যুঞ্জয়, ও মৃত্যুঞ্জয়!

কুড়োনকে লইয়া মৃত্যুঞ্জয় খালের ধারে মাদুর মুড়ি দিয়া শুইয়াছিল। বাপে বেটায় ধড়মড় করিয়া উঠিয়া বসিল। ইসারা করিয়া বল্লভ তাঁবুতে ডাকিলেন। আবার ইসারা করিয়া মৃত্যুঞ্জয়কে একা একাই আসিতে বলিলেন—কুড়োন ওখানে থাকুক, বড় গোপন ব্যাপার। ছেলেকে বসাইয়া রাখিয়া নিঃশব্দে দুজনে অগ্রসর হইল। আট-দশ পা আসিয়াছে এমন সময়ে মৃত্যুঞ্জয়ের পিছনের কাপড়ে টান, তাকাইয়া দেখে কুড়োন আসিয়া কাপড় ধরিয়াছে। বল্লভ ফিরিয়া চাহিলেন, আবার বাঁহাত নাড়িয়া উহাকে রাখিয়া আসিতে বলিলেন। মৃত্যুঞ্জয় জোর করিয়া কাপড় ছাড়াইয়া লইল তো কুড়োন বাপের হাত জড়াইয়া ধরিল। অন্ধকারে ভয় করিতেছে,

সে কিছুতেই বাপকে ছাড়িবে না। মৃত্যুঞ্জয় ধমক দিল, মিষ্ট কথায় বুঝাইল, কিন্তু তেপান্তরের মাঠের মধ্যে আঁধার অশ্বত্থগাছের কাছে বালক কিছুতেই বসিয়া থাকিবে না। অগত্যা কুড়োনকেই তাঁবুর মধ্যে পাঠাইয়া দিয়া দুজনে খালের ধারে বসিয়া পরামর্শ হইতে লাগিল।

কিছুই সাব্যস্ত হয় না। মৃত্যুঞ্জয়ের সেই এক কথা—আমি জীবন দিতে পারি রায়মশায়, জীবন নিতে পারব না– সে তো তুমি জান। তোমার হুকুম মানি কি করে?

বল্লভ কহিলেন, আমার হুকুম নয়, চণ্ডীর হুকুম। স্বপ্নে আমায় স্পষ্ট দেখিয়ে দিল নররক্ত না খেয়ে বেটি কিছুতেই খাল বাঁধতে দেবে না।

মৃত্যুঞ্জয় নিজের প্রকাণ্ড বুকের উপর থাবা মারিয়া বলিল, আমাকেই তবে বলি দাও। তোমাদের নুন খেয়েছি, তাতে পিছপাও নই। কুড়োন থাকবে, তাকে তুমি দেখো।

কিন্তু ইহা কাজের কথা নয়। বল্লভ শেষ অস্ত্র নিক্ষেপ করিলেন, জানেন যে ইহা অব্যর্থ। বলিলেন, তোমার দরকার হবে না মৃত্যুঞ্জয়, আমি আছি। সেসব মনে মনে আমার ঠিক করাই আছে। তুমি একবার খোঁজাখুঁজি করে দেখে এসো—হোক না হোক পরশু রাত পোহাবার আগে ফেরা চাই।· নরবলির ভাবনা কি? বলিয়া আরও গম্ভীর হইলেন।

মৃত্যুঞ্জয় উঠিয়া দাঁড়াইল। কিন্তু দাঁড়াইয়াও কি ভাবিতে লাগিল।

বল্লভ বলিলেন, নাস্তিকের মতো কথা বল কেন? জীবন নেওয়া তুমি বল কাকে? মায়ের পূজোর বলি জোগাড় করে আনা আর মানুষ খুন করা এক কথা হল? ছি-ছি-ছি—

সেই টানিয়া টানিয়া বলা ছি-ছি-ছি মৃত্যুঞ্জয়কে যেন তিনবার মুগুর মারিল। মনিবের হুকুমের পর আর কোনদিন সে দ্বিরুক্তি করে নাই। কহিল, আমি মুখ্যু মানুষ, ধর্মঅধর্ম বুঝিনে। তুমি

বললে রায়মশায়, দোষ হয় না, আমি চল্লাম। কুড়োন রইল তোমার তাঁবুতে, বড় ভীতু, ওকে দেখো—

দীর্ঘমূর্তি অন্ধকারে অশ্বত্থগাছের ছায়ায় অদৃশ্য হইল। বল্লভ তাঁবুর মধ্যে ঢুকিলেন। দেখিলেন, আলগা খড়ের উপর বল্লভের বিছানার পাশে কুড়োন বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছে।…

মাঝে একটা দিন-রাত্রি, তারপর আরো একটা দিন কাটিয়া রাত্রি আসিল। শেষের রাত্রি। কাল সন্ধ্যার সময় ঠিক তিন মাস পূর্ণ হইয়া যাইবে। প্রতিজ্ঞা পণ্ড হইয়া গেলে তাহার পর খাল বাঁধা না-বাঁধা একই কথা। এই রাত্রির মধ্যেই ক্ষুধিত করালীর বলি চাই, নর-রক্ত খালের জল লাল হইলে তবে জলের বেগ কমিবে।

বল্লভ জানেন, একেবারে নিশ্চিত আছেন—যেমন করিয়া হোক, মৃত্যুঞ্জয় রাত্রির মধ্যে বলি লইয়া ফিরিয়া আসিবেই। সন্ধ্যার আগে সমস্ত লোকজন বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহারা পাঁচক্রোশ দূরের গ্রামে চলিয়া গেল। নরবলির কথা ঘুণাক্ষরে কেহ জানে না। বাহিরে কেবলমাত্র প্রকাশ, কার্যসিদ্ধির জন্য রায়মহাশয় ভয়ঙ্কর কালী-সাধনা করিতেছেন। আজ তার পূর্ণাহুতি।

পরম সৌভাগ্যবান উৎসর্গিত বলির মানুষটি যখন আর্তনাদ করিবে, সে কণ্ঠ দেবতা ছাড়া যাহাতে বাহিরের কানে না পৌঁছায় বল্লভ সর্বরকমে তার ব্যবস্থা করিয়াছেন। কিন্তু সামান্য একটা খুঁত রহিয়া গেল—সে কুড়োন। কত লোভ দেখান হইল, কত বুঝান হইল—সে কিছুতেই গ্রামে গেল না। তাহার ভয় করে, আর কোথাও গিয়া থাকিতে পারে না। হতভাগা ছেলে চিনিয়া রাখিয়াছে কেবল বাবাকে আর রায়মহাশয়কে। দুইদিন বাবাকে দেখে নাই, ভারি মন কেমন করে, গোপনে গোপনে খুব কাঁদিয়া থাকে—কিন্তু বল্লভকে দেখিলে চোখ মুছিয়া হাসে, তাঁর সামনে কান্নাকাটি করা বড় লজ্জার ব্যাপার বলিয়া মনে করে।

কুড়োন তাই রহিয়া গিয়াছে। তা ঐ বালকের জন্য ভাবনা কিছু নাই। একবার ঘুমাইয়া পড়িলে ঢাক-ঢোল পিটাইয়া তার

ঘুম ভাঙানো যায় না। নিশি-রাত্রির ব্যাপার সে জানিতে পারিবে না।

প্রহরের পর প্রহর নিঃশব্দে কাটিয়া যাইতেছে, মৃত্যুঞ্জয় এখনো ফিরিল না। কুড়োন ঘুমাইয়া পড়িলে বল্লভ অনেকক্ষণ ধরিয়া নূতন হাঁড়িতে ঘষিয়া ঘষিয়া খড়্গ শানাইয়াছেন, অন্ধকার তাঁবুর মধ্যে রক্তলোলুপ সেই শানিতাস্ত্র ঝকমক করিতেছে। ক'দিন রাত্রির পর রাত্রি জাগিয়া চক্ষু আগুনের ভাঁটার মতো লাল। আজ আবার রক্তবর্ণের চেলি পরিয়াছেন, কপালে বাহুতে বড় বড় সিঁদুরের কোঁটা। বাতাসে এক একবার ধানবন কাঁপিয়া উঠে, অশ্বত্থগাছের দু-চারিটা পাতা উড়িয়া তাঁবুর কাছে পড়ে, অমনি কাঁধের উপর খড়্গ তুলিয়া উঠিয়া দাঁড়ান। শেষে আর তাঁবুর মধ্যে তিষ্ঠাইতে পারিলেন না, খড়্গ কাঁধে বাহিরে আসিলেন। চারিদিক নিস্তব্ধ, ভয়ঙ্কর অন্ধকার। কোনখান হইতে খালের আরম্ভ বুঝিবার উপায় নাই। জল-স্থল একাকার হইয়া গিয়াছে। বাতাসও বন্ধ হইয়া গিয়াছে, গাছের পাতাটি নড়ে না। বল্লভের মনে হইল, বুঝি এইমাত্র মহাপ্রলয় হইয়া গেল, শব্দময় প্রাণপ্রবাহ স্তম্ভিত হইয়া রহিয়াছে, জীবজগৎ নাই, জন্ম-মৃত্যু সমস্তই একাকার,···তিনিও এইবার নিশ্বাস বন্ধ হইয়া পড়িয়া যাইবেন। নিঃশব্দতা পাথর হইয়া বুক চাপিয়া রহিয়াছে, প্রতি মুহূর্তেই চাপ বাড়িতেছে। অসহ্য মনে হইল। চিৎকার করিয়া উঠিলেন—জয় মা চণ্ডিকে। সেই চিৎকারে নিজেরই সর্বদেহ শিহরিয়া উঠিল। দেবী চণ্ডী উপবাসী।—বল্লভের মনে হইল রক্ত-বুভুক্ষু মুণ্ডমালিনী তাঁর ঠিক সামনেই অতল অন্ধকারের মধ্যে কৃপাণ মেলিয়া নিঃশব্দে অপেক্ষা করিতেছেন। মাথার মধ্যে রক্ত চড়িয়া উঠিল। মনে হইল, অশ্বত্থগাছের তলা হইতে দ্রুতপদে কাহারা বাহির হইয়া আসিতেছে—এক—দুই—তিন—চার—··· অনন্ত। ডাকিলেন—কে। কারা? উত্তর নাই। খুব জোরে আবার ডাকিলেন—কে? কে? কে? গাছের তলায় গিয়া দেখিতে লাগিলেন। এক হাতে শক্ত মুঠায় খড়্গ ধরিয়া আর এক

হাত বাড়াইয়া অসমান গুঁড়ির চারিদিক হাতড়াইতে লাগিলেন। উপরে তাকাইয়া দেখিলেন। বোধ হইল, ডালপালার ভিতরে প্রকাণ্ড চালের মতো একটা লেলিহান জিহ্বা লকলক করিয়া দুলিতেছে এবং জিহ্বার দুই পাশ দিয়া দেহহীন, চক্ষুর আশ্রয়হীন কেবলমাত্র দুইটি দৃষ্টি হাউইবাজির মতো আগুন ছড়াইতে ছড়াইতে তাঁহার দিকে অতি দ্রুতবেগে ছুটিয়া আসিতেছে। খড়্গ উঁচু করিয়া তুলিয়া দেখেন, লোহার উপরে যে চক্ষুটি অঙ্কিত ছিল, তাহাও আগুন হইয়া জ্বলিয়া একেবারে চোখাচোখি তাকাইয়া যেন টগবগ করিয়া ফুটিতে লাগিল। তাঁবুর চারিপাশে খালের পাড়ে অশ্বত্থতলার নূতন-বাঁধা রাস্তার উপর দিয়া বল্লভ দুমদুম করিয়া পা ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ছিন্নমস্তার মতো নিজের মাথা নিজেরই কাটিয়া ফেলিতে ইচ্ছা হইল। অন্ধকার তরল হইয়া আসিতেছে। পূর্বাকাশে রক্তিমাভা। রাত্রি পোহাইতে আর দেরি নাই। বল্লভ রায় পাগল হইয়া উঠিলেন। মৃত্যুঞ্জয় এখনো ফিরিল না; সে বিশ্বাসঘাতক। ঠিক বুঝিলেন, বড় অনিচ্ছার সহিত গিয়াছিল,—এখন চক্রান্ত করিয়া কোন দেশে পলাইয়া বসিয়া আছে। কাল বল্লভ সর্বরকমে অপদস্থ হইলে হয়তো ফিরিয়া আসিবে। প্রান্তর কাঁপাইয়া প্রবল হুঙ্কার দিলেন—জয় মা চণ্ডিকে! খড়্গ লইয়া তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়া পড়িলেন।

কুড়োন জাগে নাই, বিভোর হইয়া ঘুমাইতেছিল, একবার ঘুমাইলে কিছুতে ঘুম ভাঙে না। বল্লভ আর একবার চিৎকার করিলেন—জয় মা!

কুড়োন জাগিল না।

ভালো করিয়া ফর্সা না হইতেই মৃত্যুঞ্জয় ফিরিয়া আসিল। দু'দিনে সে অনেক দূর গিয়াছিল, অবশেষে রাত্রিবেলা এক সুকুমার ব্রাহ্মণ শিশুকে ঘুমন্ত অবস্থায় চুরিও করিয়াছিল। মুখ বাঁধিয়া কাঁধের উপর ফেলিয়া ক্রোশ পাঁচ-ছয় ছুটিয়া আসিয়াছে, এমন সময় গুড় গুড় করিয়া মেঘ ডাকিয়া উঠিল, বিদ্যুৎ চমকাইল। মাঠের মধ্যে তাহার আলো পড়িল বালকের মুখের উপর। চাহিয়া দেখে,

ছেলেটি জাগিয়াছে—ভীতি-বিহ্বল অসহায় দৃষ্টি, মুখ বাঁধা বলিয়াই শব্দ করিতে পারিতেছে না, এক একবার গলার মধ্যে ঘড় ঘড় আওয়াজ উঠিতেছে। কে যেন মৃত্যুঞ্জয়ের পা দুখানা ঐখানে আটকাইয়া ফেলিল। তাকাইয়া তাকাইয়া বারবার ছেলেটির মুখ দেখিতে লাগিল। হঠাৎ মনে হইল, সে যেন কুড়োনের মুখ বাঁধিয়া হাড়িকাঠের মধ্যে লইয়া যাইতেছে। মাঠ পার হইয়াই এক গৃহস্থ বাড়ি। তাহাদের চণ্ডীমণ্ডপে ছেলেটিকে নামাইয়া রাখিয়া মৃত্যুঞ্জয় ছুটিয়া পলাইল। বিল ভাঙিয়া সোজাসুজি দৌড়িয়া আসিয়াছে, ধানবনের মরমর ধ্বনিতে পিছল পথে অনবরত পিছন হইতে মুখ-বাঁধা বালকের ঘড়ঘড়ানি গলার আওয়াজ শুনিতে শুনিতে আসিয়াছে। খালের ধারে আসিয়া বল্লভকে দেখিতে পাইল। জলের কাছে স্তব্ধ হইয়া বসিয়া তিনি গভীর মনোযোগের সহিত নিচের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছেন।

বল্লভের সম্বিৎ নাই। দেখিতেছেন, গভীর নিম্নদেশে জমা রক্তের চাপ গুলিয়া গিয়া ক্রমশ সমস্ত খালের জল রাঙা হইয়া উঠিতেছে, একটু একটু করিয়া জলের বেগ কমিতেছে, এক একবার মাটির চাঁই জলে ফেলিয়া পরীক্ষা করিতেছেন। না, আর তেমন আগের মতো পাক খাইয়া মাটি ভাসাইয়া লইয়া যায় না। এইবার—এখনি—আর একটু পরে, জল স্থির হইয়া দাঁড়াইবে। মৃত্যুঞ্জয় অনেকক্ষণ পিছনে বসিয়া রহিল। রায়মহাশয়ের এ-ভাব সে আর কখনও দেখে নাই। ডাকিতে সাহস হইল না। শেষকালে উঠিয়া গিয়া বল্লভের তাঁবুর মধ্যে ঢুকিল। তাঁবুর মধ্যে কুড়োন নাই। এক পাশের অনেকগুলি খড় তুলিয়া ফেলা হইয়াছে, নিচের শুকনা ঘাস বাহির হইয়া পড়িয়াছে, আর আশেপাশের খড়ের উপর তাজা রক্তের ছিটা। যে মৃত্যুঞ্জয় সমস্ত যৌবনকাল হাতে পায়ে রক্ত মাখিয়া নাচিয়া বেড়াইয়াছে, বুড়ো বয়সে ক'ফোঁটা রক্ত দেখিয়া তাহার সর্বদেহ কাঁপিয়া উঠিল। বল্লভকে গিয়া বলিল, রায় মশায়, আমার কুড়োন কোথায়?

বল্লভ তার দিকে তাকাইলেন, সে দৃষ্টির কোন অর্থ হয় না।

মৃত্যুঞ্জয় তাঁহার হাত ধরিয়া প্রচণ্ড ঝাঁকি দিয়া বলিল, শুনছ? তোমার কাছে রেখে গেলাম, আমার কুড়োন কোথায় গেল? বলে দাও, সে কোথায় গেল?

উদ্‌ভ্রান্তের মতো মৃত্যুঞ্জয় চলিয়া গেল, একফোঁটা চোখের জল পড়িল না। পরদিন সমস্ত দিনমান কোথায় ঘুরিয়া বেড়াইল, কেহ বলিতে পারে না। এদিকে চাটগাঁর দিকে যে কারকুন গিয়াছিল, এমনি দৈবচক্র, সকালবেলাতেই বিস্তর লোক লইয়া সে আসিয়া পড়িল। সন্ধ্যার মধ্যেই খাল বাঁধা শেষ।

বল্লভের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইল, কিন্তু তিনি আর শান্তি পাইলেন না।

সেদিন নিশীথরাত্রে বল্লভ জাগিয়া ছিলেন। হঠাৎ সদ্য-সমাপ্ত বাঁধের উপর দিয়া ছুটিতে ছুটিতে মৃত্যুঞ্জয় আসিয়া বল্লভের হাত ধরিয়া আগের দিনের মতো প্রশ্ন করিল: আমার কুড়োন কোথায় গেল? তাকে কোথায় রেখেছ? বলে দাও, বলে দাও।

বল্লভ কেবল হতভম্বের মতো তাকাইয়া দেখিলেন। আবার মৃত্যুঞ্জয় চলিয়া গেল।

ইহার পরে বল্লভের যে কি হইল, তিনি আর বাড়িঘরে ফিরিলেন না। দিনরাত খালের ধারে তাঁবুর মধ্যে চুপ করিয়া কাটাইতেন। মৃত্যুঞ্জয়ের বড় ছেলে যাদবকে খবর দিয়া আনা হইল। বিস্তর জমিজমা দিয়া তাহাকে বসত করাইলেন। লোকে বলে, মৃত্যুঞ্জয় নাকি প্রতি রাত্রেই আসিত। দিগন্তবিসারী জনহীন প্রান্তরের মধ্যে নিস্তব্ধ নিশীথে প্রভু-ভৃত্যে কথাবার্তা হইত, বল্লভের কোন কোন কর্মচারী তাহা স্বকর্ণে শুনিয়াছে।

মৃত্যুঞ্জয় বলিত, রায় মশায়, আমি জীবন দেবো, জীবন নেবো না কখনো।

বল্লভ বলিতেন, সে আমি জানি। জানি, তুই কক্ষনো জীবন নিবিনে—

তবু বল্লভ রায়ের জীবন গেল। মাস দেড়েক পরের কথা, পরিষ্কার পূর্ণিমা রাত, ভাদ্রমাসের শেষ কোটাল। বাঁধের গায়ে প্রবলবেগে জোয়ারের জল ধাক্কা দিতেছে। হঠাৎ তুমুল কলকল্লোল শুনিয়া বল্লভ রায় ছুটিয়া বাহিরে আসিয়া দেখেন, বাঁধ ভাঙ্গিয়াছে, হু হু করিয়া খালের মধ্যে জল ঢুকিতেছে। দেখিতে দেখিতে সমস্ত বাঁধের আর চিহ্নমাত্র রহিল না। তারপর দেখিলেন, ওপারে জ্যোৎস্নার মধ্যে মৃত্যুঞ্জয় দাঁড়াইয়া আছে। ঠিক এই সময় রোজই সে মনিবের কাছে আসিত। বাঁধ ভাঙিয়া যাওয়ায় আজ তাঁর কাছে আসিতে পারিতেছে না। মৃত্যুঞ্জয় ডাকিতে লাগিল: রায় মশায়, রায় মশায়,—

বল্লভ বলিলেন, কি করে যাই? দেখছিস জলের টান?

সে বলিল, চলে এসো, মোটে হাঁটুজল। ওপার হইতে মৃত্যুঞ্জয় নামিয়া আগাইয়া আসিতে লাগিল, হাঁটুজলও নয়। এপারে বল্লভ নামিলেন। কিন্তু এপারে জল বেশি, বুকজল ক্রমে গলাজল হইয়া দাঁড়াইল।

বল্লভ ডাকিয়া বলিলেন, তুই এগিয়ে আয় মৃত্যুঞ্জয়, আমি আর পারছিনে।

মৃত্যুঞ্জয় কহিল, আর একটু রায় মশায়, আর একটু। এইবার জল কমবে।

জলের টানে ঘুমন্ত অবোধ বালকের চাপাকান্নার মতো শোনা যাইতে লাগিল। মাথার উপর মেঘ-নির্মুক্ত পূর্ণিমার চাঁদ। মাঝখানে আসিয়া দুজনে প্রবল আকর্ষণে পরস্পরকে জড়াইয়া ধরিল। তারপর জোয়ারের বেগে কে কোথায় ভাসিয়া গেল, তাহা কেহ জানে না।...

দ্বারিক দত্ত আর কি কি বলিয়াছিলেন, পনের বছর পরে এখন তাহা মনে নাই। তবে এটা মনে পড়ে, সেদিন সন্ধ্যায় ভাঁটা সরিয়া গিয়া ঈষন্নিম্ন সমতল নদীগর্ভ অনেকখানি অনাবৃত হইয়া পড়িয়াছিল

এবং চাঁদের আলোয় বালুকারাশি চিকচিক করিতেছিল। গল্প শুনিতে শুনিতে একটু পরেই চোখ বুজিয়া জড়সড় হইয়া পড়িলাম, ভয়ে রাত্তের মধ্যে চোখ আর মেলি নাই।

পরদিন গোধূলিলগ্নে নির্বিঘ্নে ছোটকাকার বিবাহ হইয়াছিল, বরযাত্রীরাও আকণ্ঠ মিষ্টান্ন ভর্তি করিয়াছিলেন। সেই ছোট কাকী এখন পাঁচটি ছেলেমেয়ের মা। দেখিতে দেখিতে পনেরটা বছর কালসমুদ্রে বিলীন হইয়া গিয়াছে। ইহার মধ্যে শেষের বছর দশেক আমরা একদম দেশছাড়া। বাড়িসুদ্ধ সকলে কাশীতে আছি; সেখানে বাবা কাঠের ব্যবসা দিব্য জমাইয়া বসিয়াছেন। অবস্থা ফিরিয়াছে। কেবল ফি-বছর বাবা স্বয়ং একবার করিয়া দেশে যান। স্বদেশপ্রেম বশত নয়। পুঁটিমারির বিলে সুবিধামতো অনেক জায়গা জমি কেনা হইয়াছে বলিয়া। যদিও দক্ষ নায়েব একজন আছে, তবু নিজে গিয়া এক একবার দেখিয়া আসিতে হয়।

এদিকে আমি আইন পাস করিয়া একরকম নিরুপদ্রব হইয়া আবার কাশীর বাড়িতে অধিষ্ঠান করিয়াছি। বাবা জানেন, আমিও জানি, ঐ পাসের বেশি আমার দ্বারা আর কিছু হইবে না। সুতরাং কোর্টে যাইবার জন্য কোন পীড়াপীড়ি নাই। যেদিন বীণার সঙ্গে ঝগড়া হইয়া যায়, ভারি রাগ করিয়া গায়ের উপর চোগা চাপকান চাপাইতে লাগিয়া যাই, আবার হাসিয়া যখন সে দুয়ার আটকাইয়া দাঁড়ায়, ঐ বোঝা নামাইয়া ফেলিয়া নিশ্চিন্ত আরামে শুইয়া পড়ি।

এমনি চলিতেছিল। ভাদ্রমাসের মাঝামাঝি একদিন হঠাৎ বাবা ডাকিয়া বলিলেন, একবার দেশে যাও, কাল-পরশুর মধ্যে—

অবাক হইয়া গেলাম। দশ বছরের অভ্যাসক্রমে বাংলা মুলুকের সেই সুদুর্গম গ্রামটি মন হইতে ক্রমাগত দূরে সরিতে সরিতে প্রায় আন্দামান দ্বীপের সমান তফাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। বাপ হইয়া এমন বিভ্রাট বাধাইতে চান কেন?

কহিলাম, কেন, আপনি?

বাবা কহিলেন, আমি হপ্তাখানেকের মতো নাগপুরে যাচ্ছি কাঠের চালান আনতে। সে তো তুমি পারবে না।

না, তাহাও পারিব না। অতএব, চুপ করিয়া রহিলাম।

বাবা বলিতে লাগিলেন, পুঁটিমারির জমি নিয়ে প্রজাদের সঙ্গে গণ্ডগোল বেধে উঠেছে—ঘনশ্যাম চিঠি লিখেছে। আবার মামলা-টামলা যদি হয়, ও-বেটা রাঘববোয়াল টাকাকড়ি হাতে যা পাবে নিজেই গিলবে, কাজকর্ম পণ্ড করে দেবে। তুমি গিয়ে কিস্তির মুখটা কাটিয়ে সব মিটমাট করে দিয়ে এসোগে। লেখাপড়া শিখেছ, আইন পাস করলে, অন্তত নিজেদের এস্টেটপত্তোরগুলো দেখাশুনো কর।

হায়, কি কুক্ষণেই আইন পাস করিয়াছিলাম।

দিন চার-পাঁচ পরে একটা স্যুটকেস হাতে করিয়া রাত্রির মেলে মধুগঞ্জ স্টেশনে নামিলাম। প্রায় দশ বছর আগে আর একদিন রাত্রে এখান হইতে গাড়ি চাপিয়াছিলাম, সে সব দিনের কথা ভাল মনে নাই। তবু মনে হইল, স্টেশনটি প্রায় এক রকমই আছে। রাত্রি আর বেশি নাই, খোলা ওয়েটিং রুম দিয়া প্লাটফরম অবধি মাঠের জোলো হাওয়া আসিতেছে। এ সময়ে যাহার নিতান্ত গরজ, তেমন লোক ছাড়া আর কাহারো জাগিয়া থাকার কথা নয়।

কিন্তু ট্রেনের মধ্যে থাকিতেই তুমুল গণ্ডগোল কানে আসিতেছিল। ওয়েটিংরুমে দাঙ্গা বাধিয়াছে নাকি? যেই সেখানে পা দিয়াছি, আর যাইবে কোথায়, জন পঁচিশেক মানুষ চারিদিক হইতে ছুটিয়া আসিয়া যেন ছাঁকিয়া ধরিল। সকলেই জিজ্ঞাসা করে, কোথায় যাবেন? কোথায় যাবেন? সাঁতার না-জানা মানুষ গভীর জলের মধ্যে পড়িলে যেমন হয়, আমার দশা সেই প্রকার। কোন দিকে কূল-কিনারা দেখি না, পালাইবার পথ নাই।

উত্তর না দিলে কেহ পথ ছাড়িবে না, কাজেই বলিয়া ফেলিলাম, যাব, সাগরগোপ।

যেইমাত্র বলা, অমনি একজনে ডানহাতের স্যুটকেসটি ছিনাইয়া

লইয়া দৌড়। পলক ফিরাইয়া দেখি, অন্য সকলে ঐ সঙ্গে অন্তর্ধান করিয়াছে। কিঞ্চিৎ দূরে আর একজন হতভাগ্য যাত্রীরও আমার দশা। সে দিকে আর না গিয়া পাশ কাটাইয়া সরিয়া আসিলাম।

তা তো হইল, এখন আমার উপায়? স্যুটকেসের মধ্যে আমার সমুদয় কাপড়চোপড় এবং কুড়িখানি দশ টাকার নোট রাখিয়াছিলাম। মধুগঞ্জে যে সদর-জায়গায় দল বাঁধিয়া আজকাল এমন রাহাজানি শুরু করিয়াছে, তাহা জানিতাম না। মিউনিসিপ্যালিটির রাস্তায় মাইল অন্তর কেরোসিনের আলোর ব্যবস্থা আছে, কালিতে কালিতে যাত্রিশেষে আলোগুলি এমন আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে যে সে আলোকে চোর চিনিয়া ধরা দূরের কথা, নিজের হাত-পাগুলি চিনিয়া লওয়াই মুশকিল।

সামনের রাস্তায় নামিয়াছি, ভক করিয়া পিছনে আওয়াজ। তাকাইয়া দেখি, সর্বনাশ, প্রায় ঘাড়ের উপরে একখানা বাস আসিয়া পড়িয়াছে। একদৌড়ে আগে গিয়া প্রাণটা বাঁচাইলাম। তারপর ভাল করিয়া চাহিয়া দেখি, কেবল একখানা নহে সারি সারি ঐ রকম বিশ-ত্রিশখানি। সকলেই স্টার্ট দিয়াছে, একবার আগাইতেছে, একবার পিছাইতেছে, এবং তারস্বরে কে কোথায় যাইবে তাহা ঘোষণা করিতেছে। ঠিক সামনে যে গাড়িখানি ছিল, তাহার ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করিলাম, বলতে পার আমার স্যুটকেস নিয়ে এইদিকে কে পালাল?

ড্রাইভার হাসিয়া বলিল, আজ্ঞে, আসুন—এই যে। আপনি সাগরগোপ যাবেন তো? উঠে পড়ুন, এই নিন আপনার জিনিষ।

নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলাম। ভয় ধরাইয়া দিয়াছিল। ঝাঁজের সহিত কহিলাম, তুমি বেশ লোক তো বাপু, না বলেকয়ে স্যুটকেস নিয়ে চম্পট—

ড্রাইভার সবিনয়ে বলিল, আজ্ঞে, আপনারই সুবিধের জন্যে। ভারী জিনিষ বয়ে আনতে অসুবিধে হচ্ছিল, তাই দেখে—

বলিয়া কথা শেষ না করিতেই আরো দুইটি লোক প্লাটফরম পার হইয়া হইয়া আসিতেছিল, তাহাদের পাকড়াও করিতে ছুটিয়া গেল।

সুস্থির হইয়া বসিয়া চারিদিক তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিতে লাগিলাম। দেখিয়া মনে সম্ভ্রমের উদয় হইল। লোকে সভ্য হইয়া উঠিতেছে বটে, মফস্বল শহরেও তাহার ব্যতিকম নাই। সামনেই হিন্দু-চায়ের দোকান। সাইনবোর্ডে বড় বড় করিয়া লেখা: এই যে, গরম চা, আসুন, সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণের দ্বারা প্রস্তুত। ট্রেন হইতে নামিয়া ইতরভদ্র দলে দলে গিয়া সাত্ত্বিক চা খাইতে বসিয়াছে। নূতন বায়োস্কোপ খুলিয়াছে, স্টেশনের দেয়াল জুড়িয়া তার বিজ্ঞাপন ···ভ্রাম্যমান সাড়েবত্রিশভাজাওয়ালার ঠুন ঠুন ঘণ্টা-বাজনা··· ডাক্তারখানার লাল নীল আলো···দেখিয়া শুনিয়া মনে হইল, শিয়ালদহের মোড়ের খানিকটা যেন এখানে আনিয়া বসাইয়া দিয়াছে।

ড্রাইভার ফিরিয়া আসিয়া নিজের জায়গায় বসিল। যাত্রী এত ভর্তি হইয়া গিয়াছে যে একরূপ অখণ্ড মণ্ডলাকার অবস্থা। তাছাড়া এতগুলি মানুষ নিতান্ত মৌনব্রত অবলম্বন করিয়া বসিয়া নাই। গাড়ি ছাড়িলে নড়িয়া চড়িয়া সোজা হইয়া বসিলাম। হুস হুস করিয়া শেষ রাত্রির ঠাণ্ডা বাতাস গায়ে লাগিতে লাগিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম, এগাড়ি যাবে কতদূর অবধি?

ড্রাইভার কহিল, আপনি ত নামবেন সাগরগোপ। তারপর বাঁকাবড়শি মাদারডাঙা ছাড়িয়ে চলে যাবে সেই কাটাখালির কাছ বরাবর।

নরবাঁধ পার হবে কি করে?

অত্যন্ত বিস্মিত হইয়া সে আমার দিকে তাকাইল। বলিল, দেশে থাকেন না বুঝি? সেখানে গেল-বছর মস্ত পুল হয়ে গেছে। টার্নার-ব্রিজ টার্নার সাহেবের আমলের কিনা। দেশের আর কি সেদিন আছে।

মনে মনে ভাবিতে লাগিলাম, সত্যই সেদিন আর নাই।

বারো-চৌদ্দ বছর আগে একবার এই শহরে আসিয়া বাবার সঙ্গে তিনদিন ছিলাম। তখন এখানে এক ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের আর এক পুলিস সাহেবের মাত্র এই দু-খানি মোটরগাড়ি ছিল। বিকালে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব নিজে গাড়ি চালাইয়া চৌরাস্তার পথে বেড়াইতে যান, কথাটা শুনিবার পর পাক্কা তিন ঘণ্টা রাস্তার পাশে তীর্থকাকের মতো ধর্ণা দিয়া তবে হাওয়াগাড়ি দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেই জীবনের প্রথম মোটর দেখা।

ড্রাইভার লোকটির উৎসাহ কিছুতেই খর্ব হইতে ছিল না। বোধকরি, সে ইস্কুল-পাঠ্য ভারতবর্ষের ইতিহাসের শেষ অধ্যায়টি ভাল করিয়া পাঠ করিয়া থাকিবে। আবার আরম্ভ করিল, যাই বলুন মশাই, আপনাদের স্বরাজ-টরাজ ফক্কিকার, এমন কোম্পানির রাজার মতো কেউ হবে না। রাস্তাঘাট রেল-স্টিমার ট্যাক্সি-বাস— আর কি চাই? করুক দেখি কোন্ বেটা পারে?

খাড়া বসিয়া থাকিয়াও ঘুমানো যায়, আগে জানিতাম না। সকলেই ঘুমাইতেছে, আমিও চোখ বুজিয়া আছি। সেই অবস্থায় নবনির্মিত টার্নার-ব্রিজ কোন সময়ে পার হইয়া আসিয়াছি, বুঝিতে পারি নাই। সাগরগোপের ইস্কুলঘরের কাছে নামিলাম, তখন বেশ বেলা হইয়াছে। এখান হইতে মাইলটাক হাঁটিয়া বাড়ি যাইতে হয়। ডাহিনে দেখিলাম, পুঁটিমারির বিলে জল চক-চক করিতেছে। চমক লাগিল, কাণ্ডখানা কি? দশ বছর আগেকার কথা সঠিক মনে পড়ে, এই সময়ে ঘন সতেজ সবুজ ধানে এই বিল ভরিয়া থাকিত। লক্ষ্মী ঠাকরুণ তাঁর সকল সম্পদ যেন উজাড় করিয়া ঢালিতেন এখানে। যতদিন দেশে ছিলাম, কখনও ইহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। পাঁচু মোড়ল, বিশে মোড়ল, রাইচরণ দাস, সর্দারেরা দুই ভাই কান্তরাম শান্তরাম, ইহারা ফি বছর এক একটা গোলা বাঁধিত। গোলা তৈয়ারি করা এ অঞ্চলের মানুষের যেন নেশার মতো হইয়া গিয়াছিল। তেঁতুলতলায় মুচিরা রান্না করিত, ঢপ ঢপ করিয়া কুড়ালের উপর মুগুরের ঘা দিয়া বাঁশ ফাটাইত, সর্দারের মজাপুকুরে

মাথায় প্রকাণ্ড আকাশভেদী অশ্বত্থগাছ, ভিতরের উঠানে একহাঁটু উঁচু ঘাস। ঘনশ্যাম গাঙ্গুলি দাখিলা লিখিতেছিল—হিসাব ফেলিয়া হাঁ-হাঁ করিয়া উঠিল: ওদিকে যাবেন না, ওদিক যাবেন না। পরশু ঐ ঘাসের মধ্যে কেউটে সাপের খোলস পাওয়া গেছে। সঙ্গের মুটেটাকে ডাকিয়া কহিল, হাঁ করে দেখছিস কি বেটা? এ চামড়ার বাক্সটাক্স কাছারিঘরে এনে রাখ—

কাছারি ঘরখানির অবস্থা ভালই বলিতে হয়।

বাঁশের খুঁটি, চাঁচের বেড়া। সারি সারি তিনখানা তক্তপোশ, তার উপর সতরঞ্চি পাতিয়া ফরাস করা হইয়াছে। ডাবাহুঁকা হুঁকাদান—ত্রুটি কিছুই নাই। পাশে রান্নাঘর। পিছনে জঙ্গলে-ভরা বৃহৎ বাড়িটার সহিত সদরের কাছারীবাড়ির কোন সম্পর্ক নাই।

ঘনশ্যাম অর্থটা সমঝাইয়া দিল। বলিল, দরকার কি? অত বড় বাড়ি মেরামতি অবস্থায় রাখা আর ঐরাবতহাতী পোষা এক কথা। ও বছর কর্তাবাবু এসে মেরামতের কথা বললেন, আমি বল্লাম এখন কাজ নেই, আপনারা যদি কখনো দেশ-ভুঁয়ে আসেন, তখন সে-সব। ঘোড়া হলে চাবুকের জন্য আটকাবে না।

জিজ্ঞাসা করিলাম, কেমন আছ নায়েবমশায়?

ঘনশ্যাম বলিল, আছি ভাল আপনাদের দয়ায়। মাছটা খুব মিলছে আজকাল, জিনিসপত্তোরেরও সুবিধে। জনমজুর ভারি সস্তা, ছ-আনায় সমস্ত দিন খাটছে। আগে খোশামোদ করতে করতে প্রাণ যেত—এখন বাবা, পায়ে ধর আর কাজে লাগ। কোন বেটার ঘরে কিছু নেই।

বিলে চাষ বন্ধ বলে বুঝি?

ঘনশ্যাম বলিল, তাছাড়া আর কি! বেঁচেছি মশায়, ছোটলোকের ঘরে পয়সা হলে রক্ষে আছে? বিল যে আর ইহজন্মে উঠবে তার কোন ভরসা নেই।

বলিয়া হা-হা করিয়া হাসিতে লাগিল।

বলিলাম তাহলে ওদের চলবে কি করে?

না চলে, উঠে যাক। যাচ্ছেও। অত বড় পুবপাড়ার মধ্যে একলা রাইচরণ আর তার দুটো ভাইপো টিম টিম করছে। ওরাও যাবে শিগগির—ভিটেয় থেকে কি নোনাজল খেয়ে থাকবে? সেবার পঁচিশ শ' টাকা গুণে দিয়ে আমাদের এস্টেটে পঁচিশ বিঘা জমি মৌরুসী নিয়েছিল মশায়, আষাঢ়মাসে এসে বলে নায়েবমশায়, খাওয়া জুটছে না। ছেলেপিলেগুলো শুকিয়ে মরছে, চোখের উপর আর দেখতে পারিনে। মনটা আমার বড্ড নরম, শুনে কষ্ট হল। বললাম, এক কাজ কর রাইচরণ, এই পঁচিশ বিঘে বরং বাবুদের এস্টেটে ফের বেচে ফেল্ দশ টাকা হিসেবে বিঘে, আড়াই শ' টাকা পাবি।

আশ্চর্য হইয়া কহিলাম, আড়াই হাজারে কিনে আড়াই শ' টাকায় বিক্রি—রাজি হল?

নায়েব অর্থপূর্ণ হাসি হাসিয়া বলিল, না, হয়নি। উল্টে আবার দল পাকাচ্ছে। কিন্তু তাই বা দেয় কে? জলে ডোবা জমির দাম আছে কিছু? ওদের এখন ঘরপোড়া ছাই—যা পাবে তাই লাভ। তবু তো বুঝতে চায় না বেটারা।

কিন্তু আমাদেরই বা ঐ জমি কিনে কি হবে?

ঘনশ্যাম আমার অজ্ঞতায় অবাক হইয়া খানিকক্ষণ কথাই বলিতে পরিল না। শেষে বলিল, লাভ নয়—বলেন কি? এই তো চাই আমরা। সমস্ত চক এমনি করে আস্তে আস্তে খাস করে নেব। তারপর গোটা বিলটা জেলেদের কাছে বিলি হবে। জলকরে সুবিধে কত মশাই? প্রজা বেটাদের নানান আবদার—আজ বাঁধ ভাঙল, কাল নোনা লেগেছে—হেনো কর তেনো কর। এখন কিছু হাঙ্গামা নেই। বছর অন্তর জেলের কাছ থেকে করকরে টাকা একসঙ্গে গুণে নেও, তারা জাল ফেলুক, মাছ ধরুক, ব্যস। ধানে আমাদের গরজটা কি? টাকা হলেই হল।

চুপ করিয়া রহিলাম। বুঝিলাম, পুঁটিমারি বিল ডুবি হওয়ায় জমিদারের লোকসান নাই। মরিলে মরিবে অভাগা প্রজারা।

সাতপুরুষের ভিটে ছাড়িয়া চোখের জল ফেলিতে ফেলিতে দেশান্তরে চলিয়া যাইবে।

ঘনশ্যামের কৃতিত্বের কাহিনী তখনো শেষ হয় নাই। বলিতে লাগিল, শুনি, ঐ রাইচরণ নাকি গোপনে দল পাকাচ্ছে। ওরা ভাবে, আমরা চেষ্টা করলে বিলের জলপথটা বড় করে দিতে পারি। আরে বাপু, পারি তো পারি—আমরা তা করতে যাব কেন? যা আছে তাতে আমাদের গরলাভটা কি? দল পাকানো হচ্ছে, কোন জেলেকে বিলের মধ্যে জাল নামাতে দেবে না, দাঙ্গা ফ্যাসাদ বাধাবে। তাহলে নাকি আমাদের গরজ হবে।

বলিয়া হা-হা করিয়া এক দফা হাসিয়া লইল। বলে, জমিদারীর কাজে চুল পাকিয়ে ফেললাম, দাঙ্গাহাঙ্গামায় কি পিছপাও? বোঝে না বেটারা—

আমি বলিলাম, না, কোন হাঙ্গামা না বাধলেই ভাল।

ঘনশ্যাম কহিল, কিছু ভাববেন না, আপনি কেবল চুপ করে বসে বসে দেখুন না। এখনো জানে না, ঘনশ্যাম গাঙ্গুলি লোকটা কে। ঐ রাইচরণের গুষ্ঠিসুদ্ধ দেশছাড়া করব না? টিকবে ক'দিন? দেখুন গিয়ে, আপনার রজনী পাইক এখনও ঠিক ওর উঠোনে গিয়ে বসে রয়েছে—

বলিয়া একটুখানি থামিল। আবার দম লইয়া বলিতে লাগিল, এদিকে বেটা আবার বলে, আমরা মানী ঘর—মান রেখে কথাবার্ত্তা না বললে চলবে না। না যদি চলে—বেশ তো, বাস ওঠাও। সোজা পথ দেখা যাচ্ছে। থাকবার জন্যে পায়ে ধরে খোশামোদ কে করছে বাপু? আমরাও তো তাই চাই। পরশু দুপুরে হয়েছে কি মশায়, রজনী ওর দাওয়ায় চেপে বসেছে—রাইচরণ বাড়ি নেই, ছেলে দুটো ট্যাঁ ট্যাঁ করছে। বোঝা গেল, চাল বাড়ন্ত। ভারি রসিক আপনার কাছারির পাইক এই রজনী। জানে সব, তবু বলে খাজনার টাকা দাও, নইলে উঠছি নে। আর নয় তো নতুন হাঁড়ি বের কর, চাল আন, ডাল আন, সিধে সাজাও—যে ক'দিন টাকা না পাব তোমাদের

বাড়ি অতিথ হয়ে খাব। তিনটে গোলা আছে তিন বেলা তিন গোলার ধানের চাল। চাষা লোকের মেয়ে হলে কি হয়, রাইচরণের বউটার বুদ্ধি খুব। খোঁটাটা বুঝতে পারল, চোখ দিয়ে তার টপ-টপ করে জল পড়তে লাগল।

দিন পাঁচ-সাত কাটিয়া গেল। ভালই কাটল, নায়েব মশায়ের আয়োজনের ক্রুটি নাই। পুঁটিমারির বিল হইতে সকালে বিকালে ঝুড়ি ঝুড়ি টাটকা মাছ আসিতেছে, গঞ্জ হইতে দাদখানি চাউল। দুধেরও অপ্রাচুর্য নাই। দুপুরে খাইতে বসিয়াছি, ঘনশ্যাম লোনা ও মিঠা জলের মাছের আস্বাদের তুলনা করিতেছে, হঠাৎ বিশ-ত্রিশ জন লোক ভয়ঙ্কর চিৎকার করিতে করিতে কাছারিবাড়ির উঠানে দৌড়িয়া আসিল।

খুন! খুন! খুন!

খাওয়া ঐ পর্যন্ত। দেখিলাম, বড় বিপদের মধ্যেও ঘনশ্যাম বিচলিত হয় না।

খুন কি রে? কে কাকে খুন করল?

রজনীকে। রাস্তায় লাস পড়ে আছে—রাইচরণ আর তার ভাইপোরা সড়কি মেরেছে। কাছারি নাকি লুঠ করতে আসছে।

ঘনশ্যাম তাচ্ছিল্যের সহিত কহিল, আসুকগে। বেটাদের বড় বাড় হয়েছে। আচ্ছা! আমাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, কিছু ভাববেন না, বিছানা পাতা আছে—বিশ্রাম করুন গিয়ে। আমি লাসটা নিয়ে আসি। দেখি, কতদূর কি গড়াল।

জনকয়েক ধরাধরি করিয়া রজনীকে লইয়া আসিল। চক্ষু মুদ্রিত। তাজা রক্তে কাপড় চোপড় ও সর্বাঙ্গ ভাসিয়া গিয়াছে, এক এক জায়গায় রক্ত চাপ বাঁধিয়া লাগিয়া রহিয়াছে। হাঁটুর নিচে হইতে তখনও রক্ত গড়াইয়া গড়াইয়া কাছারিঘরের দাওয়ার উপর পড়িতে লাগিল। ঘনশ্যাম খানিকটা পিছনে, ক'জনের নিকট হইতে পুঙ্খানুপুঙ্খ খবর লইতে আসিতেছে। এমন দৃশ্য আর দেখি নাই।

আপাদমস্তক হিম হইয়া গেল, মনে হইল মাথা ঘুরিয়া পড়িয়া যাইব।

হঠাৎ দেখিলাম, লাসটি কথা কহিতে কহিতে দিব্য উঠিয়া বসিল। যাক মরে নাই তাহা হইলে।

ঘনশ্যাম কহিল, তবু ভালো যে মরিসনি, তাহলে সাক্ষী পাওয়া মুশকিল হত।

রজনী হাত দিয়া ক্ষতমুখ চাপিয়া ধরিয়া কহিল, ওরা তাক করতে পারেনি। পায়ে সড়কি মারলে কখনো সাবাড় হয়? দিতে পারত আর খানিক উঁচুতে তলপেটে বসিয়ে! আমি নিজেই হয়তো খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে একরকম চলে আসতে পারতাম নায়েব মশায়, কিন্তু চোখ বুজে পড়ে রইলাম। লোকের হৈ-চৈ শুনে কেমন ভয় ধরে গেল।

নানা রকম গাছগাছড়া শিলে বাটিয়া ক্ষতমুখে লাগাইয়া দেওয়া হইল। এমনি ঘণ্টা খানেক চলিল। রক্ত বন্ধ হইল। রজনীর ভাব দেখিয়া বুঝিলাম, এত কম আঘাতে উহারা কাবু হয় না। আর এ রকম ব্যাপার উহার জীবনে অনেকবারই ঘটিয়াছে।

অতঃপর ঘনশ্যামের মোকর্দমা সাজাইবার পালা। জিজ্ঞাসা করিল, ঘটনাটা কি রে?

রজনী কহিল, এমন কিছু নয়। আপনার হুকুম মতো গিয়ে বললাম, আজ যদি কাছারি না যাস রাইচরণ, কান ধরে ঘোড়দৌড় করিয়ে নিয়ে যাবার হুকুম। রাইচরণ বলল, তুমি একটু দাঁড়াও, কাপড়খানা ছেড়ে দুটো টাকা গাঁটে নিয়ে আসি। কাছারিতে ছোট বাবু এসেছেন, শুধু-হাতে যাওয়া যায় না। তাঁর নজরানা। আমি গাছতলায় দাঁড়িয়ে তামাক খাচ্ছি, হঠাৎ পেছন থেকে সড়কি বসিয়ে দিল—

সমস্ত বিকাল ধরিয়া কত লোক যে আসাযাওয়া করিতে লাগিল, তাহার ইয়ত্তা নাই। আমি নির্লিপ্তের মতো একদিকে চুপ করিয়া বসিয়া রহিলাম। ঘনশ্যাম পরামর্শ আঁটিতে লাগিল, সাক্ষী

সাজাইতে লাগিল, আবার জেরা করিয়া তাহাদের ভুল ধরাইয়া দিতে লাগিল। মুখের প্রসন্নতা দেখিয়া সন্দেহ রহিল না, রাইচরণকে লইয়া অনতিবিলম্বে ভয়ঙ্কর কাণ্ড শুরু হইবে। সন্ধ্যার আগে ঘনশ্যাম কহিল, এইবার ব্রহ্মাস্ত্র তৈরি হয়ে গেল, আমি থানায় চললাম। খবর পাচ্ছি, বেটারা ভয়ানক ক্ষেপে গিয়েছে, রাত্রিবেলা কাছারি এসে খানিক হৈ-চৈ করতে পারে। আপনি একটু সাবধান হয়ে থাকবেন মশায়, রাগটা মনিব-চাকর সকলের উপর গিয়ে পড়ছে কিনা। তাহলেও ভয়ের কিছু নেই, করতে পারবে না কিছু।

পাহারার জন্য ঘনশ্যাম গোপন ব্যবস্থা যদি কিছু করিয়া গিয়া থাকে, তাহা বলিতে পারি না, কিন্তু প্রকাশ্যত ফরাসের উপর বসিয়া রহিলাম কেবল মাত্র আমি, এবং নিচে খোঁড়া পা লইয়া রজনী পাইক। সন্ধ্যার পরেই কেবল কাছারি-বাড়িতে নয়, সমস্ত গ্রামের মধ্যে মানুষের সাড়া একদম বন্ধ হইয়া গেল। দুপুরে তাজা নর-রক্তের যে প্রবাহ দেখিয়াছি, অন্ধকারের মধ্যে যেন তাহার বিভীষিকা দেখিতে লাগিলাম। ঘরের সামনেই আম-কাঁঠালের ঘন বাগান। এক একবার মনে হইতে লাগিল, সড়কি-বল্লম লইয়া কাহারা যেন পা টিপিয়া টিপিয়া উহার মধ্য হইতে বাহির হইয়া নিঃশব্দে আমার ঘরের কানাচের দিকে আসিতেছে। হেরিকেনটা সত্যসত্যই একবার উঁচু করিয়া দেখিয়া লইলাম। দুয়ার খোলা, রজনী নিকটেই বসিয়াছিল। দুয়ারটা ভেজাইয়া দিতে বলিলাম। রজনী খোঁড়া পায়ে উঠিয়া দাঁড়াইয়া খিল আঁটিয়া দিল, কারণ জিজ্ঞাসা করিল না। বোঝা গেল, ভয় কেবল আমার একার নহে। মেঘ জমিয়া চারিদিক এত আঁধার করিয়াছে যে এরূপ ভাব আমার জন্মে দেখি নাই। এই অন্ধকার রাত্রিতে বিদ্রোহী রাইচরণের দল নিশ্চয় চুপ করিয়া বসিয়া নাই, এমনি আশঙ্কায় গা ছমছম করিতে লাগিল। ঘনশ্যাম সেই যে থানায় গিয়াছে, এখনো ফেরে নাই। রান্নাঘরে আলো নিবানো। যে লোকটা রান্না করিয়া থাকে সে এই দুর্যোগে হয়ত আসে নাই, কিংবা আসিয়া থাকে ত ইতিমধ্যে কোন গতিকে

কাজ সারিয়া খিল আঁটিয়া দিয়াছে। রজনী তামাক সাজিয়া আপন মনে টানিতে লাগিল। যা-হোক কিছু কথাবার্তা কহিবার জন্ত বলিলাম, ও রজনী, রাইচরণের পশ্চিমঘরের কানাচে যে রাস্তা, কাণ্ডটা ঘটল বুঝি সেইখানে?

রজনী উত্তর করিল না, যেন শুনিতেই পাইল না।

আবার জিজ্ঞাসা করিলাম, রাইচরণ কি বলছিল? কাছারিতে ছোটরাবু এসেছেন, তাঁর নজরানা নিয়ে যাচ্ছি—এই না?

রজনী মুখ ফিরাইয়া বাহিরের দিকে ইসারা করিয়া চুপি চুপি কহিল, ওসব কথা থাকগে এখন বাবু, রাতবিরেতে দরকার কি? কে কোথায় ওত পেতে বসে আছে, তার ঠিক নেই—

কথা শুনিয়া সর্বদেহে কাঁটা দিয়া উঠিল। ইহা সম্ভব বটে। আমি যেখানে বসিয়া আছি তাহার পাশে একটি চাঁচের বেড়ার ব্যবধানে হাত দুয়েকের মধ্যে হয়ত সেই খুনে লোকেরা ঢাল-সড়কি লইয়া দল বাঁধিয়া নজরানা দিতে বসিয়া আছে। দশ বছর পরে পাড়াগাঁয়ে পা দিয়াছি, দশ বছর আগেকার যে সব দিনের অস্পষ্ট স্মৃতি এখনও মনের মধ্যে আছে, সে সময়ে মানুষ এমন করিয়া মানুষের রক্তপাত করিত না। তখন দেখিতে পাইতাম, ক্ষেত চষিবার ও গোলা বাঁধিবার ভীষণ প্রতিযোগিতা। পেটে খাইতে যে পয়সা খরচ হয়, এ বোধ কাহারও ছিল না। আমাদের বাড়িতেই দেখিয়াছি, উনুনে সমস্ত দিন অনির্বাণ রাবণের-চিতা জ্বলিতেছে। সেজজেঠাকে কালোয়াতি রোগে ধরিয়াছিল, পাখোয়াজ ঘাড়ে করিয়া ক্রোশ দুই ঘুরে মাদারডাঙায় চলিয়া যাইতেন। রাত্রি দুপুর হইয়া যাইত। কোনদিন মোটে ফিরিতেন না। আবার কোন কোন দিন একেবারে জন পাঁচ-সাত সঙ্গী লইয়া হানা দিতেন। তখন হয়ত ঠাকুরমা, ন-পিসি, জেঠাইমারা সকলে শুইয়া পড়িয়াছেন। আবার উঠিয়া ভাত চাপাইতে হইত, মুখে একটু বিরক্তভাব কখনও দেখি নাই। বাড়িতে লোক আসিয়াছে, রাঁধিয়া-বাড়িয়া খাওয়ানো, ইহা ত মস্ত আনন্দের কথা। এখনকার রীতিনীতি দেখিয়া অনেক

সময় সন্দেহ হয়, হয়ত উহা কবে একদিন ছেলেবেলার স্বপ্ন দেখিয়াছিলাম—উহার কোন সত্য অস্তিত্ব নাই। পরক্ষণে আবার তাকাইয়া তাকাইয়া দেখি, কান্তরামের বড় ছেলের কুঁড়েঘরের পাশটিতে জঙ্গল-ভরা সারি সারি পাঁচটি খোলার ভিটা নিবন্ত পঞ্চ-প্রদীপের মতো এখনও পড়িয়া আছে। তখন মনে হয়—না, মিথ্যা নয়—স্বপ্ন নয়—উহা সত্য, সত্য।

বেড়ার ফাঁকে নজর পড়িল, রাস্তার উপর একটি আলো।

কে? ও কে? কথা বল না কেন?

কেবলই প্রশ্ন করিতেছি, কিন্তু উত্তর দিতে যেটুকু অবকাশের প্রয়োজন তাহা দিতেছি না। রজনীও উঠিয়া দাঁড়াইয়া আমার সহিত সমস্বরে প্রশ্ন শুরু করিল। আলো নিরুত্তরে আসিয়া কাছারির দাওয়ায় উঠিল; তারপর বলিল, রজনী দুয়ার খোল্।

ঘনশ্যামের কণ্ঠস্বর। যাক, রক্ষা পাইলাম।

সঙ্গে আর কাহারা আসিতেছিল। তাহাদের উদ্দেশ্যে ঘনশ্যাম বলিল, তোরা বাপু বাড়ি যা, আর দরকার নেই। তারপর গলা নামাইয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, অত চেঁচামেচি করছিলেন কেন? রাহাজানি করতে আসে কি হেরিকেন জ্বেলে সন্ধ্যাবেলায়?

তা বটে। ভাবে বোঝা গেল, বেশ জোর পায়েই ঘনশ্যাম চলিয়া আসিয়াছে। কিছুক্ষণ চুপ করিয়া জিরাইয়া লইল, তারপর রজনীর দিকে চাহিয়া কহিল, তুই বেটা এরি মধ্যে খাড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিস যে! মোকর্দমার অসুবিধে হবে। হাসপাতালে শুয়ে থাকতে হবে নিদেনপক্ষে তিনটি মাস। সেইরকম এজাহার লিখিয়ে এলাম। বলিয়া হঠাৎ যেন কি মনে পড়িয়া গেল—রজনী, একটু বাইরের দিকে গিয়ে বোস—

হুকুম ত হইয়া গেল, কিন্তু আজিকার রাত্রে বাহিরে গিয়া বসা যে সে কর্ম নয়। একবার সড়কির তাক ফস্কাইয়া পায়ে আসিয়া বিঁধিয়াছে, বারান্তরে উহারা ভুল সংশোধন করিয়া লইবে না তাহার

নিশ্চয়তা কি? অথচ মুশকিল এই, এতবড় কাছারির পাইকের পক্ষে ভয়ের কথাটা মুখ ফুটিয়া বলা চলে না। রজনী যেমন বসিয়াছিল, তেমনি রহিল।

ঘনশ্যাম হুঙ্কার দিয়া বলিল, বেটা শুনতে পাস নে? বলছি, একটা গোপন কথা আছে—

নিতান্ত মরিয়া হইয়া রজনী ডানহাতে লইল একখানা লাঠি, তারপর অতি সন্তর্পণে এদিক ওদিক তাকাইয়া দাওয়ার কোণে গিয়া বসিল।

ঘনশ্যাম ফিসফিস করিয়া কহিল, এই ইয়ে, টাকাকড়ি যা আছে একটা থলিতে ভরে কোমরে বেঁধে ফেলুন, গতিক বড় সুবিধের নয় বুঝলেন? কাগজপত্তোর যা কিছু, গোলমাল দেখে অনেকদিন আগেই সরিয়ে ফেলেছি।

তারপর ধাঁ করিয়া তাহার গলা একেবার সপ্তমে চড়িল। থানায় গিয়ে দেখি ভোঁ-ভোঁ—ছোট দারোগা বড় দারোগা দু জনেরই পাত্তা নেই সকাল থেকে। শেষকালে এলেন অবিশ্যি। কাজ বাগিয়ে নিয়ে চলে এলাম। তাইতে দেরি হয়ে গেল। টুনেঘরা ডাকাতির কেসে গিয়েছিলেন। বিল ডুবি হয়ে বেটারা যেন সিংহীর পাঁচ পা দেখেছে—কেবল খুনজখম, চুরি-ডাকাতি। টের পাবে, টের পাবে—'পিপীলিকার পাখা উঠে মরিবার তরে'—

কবিতার এক চরণ আবৃত্তি করিয়াই চুপ করিল। একটু পরে নিশ্বাস ফেলিয়া আমি কহিলাম, রাত অনেক হয়েছে, খেয়েদেয়ে এবার শোবার ব্যবস্থা হোক, ঘুম পাচ্ছে—

ঘনশ্যাম তৎক্ষণাৎ ব্যস্ত হইয়া উঠিল—ঠিক কথা, সকাল থেকে আবার খাটুনি শুরু। একসঙ্গে একেবারে বিশখানা ওয়ারেণ্ট বের করে এসেছি। রাত না পোয়াতেই বন্দুক-টন্দুক নিয়ে পুলিস আসবে। তখন এক এক বাড়ি ঘেরাও কর, আর মেয়েমর্দ ধরে ধরে চালান দেও। সড়কি মারা বের করে দিচ্ছি। ঘুঘু দেখেছেন, ফাঁদ দেখেন নি।

চোখ টিপিয়া ইসারায় আমাকে বলিল, আশে-পাশে যদি কেউ থাকে ত শুনে যাক, ভয়ে হাত পা পেটের ভিতর সেঁদিয়ে যাবে।

রজনী আসিয়া ঘরে ঢুকিল, তাহার মুখ পাংশু। অন্ধকারের দিকে আঙুল বাড়াইয়া বলিল, নায়েব মশায়, মানুষ আশশ্যাওড়ার বন ভেঙে মড়মড় করে চলে গেল।

আমি কহিলাম, শেয়াল-টেয়াল হবে, তোমার ভয় লেগেছে রজনী, তাই ঐ রকম ভাবছ। তুমি ঘরের মধ্যে এসে বসো।

ঘনশ্যাম মৃদুস্বরে বলিল, যাই হোক, এখন আর রান্নাঘরে গিয়ে কাজ নেই। ঘরের বেড়াটা তেমন সুবিধের নয়। এক রাত না খেলে কেউ মরে যায় না মশায়। গেল বছর কি হল—সাতবেড়ে কাছারিতে ম্যানেজার কালীচরণ শিকদার এলেন তদারক করতে। ভদ্রলোক কেবল মাছের ঝোলের বাটি টেনে নিয়ে বসেছেন—গুড়ুম করে একগুলি। দিন দুপুরে এতবড় কাণ্ড, অথচ খুনের মোটে আস্কারাই হল না। সমস্ত প্রজা একজোট কিনা।

শুনিয়া আর ক্ষুধা রহিল না। বলা ত যায় না, রান্নাঘরে যদি রাইচরণ নজরানা লইয়া দেখা করিতে আসে। এদিকে কোথাও কিছু নয়, লোকজন কাহাকেও দেখিতেছি না, ঘনশ্যাম আরম্ভ করিল বিষম চেঁচামেচি—

ওরে বেটা উজবুক, হাঁ করে রইলি যে। সমস্ত রাত এইরকম কাটবে নাকি? তুই না পারিস, আর কাউকে বল্। ফরাসের উপর দুটো তোষক পেতে দিক্। আলনার পরে চাদর আছে, বাবুর বিছানায় পেতে দে। আমার লাগবে না। আর দুটো কাঁথা দিস, রাত্তিরে বৃষ্টি হলে শীত লাগতে পারে।

বলিয়া কিন্তু কাহারও অপেক্ষা না করিয়া ঘনশ্যাম নিজেই চটপট সমস্ত পাতিয়া লইল। দুইজনে শুইয়া পড়িলাম। পরক্ষণেই আবার উঠিয়া আলো নিভাইয়া দিল।

বলিলাম, আলো জ্বালা থাকলেই ভাল হত।

ঘনশ্যাম কহিল, না, মিছে তেল পুড়িয়ে লাভ কি। বলিয়া পাশ ফিরিয়া শুইল।

ইহার পর বোধকরি ঘণ্টাদেড়েক কাটিয়া থাকিবে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় ঘুম বেশ জমিয়া আসিয়াছিল। হঠাৎ গলার উপর মানুষের হাতের শীতল স্পর্শ। একমুহূর্তে ঘুমের মধ্যেও সারাদিনের আতঙ্ক মাথা খাড়া করিয়া উঠিল। রাইচরণের দল ঘরের মধ্যে ঢুকিয়া গলা কাটিতে আসে নাই ত? চিৎকার করিতে যাইতেছিলাম, এমন সময় ঘনশ্যাম আমার মুখের উপর হাত চাপিয়া চুপি চুপি কহিল, আমি—আমি—ভয় পাবেন না। উঠুন ত।

উঠিয়া বসিলাম। অন্ধকারে তাহার চোখ দুটো যেন জ্বলিতেছে, হাতে লম্বা সড়কি। বলিল, এখানে শোয়া হবে না। বেটারা হন্তে কুকুরের মতো ক্ষেপে গেছে, রাত্রে কি করে বসে তার ঠিক নেই। চলুন—

আবার চলিতে হইবে, বলে কি! ঘুম উড়িয়া গেল। ভগবান, কাহার মুখ দেখিয়া যে এই জংলি পাড়াগাঁয়ে মরিতে আসিয়াছিলাম। এই ঘনান্ধকার বর্ষারাত্রে না-জানি কোথায় যাইতে হইবে।

ঘনশ্যাম বলিতে লাগিল, উঠুন, অসুবিধে কিছু নেই—বেশ ভাল জায়গা দেখা আছে। এ গ্রামে কাউকে বিশ্বাস করিনে, পেটে ক্ষিধে তো সকলের। ক্ষিধের চোটে দু-চারটে ছিটকে এসেছে আমাদের দলে, খবরাখবর দেয়, দল ভাঙাভাঙি করে। কিন্তু কোন্ বেটার মনে কি আছে, কে জানে?

যাচ্ছি কোথায় তা হলে?

বাঁকাবড়শি নীলাম্বর বিশ্বাসের বাড়ি। আবার ঘোর থাকতে ফিরে এসে শোব—কাকপক্ষীতে টের পাবে না।

বাঁকাবড়শি গ্রাম আমার চেনা, অনেক বৈঁচির জঙ্গল আছে। ছোটবেলায় বৈঁচিফল খাইতে খাইতে একদিন তত দূর অবধি চলিয়া গিয়াছিলাম। বলিলাম, সে তো অনেক দূর—

ঘনশ্যাম বলিল, কোথায় দূর! মোটে আধক্রোশ পথ। খাল

পার হতে হবে, তা মজবুত সাঁকো বাঁধা আছে। অসুবিধে কিছু নেই—

না থাকিলেই ভাল। আর সে বিবেচনা করিবার অবসরই বা দিল কোথায়? জুতা পায়ে দিতেও ঘনশ্যামের আপত্তি, বলিল, উঁহু, শব্দ হবে। কে কোথায় ওত পেতে বসে আছে, কাজ কি! দাঁড়ান—

বলিয়া একটা পাশের বালিশ আমার শিয়রের বালিশের উপর শোয়াইল, সযত্নে তাহার উপর কাঁথা চাপা দিল। অন্ধকারে দেখিতে পাইতেছিলাম না, কিন্তু বিছানার ঠিক পাশে বসিয়াছিলাম বলিয়া সমস্ত টের পাইলাম। জিজ্ঞাসা করিলাম, এ আবার কি ঘনশ্যাম?

ঘনশ্যাম কানের কাছে মুখ আনিয়া কহিল, এ মতলব থানা থেকে আসবার পথেই ভেবে রেখেছি। ঐ যে হৈ-চৈ করে আপনার জন্য বিছানা করতে বললাম, সব তার মানে আছে মশায়। আশেপাশে চর-টর যারা আছে, শুনে গিয়ে খবর দিক। কাঁথা-চাপা পাশবালিশ রইল, রাত্রে ঘরে ঢুকে আপনি শুয়ে আছেন মনে করে কোন বেটা যদি কোপ-টোপ ঝাড়ে কি বেকুব হবে বলুন ত! কালকে এসে হয়ত দেখব, বালিশটা দুইখণ্ড হয়ে আছে।

স্বর শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম, শত্রুর সম্ভাবিত বেকুবিতে ঘনশ্যাম ভারি খুশি হইয়াছে।

নিঃশব্দে সে দরজা খুলিল, আমি পিছনে পিছনে চোরের মতো বাহির হইয়া আসিয়া দরজায় শিকল লাগাইলাম। টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে শুরু হইয়াছে। কোথাও হাঁটু অবধি কাদা, জায়গায় জায়গায় জল বাধিয়া রহিয়াছে, জল ছিটকাইয়া একেবারে মাথা অবধি উঠিতেছে। সে যে কি দুঃখের যাত্রা, মনে করিলে এখনও কান্না পায়। খালি পা, অন্ধকারে ছাতা খুঁজিয়া পাই নাই। তার উপর ঘনশ্যাম ফাঁকা রাস্তা দিয়া চলিতে দিবে না, তাতে আততায়ীর নজরে পড়িবার সম্ভাবনা। বনজঙ্গল ভাঙিয়া অতি সন্তর্পণে চলিতে লাগিলাম। রক্ষার মধ্যে অন্ধকারে ক্রমে ক্রমে দৃষ্টি খুলিয়া গিয়া

ঘনশ্যামের অস্পষ্ট মূর্তি দেখিতে পাইতেছিলাম। কোথা দিয়া কোনখানে যাইতেছি তাহার কিছুই আন্দাজ ছিল না, কোন গতিকে উহার পিছন ধরিয়া চলিয়াছিলাম। এক একবার সে স্থির হইয়া দাঁড়ায়, চারিদিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখিয়া লয়, আমি সভয়ে জিজ্ঞাসা করি: কি? কোন কিছু দেখতে পাচ্ছ নাকি? ঘনশ্যাম জবাব দেয়: না, চলুন। আবার অগ্রসর হইতে থাকে। হঠাৎ একবার পিছনে আমার দিকে চাহিয়া বলিল, সর্বনাশ, শুধু হাতে আসছেন নাকি? শিগগির একটা জিওলের ডাল ভেঙে নিন। শিগগির—

ক্রমে খালের ধারে পৌঁছিলাম। মেঘ ও অন্ধকার আবার এত জমিয়া আসিল যে ঘনশ্যামকেও আর দেখা যায় না। অতঃপর চোখ দিয়া দেখিয়া নয়—পা দিয়া স্পর্শ করিয়া বুঝিলাম, বাঁশের সাঁকোর উপর উঠিয়াছি। একখানি মাত্র বাঁশ। পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার উপর দিয়া যাইতেছি, হাতে ধরিবার জন্য আর একখানি বাঁশ উপরে বাঁধা আছে। দুইটা মানুষের ভারে বাঁশ মচ মচ করিতে লাগিল, বুঝি-বা সবসুদ্ধ ভাঙিয়া চুরিয়া নিশীথরাত্রে খালের জলে গিয়া পড়িতে হয়।

ঘনশ্যাম উপরে গিয়া নিশ্বাস ফেলিল। বলিল, যাক, নিশ্চিন্ত। খাল পার হয়ে কোন শর্মা আর এদিকে আসছেন না। এই খাল হল আমাদের এলাকার সীমানা—

আবার বলিল, এখনো পার হতে পারলেন না? তা আসুন—আস্তে আস্তেই আসুন মশায়। খুব সাবধান হয়ে ধরে ধরে আসবেন, বৃষ্টির জলে বাঁশ পিছল হয়ে গেছে। সেদিন একটা লোকের এইখান থেকে পড়ে যা দুর্গতি! ভাসতে ভাসতে আর একটু হলে বেড়জালের মধ্যে ঢুকে গেছল আর কি!

খাল পার হইয়াও পথ ফুরাইল না। কত পথ চলিলাম জানি না, শেষে বাঁশের বেড়া ডিঙাইয়া এক গৃহস্থের বাহিরের উঠানে আসিয়া দাঁড়াইলাম। ঘনশ্যাম বলিল, নীলাম্বর বিশ্বাসের বাড়ি।

তবু ভাল। ভাবিয়াছিলাম, তাহার ঐ আধ ক্রোশ পথ চলিতে বুঝি সমস্ত রাত্রিতেও কুলাইবে না।

ঘনশ্যাম বাহিরের আলগা বড় ঘরখানির মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল। কিন্তু পা দিয়াই চক্ষের নিমেষে নামিয়া পড়িল। যেন সাপ দেখিয়াছে। এদিকে কাদায় বৃষ্টিতে সমস্ত কাপড়চোপড় মাখামাখি, মাথা দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতেছে, একটুখানি আশ্রয় পাইলে বাঁচিয়া যাই। আবার নামিয়া আসিতেছে দেখিয়া বিরক্তি ধরিল। সারারাত এমনি করিয়া ঘুরাইয়া বেড়াইবে নাকি? এমন দগ্ধিয়া মরার চেয়ে সড়কির আঘাতে প্রাণ দেওয়া যে ঢের ভাল ছিল।

জিজ্ঞাসা করিলাম: কি হল?

জবাব দিল: এখানে হবে না। এ ঘরে কেউ শোয় না বলে জানতাম; আজকে দেখছি এক পাল মানুষ—

আমি কহিলাম, হোক গে। মানুষ শুয়েছে, বাঘ ত নয়। তুমি ওদের ডেকে বল। দু-জনে একটা রাত মাথা গুঁজে পড়ে থাকব, তা দেবে না? যেখানে হয় শুয়ে পড়ি—

ঘনশ্যাম মাথা নাড়িয়া কহিল, তা হয় না। ডেকে তুলব কি, হঠাৎ যদি কেউ জেগে উঠে আমাদের দেখে ফেলে তাহলে সর্বনাশ, তা বুঝছেন না? কাল যদি এ অবস্থা জানাজানি হয়ে যায়, এ অঞ্চলে কোন বেটা আর মানবে? চলুন, আর এক বাড়ি যাই। এবারে ফিরব না, এবারে নির্ঘাত—

হায় ভগবান!

ঘনশ্যাম বলিল, দূর নয়, কাছেই। আধ ক্রোশও হবে না। উঠুন।

ফের আধ ক্রোশ! আধ ক্রোশের কথা শুনিয়া শুনিয়া যে আর পারি না। আমি ছাঁচতলায় বসিয়া পড়িয়াছিলাম, মরিয়া হইয়া বলিলাম, নায়েব মশায়, আর এক পা-ও যাচ্ছি নে। যা থাকে কপালে, এখানে হয়ে যাক। কোথাও না জোটে এই উঠোনেই শুয়ে পড়ব। কার মুখ দেখে যে কাশী থেকে বেরিয়েছিলাম!

ঘনশ্যাম চিন্তিত হইল। কহিল, ভারি মুশকিলে ফেললেন। কি করা যায়, তাইত…আচ্ছা দেখি। বলিতে বলিতে অন্ধকারে অদৃশ্য হইয়া গেল। একটু পরেই ফিরিয়া আসিয়া কহিল, আসুন, হয়েছে—

জিজ্ঞাসা করিলাম: কত দূর?

এই বাড়িতেই। নিতান্ত মন্দ হবে না।

ঢুকিতে হইল গোয়ালঘরে। গোরু এবং বাছুরে ঠাসাঠাসি, তিল ফেলিলেও বোধ হয় স্থানাভাবে গোরু-বাছুরের গায়ের উপর রহিয়া যাইবে। এবং গোবর ও গোমূত্র সহযোগে মেজের উপর এমন গভীর সুপবিত্র কর্দমের সৃষ্টি হইয়াছে যে তাহার মধ্যে কোথায় যে শুইতে হইবে ভাবিয়াই পাইলাম না।

কিন্তু শুইবার জায়গা ঠিক হইয়াছে নিচে নয়, উর্ধ্বলোকে।

আড়ার উপর বর্ষার জন্য সঞ্চিত শুকনা বাঁশের চেলাকাঠ সাজানো, ঘনশ্যাম অবলীলাক্রমে খুঁটি বাহিয়া তাহার উপর উঠিল। আমাকে কহিল, হাত ধরব নাকি?

হাত আর ধরিতে হইল না। স্বর্গারোহণ করিলাম। দেখি, সেখানেও সুখের অতি উত্তম ব্যবস্থা। মশা ভন ভন করিতেছে, পিছনের ডোবা হইতে কোলাব্যাঙের একটানা আওয়াজ, ফুটা চাল হইতে দু-এক ফোঁটা বৃষ্টিও যে গায়ে আসিয়া না লাগিতেছে এমন নয়। মাঝে মাঝে আশঙ্কা হয়, যদি ইহার একখানা বাঁশের চেলা এদিক ওদিক সরিয়া যায় তাহা হইলে এই জীবনে একটা রাত্রি অন্তত মহাদেব হইয়া গোপৃষ্ঠে চড়িয়া দেখা যাইবে।

ঠাণ্ডা বাতাস, সমস্তটা দিন মনের উপর দুশ্চিন্তা চাপিয়াছিল,—এতক্ষণে একটু চোখ বুজিলাম। ঘুমাইয়া পড়িতে দেরি হইল না। পরক্ষণে বাঁশ মচ মচ করিয়া উঠিল। গ্রহের দৃষ্টি বুঝি কাটে নাই, ভাঙিয়া পড়ে নাকি? তাড়াতাড়ি চোখ মেলিয়া দেখি তাহা নয়, ঘনশ্যাম নামিয়া যাইতেছে।

কহিল, শুয়ে থাকুন, এক্ষুনি ঘুরে আসছি।

জিজ্ঞাসা করিলাম, আবার কোথায়?

কাছারিবাড়ি। বড্ড একটা ভুল হয়ে গেছে। যাব আর আসব। আপনি স্বচ্ছন্দে শুয়ে থাকুন।

ঘুম এমন আঁটিয়া আসিয়াছিল যে আর দ্বিরুক্তি করিলাম না। তারপর আর কিছুই জানি না। জাগিয়া উঠিলাম যখন ঘনশ্যাম হাত ধরিয়া টানাটানি করিয়া ডাকিতেছে: উঠুন, শিগগির উঠুন, ভোর হয়ে এল। কেউ না উঠতে কাছারির বিছানায় গিয়া ভাল-মানুষের মতো শুতে হবে—

বাহিরে আসিয়া দেখি, আকাশ পরিষ্কার—মেঘ কাটিয়া গিয়াছে। কৃষ্ণপক্ষের শেষাশেষি কি একটা তিথি। বিগতপ্রায় রাত্রির আকাশে পাণ্ডুর ক্ষীণ চাঁদ উঠিয়াছে। সাঁকোর উপর উঠিয়া ডান হাত দিয়া বাঁশ ধরিতে যাইতেছি, হাতের দিকে নজর পড়িতে চমকিয়া উঠিলাম। একি, রক্ত কোথা হইতে আসিল? দুপুর হইতে রক্তের বিভীষিকা দেখিতেছি, রাত্রির শেষ প্রহরে মুক্ত বিলের সীমানায় আমার সর্বাঙ্গ রক্তের আতঙ্কে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। ঘনশ্যাম পিছনে ছিল, ফিরিয়া দাঁড়াইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম: ঘনশ্যাম, দেখ, দেখ, আমার হাতে রক্ত এল কোত্থেকে?

চাহিয়া দেখি, ঘনশ্যামের মুখ শুকাইয়া গিয়াছে। জবাব কি দিবে, তাহারই কাপড়-চোপড় যেখানে সেখানে গাঢ় রক্তের মাখামাখি। কি-একটা অস্ফুট ভাবে বলিয়া তাহাই সে এক নজরে দেখিতেছিল।

সাঁকো হইতে নামিয়া আসিলাম। কঠোর স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম: এ কি? কি করেছ? আমায় সত্যি কথা বল।

ঘনশ্যামের কথা নাই।

তাহার দুই কাঁধ ধরিয়া প্রচণ্ড নাড়া দিয়া কহিলাম, শুনতে পাচ্ছ? রাত্তিরে বেরিয়েছিলে, কার সর্বনাশ করে এলে?

জিভ দিয়া ওষ্ঠ ভিজাইয়া লইয়া কোন গতিকে সে কহিল, ও এমনি—

এমনি এমনি আকাশ ফুঁড়ে রক্ত এল? আজ পাঁচ ছ'দিন ধরে তোমার কাণ্ড দেখছি। মালিক আমরা, মুনাফা আমাদের, কথা বলতে পারিনে। কিন্তু এর কি সীমা নেই? কাল পুলিশ এলে আমি নিজে সাক্ষি দিয়ে তোমায় খুনী বলে ধরিয়ে দেব।

বলিতে বলিতে মনে হইল বুঝি-বা কাঁদিয়া ফেলিলাম।

ঘনশ্যাম এমনি করিয়া তাকাইল, যেন আমার কথা বুঝিতে পারিতেছে না। কহিল, বাবু, ঠাণ্ডা হন—খুন হল কোথায় যে অমন করছেন?

রাত্তিরে উঠে কোথায় বেরিয়েছিলে? বলো, বলতে হবে—

এবার ঘনশ্যাম বিরক্ত হইল। কহিল, বলেছি তো কাছারি-বাড়িতে। একশ বার এক কথা। বলে, যার জন্যে চুরি করি—যাকগে, কর্তা নিজে যদি আসতেন আমার কদর হত। একটা ভুল হয়ে গিয়েছিল, তাই গিয়েছিলাম। ভুলচুক কার না হয় মশায়?

বলিয়া খালের কিনারায় হাত ও কাপড়ের রক্ত ধুইতে বসিয়া গেল। বলিল, আপনার হাতটা ধুয়ে ফেলুন, চিহ্ন রাখতে নেই। হাত ধরে আপনাকে ডেকে তুলবার সময় একটুখানি লেগে গেছে। যে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার, আগে টের পাইনি, এত রক্ত লেগেছে।

আমি কিন্তু অমন শান্ত হইয়া বসিয়া হাত ধুইতে পারিলাম না। বলিলাম, ঘনশ্যাম, কথাটা ভাঙছ না কেন? কি করে এলে বলো শিগগির।

ঘনশ্যাম কহিল, ভুল করে ফেলেছিলাম। থানায় এজাহার দিলাম, পাইকের পায়ে সড়কি মেরেছে। দারোগা জিজ্ঞাসা করল: কোন পায়ে? বললাম, বাঁ-পায়ে। শুয়ে শুয়ে মনে হল, বাঁ-পায়ে তো নয়—ডান পায়ে। ভাগ্যিস কথাটা মনে উঠল।

কহিলাম, ডান পায়েই ত। রজনীর প্রাণটা যাচ্ছিল আর একটু হলে, চোখ মেলে ওর দিকে কি চেয়েও দেখনি একটা বার?

ঘনশ্যাম বলিল, দেখেছিলাম বৈকি। সবই ঠিকঠাক লিখিয়ে দিয়েছি—কেবল ঐ একটা ভুল। ভুল আর কার না হয় বলুন, তবে

বড় মারাত্মক ভুল। সকালে দারোগা আসবে তদন্তে, মামলা ফেঁসে যাওয়ার জোগাড়। তাই রাত থাকতে থাকতে একবার নিজের চোখে দেখতে গেলাম।

কহিলাম, দেখে আর কি হল, গোলমাল যা হবার সে ত হয়েছেই।

আজ্ঞে, গোলমাল হবে ত এ অধীন আছে কি করতে? ভাবনা নেই, সব ঠিক করে দিয়ে এসেছি। রজনীর বাড়ি আপনি দেখেননি। চার পোতায় মাত্র একখানা ঘর, সে ঘরের আবার সামনে বেড়া নেই। সুবিধে হল। গিয়ে দেখলাম, বেহুঁস হয়ে ঘুমুচ্ছে। বৌটাও আর এক পাশে। ঠাউরে দেখি, জখম ডান পায়েই বটে। তখন সড়কি দিয়ে বাঁ-পায়ে আবার এক খুঁচিয়ে দিয়ে এলাম। বাবা গো—বলে যেই চেঁচিয়ে উঠেছে, আমি অমনি সুড়ুৎ করে সরে পড়লাম।

বলিয়া ঘনশ্যাম নিজের চতুরতায় হি-হি করিয়া হাসিতে লাগিল। বলিল, ডবল সুবিধে হল মশায়। এই নিয়ে রাইচরণের নামে ফের আর এক নম্বর চালাব। এখন বাকি রইল, ডান-পা বাঁ-পায়ের গোলমাল। আমি আগেই যাচ্ছি রজনীর বাড়ি, দারোগা জিজ্ঞাসা করলে যাতে বলে দিনে মেরেছিল বাঁ-পায়ে, রাতে ডান-পায়ে। আজ আর রজনী হেঁটে কাছারি আসতে পারবে না। তা শুয়ে শুয়েই সাক্ষি দেবে।

অভিভূতের মতো শুনিয়া যাইতেছিলাম।

ঘনশ্যাম কহিল, কই, হল আপনার হাত ধোয়া? চলুন।

কাছারিবাড়ির কাছাকাছি আসিয়াছি, এই সময়ে ঘনশ্যাম ডাইনের পথ ধরিল। বলিল, আপনি সোজা চলে যান। আমি রজনীর বাড়িটা ঘুরে এক্ষুনি যাচ্ছি।

কহিলাম, দাঁড়াও ঘনশ্যাম—

বোধকরি কণ্ঠস্বরের মধ্যে অস্বাভাবিক কিছু প্রকাশ পাইয়া থাকিবে। সে চমকিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইল।

বলিলাম, আমি আর থাকব না এখানে। এক্ষুণি কাশী চলে যাচ্ছি। তোমার ফেরবার আগেই রওনা হব। পয়লা মোটরে মধুগঞ্জে গিয়ে ট্রেন ধরতে হবে।

ঘনশ্যাম সন্ত্রস্ত হইয়া হাতজোড় করিয়া কহিল, আজ্ঞে, কি অপরাধ করলাম?

আমি বলিলাম, অপরাধের কথা নয়। আমি এসব পেরে উঠছি নে, বাবাকে পাঠিয়ে দেব, তাতে কাজের সুবিধে হবে।

ইহাতে ঘনশ্যামের মতদ্বৈধ নাই, অতএব প্রতিবাদ করিল না। কেবলমাত্র কহিল, কিন্তু অন্তত আজকের দিনটে থেকে যান। দারোগাবাবু আসবেন—আমরা আইন-টাইন ত তেমন বুঝিনে।

বলিলাম, ফল তাতে বড় সুবিধে হবে না ঘনশ্যাম, দারোগার সামনে হয়ত কি বলে বসব, কেস মাটি হয়ে যাবে। তাতে কাজ নেই।

বলিয়া হন হন করিয়া পথটুকু পার হইলাম।

কাশী গিয়া বাবাকে যেই খবরটা জানাইয়াছি অমনি যেন বারুদে আগুন লাগিল। বলিলেন, যাক প্রাণ, রোক মান। তুমি কোন লজ্জায় পালিয়ে এলে বাপু? রাইচরণের মুণ্ডুটা আনতে পারলে না, যেত দু-পাঁচ হাজার—যেত। আমার কি? আমার আর ক'দিন? চোখ বুজলে সব ফক্কিকার--

বলিয়া গুম হইয়া বসিয়া খানিকক্ষণ বোধকরি সংসারে নশ্বরতাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। বলিলেন, এই গ্যাঁট হয়ে বসে রইলাম। নাগপুরেও যাচ্ছিনে, দেশেও না। বিষয়-আশয় কারবার-পত্তোর সব গোল্লায় যাক, কারও যখন গরজ নেই। আর যদি কোনদিন নড়ে বসি তাহলে—

একটা ভয়ানক রকমের শপথ করিতে গিয়ে সামলাইয়া লইলেন। বুদ্ধির কাজ করিয়াছিলেন, কারণ শপথ সন্ধ্যা নাগাদ ত ভাঙিতেই হইল।

বিকালবেলায় জিনিসপত্র গোছাইবার ধুম পড়িয়া গেল।

আয়োজন গুরুতর। পাঁচজন পশ্চিমা গুণীলোক সঙ্গে যাইতেছে আর যে কি কি যাইতেছে তাহার সঠিক খবর বলিতে পারি না, আন্দাজ করা চলে। বলিলেন, না মরলে আমার অব্যাহতি আছে? ছাগল দিয়ে লাঙল চষা হলে লোকে আর ষাঁড় কিনত না।

ইঙ্গিতটা আমাকে উপলক্ষ করিয়া। কিন্তু অনর্থক। আমি ত কোনদিন ষণ্ডত্বের গৌরব করি নাই।

বাবা ততক্ষণে ট্রেনে চাপিয়া হয়ত মোগলসরাই পার হইয়া গেলেন। বীণা প্রশান্ত চোখ দুটি আমার দিকে মেলিয়া শুইয়াছিল। আমি রজনী পাইকের গল্প বলিতেছিলাম। হঠাৎ সে চোখ বুজিয়া জড়সড় হইয়া মাথাটি আমার কোলের মধ্যে গুঁজিয়া দিল। বলিল, তুমি থাম, আমার ভয় করে—

আমি কহিলাম, বীণা, তবু ত সে রক্ত তুমি চোখে দেখনি। বলির পাঁঠার রক্ত যেরকম গলগল করে বেরিয়ে আসে, তেমনি—

বীণা কথা কহিল না। আলগোছে হাত দুখানা বাহির করিয়া আমার মুখ চাপিয়া ধরিল। চক্ষু তেমনি বোজাই আছে।

খানিক পরে চোখ মিট-মিট করিয়া চাহিয়া দেখিল, চুপ করিয়া বসিয়া বসিয়া আমি কি করিতেছি। আর মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তারপর আবার চোখ বুজিয়া দিব্য ভালোমানুষের মতো ঘুমাইতে শুরু করিল।

বাবা ফিরিলেন দিন পনের পরে। আবার গেলেন। এমনি যাতায়াতে বছর খানেক কাটিল। আগে যে মুখ গম্ভীর বিমর্ষ থাকিত, ক্রমশ তাহাতে হাসি ফুটিয়া উঠিল। বলিলেন, ঘনশ্যাম খুব জাঁহাবাজ। টাকাকড়ি একটু এদিক-ওদিক করে বটে, কিন্তু ক্ষমতা আছে। ত্যাঁদোড় যে কটা ছিল, সব ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এখন উঠতে বললে ওঠে, বসতে বললে বসে। মহল একেবারে যাকে বলে পায়রা-চোখো—

আমার কেমন ধারণা হইয়াছিল, রাইচরণ বাঁচিয়া থাকিতে বিবাদ মিটিবে না। বাবার সেই পাঁচ হাজারের বিনিময়ে মুণ্ড

আনিবার আক্রোশটাও মনে ছিল। জিজ্ঞাসা করিলাম : রাইচরণ মরেছে না দেশ ছেড়েছে ?

বাবা কহিলেন, মরেও নি, দেশও ছাড়ে নি। উচ্ছেদ করেছিলাম, তা বউ ছেলেপিলে নিয়ে কাছারি এসে পায়ে জড়িয়ে ধরল। ভাবলাম, চাষীদের মধ্যে সব চেয়ে মানীবংশ—যখন এতটা কাবু হয়েছে, যাকগে। পাইপয়সা না নিয়ে সেই মৌরুসী পঁচিশ বিঘে কবলা করে দিয়ে গেল। আর ঘনশ্যামকে বলেছে ধর্মবাপ। এবার একবার গিয়ে দেখে এসো না—মাথা তুলে কথা কইবে, তেমন বাপের বেটা ও-তল্লাটে কেউ নেই।

মধুসূদনকে মনে মনে স্মরণ করিয়া সভয়ে প্রার্থনা করিলাম, যেন দেখিয়া আসিবার প্রয়োজন সেবারকার মতো আর কখনো না হয়।

কিন্তু মধুসূদন সে প্রার্থনা শুনেন নাই।

ইহার কিছুদিন পরেই কেবলমাত্র চোখের-দেখা দেখিয়া আসা নয়—দেশে চিরস্থায়ী বসবাস করিবার প্রয়োজন ঘটিল। বাবা স্বর্গীয় হইলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে কারবারটিও। বীণা বাপের-বাড়ি গিয়াছিল, মাকে শ্যামবাজারে মাতুলালয়ে আনিয়া রাখিলাম। তারপর বাড়িঘর মেরামত করিয়া বাসযোগ্য করিবার জন্য ঘনশ্যামের সুশাসিত নিরুপদ্রব মহালে অনেকদিন পরে আবার আসিয়া পৌঁছিলাম।

না, ইতিমধ্যে দেশের বিস্তর উন্নতি হইয়াছে বটে। গঞ্জের আটখানা দোকানে টিনের চাল দিয়াছে। আধঘণ্টা অন্তর বাস, কোন অসুবিধা নাই। বাসের ছাতের উপর বাক্স বোঝাই হইয়া শহরে মাছ চালান যায়। নূতন পোস্ট-অফিস হইয়াছে। মাঝে মাঝে দেশ-বিদেশের ভদ্রলোকেরা বন্দুক লইয়া বিলে পাখী শিকার করিতে আসেন। মাছ চালান দিতে অনেক বরফের দরকার হয় বলিয়া একটি আইস-ফ্যাক্টরি খুলিবার কথা হইতেছে। কোন একটা কোম্পানি জায়গাও দেখিয়া গিয়াছে। গ্রামের প্রান্তে

তিনটি তাড়িখানা। এবার নাকি একটি মদের দোকানের ডাক হইবে। মোটের উপর সর্বরকমে সুবিধা—যা চাও তা-ই মিলিবে।

সর্বাগ্রে উঠানের জঙ্গলগুলি কাটাইবার দরকার। সকালবেলা ঘনশ্যামকে লইয়া নিজেই বাহির হইলাম—প্রাতভ্রর্মণ হইবে, মজুরের তল্লাসও হইবে। কিন্তু মজুর পাওয়া কঠিন—অঞ্চলে মোটে চাষাভুষা নাই, তা পাইবে কোথায়? খালি খালি ভিটা পড়িয়া রহিয়াছে। দু-চারজন যাহারা আছে, অবস্থা ভাল হইয়া গিয়া তাহারা আর মজুরি করিতে চাহে না। অবস্থা ভাল হইয়াছে, ঘনশ্যামের মুখে শুনিলাম। নিচু নিচু জীর্ণ কুঁড়েগুলি দেখিয়া মনে হয় বইয়ে যে বীবরের বাসস্থান পড়িয়াছি, তাহা বোধ করি এই প্রকার। ইহার মধ্যে মানুষ যে সত্যসত্যই ঘরসংসার করিয়া বাঁচিয়া থাকে, আর তাহাদের ভাল অবস্থা হইয়াছে চোখে না দেখিলে তাহা বিশ্বাস হইবার কথা নয়।

দুই জনের বাড়ি হইয়া তারপর গেলাম চরণ বেপারির বাড়ি। চরণ দেখি কাঁচের গেলাসে করিয়া কি খাইতেছে। ঘনশ্যামকে বলিল, নায়েব মশায়, বিশ্রী অভ্যাস হয়ে গেছে। সকালে উঠে আগে চাই মিছরির পানা। নইলে মাথা ধরবে।

রোগ কঠিন বটে।

বলিলাম, ও চরণ, ভাল আছিস? আজকাল বেশ পয়সাকড়ি কামাচ্ছিস—না?

চরণ চিরদিনই বিনয়ী লোক। মুখখানা কাচুমাচু করিয়া জোড়হাতে বলিল, যে আজ্ঞে। লক্ষ্মীর কিরপা মুখ ফুটে কি বলব, আপনার মা-বাপের আশীর্বাদে হচ্ছে একরকম। বাবু, এলেন কবে?

ঘনশ্যাম বলিল, বাবুরা সব দেশে-ঘরে চলে আসছেন। বাড়ির বাগান সাফ হবে। আজকে জোন খাটবি চরণ?

চরণ বলিল, খাটব। তারপর ঘাড়টা ডানদিকে কাত করিয়া আবার বলিল, খাটব। বাবুরা এসেছেন, খাটব না?—নিশ্চয় খাটব।

তবে যান সকাল সকাল। বলিয়া বাহির হইলাম। পিছন হইতে ডাকিল : নায়েব মশায়।

হুজনেই ফিরিয়া দাঁড়াইলাম।

চরণ হাসিয়া বিচিত্র ভঙ্গিতে বলিল, একটা টাকা। জোনের দাম আগাম না দিতে পারেন, চোটা হিসেবে দিন। দিন হু' পয়সা সুদ—যা রেট আছে। আজকের সুদ কেটে নিয়ে সাড়ে পনেরো আনাই দিয়ে দিন বরং।

ঘনশ্যাম কহিল, সকালবেলা টাকা কি হবে ?

আমরা বাড়ির মধ্যে ঢুকিবার সঙ্গে সঙ্গে চরণের বৌ মাথায় কাপড় টানিয়া লজ্জায় জড়সড় হইয়া উঠানের এককোণে বসিয়া ঝাঁট দিতেছিল। আঙুল দিয়া তাহাকে দেখাইয়া চরণ কহিল, মাগীর বজ্জাতি। বলছে চাল বাড়ন্ত। সব চাল বেচে খেয়েছে, থাকবে কোত্থেকে ?

এতবড় অভিযোগের পর লজ্জাবতী আর বসিয়া থাকিতে পারিল না। উঠিয়া দাঁড়াইয়া ঘোমটা আরো একটু বাড়াইয়া দিয়া এক' প্রকার স্বগত ভাবেই বলিয়া উঠিল, বেয়াক্কিলে কথা। সব চাল বেচে খেয়েছে—কত চাল এসেছিল শুনি ?

চরণ কহিল, কাল পাঁচসিকের মাছ বিক্রি হল, তার হিসেব দে। শিগ্‌গির।

বৌয়ের হিসাব-জ্ঞান খুব প্রখর বলিতে হইবে। অমনি মুখে মুখেই তৎক্ষণাৎ শুরু করিল : শোন্‌। চুরি করে খেয়েছি নাকি ? এই সরু বালাম চাল হু সের ছ আনা, ঘি সাড়ে সাত আনা, মিছরি গরমমশলায় হল সাত পয়সা আর রইল এক পয়সা, তুই বললিনে যে এক পয়সা রেখে কি হবে—কপ্পূর কিনে নিয়ে আয়, জলে দিয়ে খাওয়া যাবে। সে কি আমার দোষ ?

হিসাব পাইয়া চরণের আর কথা বলিবার উপায় রহিল না।

ঘনশ্যাম জিজ্ঞাসা করিল : কাল রাত্তিরে বুঝি কিছু হয় নি ?

চরণ কহিল, না। কাল বড্ড পাহারায় ছিল। কোন দিন যে

কি হবে, কিছু ঠিক করে বলবার যো নেই। তবে মোটের উপর ব্যবসাটা ভাল। বেশ আছি, কোন ঝক্কি নেই বাবা। মাঠের উপর হাঁটুজলে হৈ-হৈ করে গোরু তাড়িয়ে লাঙল চষে বেড়ানো—রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, ও সব কি আর পোষায়?

পথে আসিয়া চরণ বেপারির ব্যবসার কথাটা পাড়িলাম। কি এমন সুবিধা-জনক ব্যবসা সে আরম্ভ করিয়া দিয়াছে?

ঘনশ্যাম খুলিয়া বলিল। একা চরণ বেপারি নয়, চাষীদের মধ্যে যাহারা এখনো এ অঞ্চলে টিকিয়া রহিয়াছে, সকলেই ইহা ধরিয়াছে। ব্যবসাটা ভাল। রাত্রিবেলা ঘণ্টা তিন-চারের কাজ মোটে। সারা দিনমান সকাল দুপুর সন্ধ্যা কখনও কোন পুরুষ মানুষকে নড়িয়া বসিতে হয় না। পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিয়া দেখ—হয় ঘুমাইতেছে, নয় তাস খেলিতেছে, নয় ত তাড়ি খাইতেছে। দশটা বেলা না হইতেই সাবান ও গন্ধ তৈল লইয়া দলে দলে পুকুরঘাটে নাহিতে বসে। চুল বাগাইয়া টেরি কাটিতে সময় কিছু যায়। গভীর রাত্রিতে গ্রামের মধ্যে যখন নিশ্চল নিষুপ্তি, সেই সময়ে জাল ঘাড়ে কুঁড়ে হইতে টিপি টিপি এক এক জন বাহির হইয়া পড়ে। পরস্পর ফিসফিস করিয়া কথা, ঝুপ করিয়া এক এক বার জাল পড়ার শব্দ—আবার ভোর হইবার আগে যে যার ঘরে ফিরিয়া আসে। জেলেদের পাহারার যে ব্যবস্থা আছে তাহা যথেষ্ট নয়। অতবড় সুবিস্তীর্ণ বিলের সবদিকে তাহারা নজর রাখিতে পারে না। আর ইহারাও সুযোগ-সন্ধান সমস্ত শিখিয়া ফেলিয়াছে। তবে নিতান্ত বেকায়দায় পড়িলে পিঠের উপর কোন দিন দুই-এক ঘা যে না পড়ে তাহা নহে। কিন্তু তাহার বেশি আর কিছু নয়। দু-দশটা মাছ চুরি জেলেরা তেমন গ্রাহ্যের মধ্যে আনে না।

সকাল হইতে কাজ মেয়েদের। মাছ গঞ্জে লইয়া বেচিয়া বাজার করিয়া যাবতীয় ঘরকন্নার কাজ সারিয়া রাঁধিয়া পুরুষমানুষদের ডাকিয়া তুলিয়া খাওয়াইতে হয়। তা মন্দ নয়, এরা আছে বেশ।

খালের জলে পা ধুইয়া উঠিব, খালধারের এক বাড়ির দাওয়া হইতে প্রবল চিৎকার আসিতেছে : নায়েব মশায়, ইদিকে আমাদের বাড়ি একবার হয়ে যাবেন—

ঘনশ্যাম বলে, এই রে! চলুন চলুন—

ডেকে ডেকে গলা ভাঙছে। শুনে এসো না, কি বলে।

ঘনশ্যাম বলিল, বদ্ধ পাগল। একদম মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

দ্রুত চলিতেছিল, পাগল দাওয়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া আমাদের পথ আটকাইল। আমাকে দেখিয়া একগাল হাসিয়া ফেলিল। হাত জোড় করিয়া বলিল, ছোটবাবু পাড়ায় এলেন, তা আমার বাড়ি পদধূলি পড়বে না?

ইহাকে চিনি ত। সেবার আসিয়া দেখিয়াছি, সুস্থ বলিষ্ঠ লোক। পাঠশালায় পণ্ডিতি করিত, পাড়ার বিবাদ-বিসম্বাদে সালিসি করিত, চিঠিপত্র দলিল-দস্তাবেজ লিখিয়া দিত। এখন যেন একটি মড়া হাত-পা মেলিয়া বেড়াইতেছে।

ঘনশ্যাম বলিল, না খেয়ে শুকিয়ে নির্বংশ ভিটেয় পড়ে আছ, গড়ভাঙায় চেপে বোসো না কেন? তারা যত্ন করছে, খাওয়া-পরা দেবে, দু'টাকা নগদ মাইনেও দেবে বলছে—

পণ্ডিত আমার দিকে চাহিয়া বলে, শুনুন হুজুর, পাগলের কথাবার্তা শুনুন। ভিন গাঁয়ে গিয়ে পাঠশালা বসাব, ওদিকে যথাসর্বস্ব উচ্ছন্ন যাক। এঁদের তো তা-হলে পোয়াবারো—

বলিয়া হা-হা করিয়া উচ্চহাসি হাসিতে লাগিল।

ঘনশ্যাম বিদ্রূপ করিয়া বলে, যথার মধ্যে ত ঐ ফুটো ঘর, আর সর্বস্বের মধ্যে ছেঁড়া দপ্তর—

পণ্ডিত এই কথায় জ্বলিয়া উঠিল।

ছেঁড়া বলে নাক সিঁটকাচ্ছ? ছেঁড়া দপ্তরে আমার লাখ টাকার দলিল, তা জানো?

পাগল একেবারে আমার হাত ধরিয়া ফেলিল : আসুন হুজুর,

আসতেই হবে আমার বাড়ি। মস্ত বড় উকিল আপনি, একবার এসে দেখে যান আমার দলিল। বলছে, কিছু নেই নাকি আমার? বলছে, নির্বংশ ভিটে? আসুন আসুন—

সে কি টান। ঘোড়দৌড় করাইয়া লইয়া যাইতেছে। ঘরের ভিতর হইতে ছুটিয়া দলিলের দপ্তর আনিল। মলিন শতচ্ছিন্ন কাপড়ে বাঁধা। দপ্তর খুলিয়া এক একটা করিয়া কাগজ আমার হাতে দিতেছে। বলে দেখুন, দেখছেন? কিচ্ছু নেই নাকি আমার? আপনি মনিব—আপনার নামেও মোকর্দমা করব, যা ছিল বিলকুল আবার ফিরিয়ে আনব।

সত্যই পুঁটিমারির বিলে অনেক জমি পণ্ডিতের। বিশ বছরের দাখিলা বাহির করিয়া দিল। যেবার অজন্মা গিয়াছে, খাজনা দিতে পারে নাই—পরের বৎসর সুদ খেসারত দিয়া খাজনা শোধ করিয়াছে।

ঘনশ্যাম বলিল, এতকাল না-হয় দিয়েছ মানি। কিন্তু এই পাঁচ বছর—বিলডুবি হয়ে গেল যেখান থেকে? বাকি খাজনায় নিলাম হয়ে গেছে তোমার জমি, এস্টেট থেকে কিনে নিয়েছে। পচা দাখলেয় তা ফিরবে না। ফেলে দাও ফেলে দাও ওসব, পুড়িয়ে ফেল—

রুষ্ট চোখে তাহার দিকে এক নজর তাকাইয়া পণ্ডিত দলিলের পর দলিল বাহির করিতে লাগিল। তারপর একগাদা চিঠি। সেগুলি ফিরাইয়া দিয়া বলিলাম, প্রাইভেট চিঠিপত্র এগুলো আলাদা করে রাখবেন পণ্ডিত মশায়।

দৃঢ় কণ্ঠে পণ্ডিত বলে, এ-ও দলিল আমার, বিষম দলিল। রেখে দিয়েছি, মোকর্দমা করব—

বড় মেয়ে বিজয়ার পর শ্বশুরবাড়ি হইতে প্রণাম জানাইয়া পোস্টকার্ড দিয়াছে···কুশখালি হইতে লিখিয়াছে, কুটুম্বের দল সদলবলে ছেলের পাকা-দেখা দেখিতে আসিতেছে, নাতির অন্নপ্রাশনে পণ্ডিতের স্বহস্তে-লেখা লালকালির নিমন্ত্রণপত্র খান দুই বাড়তি ছিল, তাহাও রহিয়াছে···অজস্র ভুল বানানে কাঁচা হাতের

লেখা একখানা খামের পত্র—কোন এক নূতন বউ বরকে পাঠ দিয়াছে 'প্রাণেশ্বর'…

পাগল পণ্ডিত সগর্বে বলে, দেখলেন? কিচ্ছু নেই নাকি আমার? ঘনশ্যামের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিক্ষেপ করিয়া অতিযত্নে সে দপ্তর বাঁধিতে লাগিল।

ফিরিবার পথে রাইচরণের বাড়ি। সেই রাইচরণ দাস, যাহার মুণ্ডের প্রতি বাবার অত আগ্রহ ছিল।

ঘনশ্যাম বলিল, যাবেন ওর বাড়ি? আজকাল মজুরি খাটে।

আমি বলিলাম, বেলা হয়ে গেছে, আজ থাক।

ঘনশ্যাম বলিল, না না—দেখে যাই, চলুন। উঠানে গিয়া ডাকিল: রাইচরণ? ও রাইচরণ?

লম্বাচওড়া বিশাল দেহ লইয়া সামনে দাওয়ার উপর পড়িয়া আছে, তবু উত্তর দিবে না। বেটা মরিয়া গেল নাকি?

কিন্তু গরজ আমার, ডাক দিলাম: ও রাইচরণ, অসুখ করেছে?

এবার অস্ফুট সাড়া আসিল: উঁ?

বলিলাম, বেলা দুপুর হয়ে গেছে, এখনো ঘুমুচ্ছ?

চোখ দুইটা মেলিয়া আমার দিকে তাকাইল, টকটকে রাঙা যেন দু'টি গুলি। দেখিয়া ভয় করে। একেবারে মেয়েমানুষের মতো রাইচরণ ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল।

ঘনশ্যাম বলিল, আকণ্ঠ তাড়ি গিলেছিস বুঝি? আজকে জোন খাটতে যাবি?

যাব বলিয়া স্বীকার করিয়া সে ঘুমাইতে শুরু করিল।

বেলা বাড়িতেছিল, ইহার কাণ্ড দেখিয়া আর রাগের সীমা রহিল না। ঘনশ্যামকে বলিলাম, চল, যাওয়া যাক। বেটা মাতাল—

কথাটা রাইচরণের কানে গিয়াছিল—ধীর গম্ভীরভাবে উঠিয়া বসিল। তারপর একখানা পা বাড়াইয়া দিয়া কোণের চাউলের কলসিটায় ঠন করিয়া লাথি মারিতেই ভিতরে নড়িয়া উঠিল। তৎক্ষণাৎ শুইয়া পড়িয়া কহিল, না, আমি যাব না।

ঘনশ্যাম কহিল, ঘরে চাল আছে, আর কি বেটা নড়বে? চলুন—

রাইচরণও হাত নাড়িয়া আমাদের চলিয়া যাইতে ইঙ্গিত করিয়া বলিল, গতর খাটানো ছোট কাজ, ও-সব আমি করিনে—

দিন পনেরোর মধ্যে বাড়ির জঙ্গল একদম সাফ হইয়া গেল, আবার শ্রী ফিরিল। চার-পাঁচটা কুঠরির চুনকাম করিয়া একেবারে নূতনের মতো হইয়াছে, আর আর যাহা কাজ আছে ধীরে সুস্থে পরে করিলেই চলিবে। জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হইয়া গেল, আষাঢ়ের প্রথমেই নূতন সংসার পাতিবার আর কোন বাধা নাই। একদিন বিকালে সাগরগোপের ইস্কুলঘরের কাছে বল্লভ রায়ের রাস্তায় আসিয়া দাঁড়াইলাম। বেশিক্ষণ দাঁড়াইতে হইল না, বাস আসিল। গাড়িতে উঠিয়া দিব্য আরাম করিয়া গদির উপর বসিলাম।

আর একদিন ছেলেবয়সে ছোটকাকার বিয়েয় এই পথে কত দৌড়াদৌড়ি করিয়া মরিতে হইয়াছিল। দেশের কি আর সেদিন আছে?

তীরের মত ছুটিয়া চলিয়াছি। দূরের গ্রাম হইতে এক পাল গোরু চরাইয়া রাখালেরা ফিরিয়া আসিতেছে। গাড়ি হর্ন বাজাইতে বাজাইতে পালের মাঝখান দিয়া চলিল। এ পথে এমন হইয়াছে যে গোরুগুলো পর্যন্ত আজকাল মোটরগাড়ি ভ্রূক্ষেপ করে না।

মুক্ত বিলের বাতাসে রাস্তার দুই পাশে ছলছল শব্দে জলের আঘাত লাগিতেছে। যতদূর যায়, কেবলি সীমাহীন জলরাশি। জলের মধ্যে এখানে সেখানে তাল ও শিমুল গাছ। চারিদিক অন্ধকার করিয়া মেঘ জমিয়া আসিল। দু-একটি লোক ছাতা খুলিয়া পাশ কাটাইয়া চলিয়া যাইতেছে, হেডলাইট জ্বালিয়া গাড়ি ছুটিতেছে, চতুর্দিকের নিস্তব্ধতার মধ্যে মোটর-এঞ্জিনের একটানা আওয়াজ।

মাঝে মাঝে পথ গিয়াছে সাপের মতো আঁকিয়া বাঁকিয়া। বাঁক

ফিরিবার মুখে গাড়ির তীব্র আলো এক একবার জলের উপর পড়ে। বল্লভ রায়ের উঁচু পাকা রাস্তা, মানুষের ঘরবাড়ি ডুবিয়া যায়, কিন্তু রাস্তার উপর জল উঠে না। মোটর হর্ন বাজাইয়া নির্বিঘ্নে ছুটিতে লাগিল।

হঠাৎ একটি গাছের তলায় আসিয়া গাড়ি থামিয়া গেল। ড্রাইভার নামিয়া পড়িল, ম্যাগনেটে কি দোষ হইয়াছে, পাঁচ মিনিটের মধ্যেই ঠিক হইয়া যাইবে। যাত্রীরাও সকলে নামিয়া পড়িলাম। গাছটিকে চিনিলাম অশ্বত্থ গাছ। সামনেই নূতন পুল। দেখিতে দেখিতে পিছন হইতে তিনখানা বাস পর পর আমাদের পাশ কাটাইয়া আগে চলিয়া গেল। উজ্জ্বল আলোকে অশ্বত্থ গাছের আগাগোড়া টার্নার ব্রিজ এবং রাস্তার বহুদূর অবধি উদ্ভাসিত হইল। এই অশ্বত্থ গাছের তলা দিয়া লক্ষ টাকা দিলেও কেহ যাইতে চাহিত না। আজ আর সেদিন নাই। গাছের ডালপালা ছাঁটিয়া বেশ পরিষ্কার করিয়া দেওয়া হইয়াছে, যাহাতে গাড়ি চালাইবার কোন অসুবিধা না হয়।

পাঁচ মিনিটের জায়গায় পনের মিনিট কাটিয়া গেল, কিন্তু আমাদের গাড়িখানি যেমন স্থাণু হইয়াছিল, তেমনি রহিল। বেড়াইতে বেড়াইতে ব্রিজের উপর গিয়া দাঁড়াইলাম। নিম্নে সঙ্কীর্ণ পরিসরের মধ্য দিয়া পুঁটিমারি বিলের সুবিপুল জলরাশি বাহির হইবার চেষ্টায় পাক খাইয়া প্রচণ্ড আলোড়নের সৃষ্টি করিতেছে। লোহার কপাট ফেলা আছে। জলের এমন উন্মত্ত গর্জন, যেন এক সঙ্গে সহস্র মানুষ ঐ লোহার কপাটে মাথা ঠোকাঠুকি করিয়া মরিতেছে। চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। মনে হইল, এমনি একাগ্রে যদি নিশীথ রাত্রি অবধি কান পাতিয়া থাকিতে পারি, তবে নিশ্চয় জলের ভাষা বুঝিতে পারিব। বহুকাল পূর্বে এক নিরীহ ঘুমন্ত শিশুর রক্ত দিয়া এখানে বাঁধ বাঁধা হইয়াছিল, জলস্রোত সে বাঁধ ভাসাইয়া লইয়া গিয়াছিল। এবার গভর্নমেণ্ট বড় বড় ইঞ্জিনিয়ার লাগাইয়া লোহালক্কড়ে অপূর্ব সেতু বাঁধিয়াছেন—নিষ্ফল

আক্রোশে বিলের জল গর্জন করিয়া মরিতেছে, সেতুর একটা লোহাও ঢিলা করিতে পারে না।

সেকালের নরবাঁধের কথা মনে পড়িল, ছোটকাকার বিয়ের কথা মনে পড়িল, দ্বারিক দত্তর কথা মনে পড়িল। একদিন আসন্ন সন্ধ্যায় গামছা পরিয়া কোমরজল ভাঙ্গিয়া এই বাঁধ পার হইতে হইতে বলিয়াছিলেন, সহস্র নরবলি না হইলে এই খাল নাকি বাঁধা হইবে না। মিথ্যুক বুড়া। খাল বাঁধা হইয়া গিয়াছে, সহস্র বলি হইল কই?

বরঞ্চ দেখি, দেশের দিন ফিরিয়াছে—চারিদিকে আনন্দ—হাসি। জলের শব্দে যেন উচ্ছল হাসির শব্দ শুনিতে লাগিলাম। চরণ বেপারি হাসিয়া বলিতেছে, হেঁ হেঁ সকালে উঠে মিছরির পানা আগে চাই। রাইচরণ পা দিয়া চালের কলসি নাড়িয়া দেখিতেছে, ঠন-ঠন করিয়া বিলের জলের মধ্যে যেন সেই কলসির আওয়াজ হইতে লাগিল। তাড়ি খাইয়া পাঁচু মণ্ডল, রাখু, বিশে সকলে যেন হল্লা করিয়া কোমরে হাত দিয়া ঐ জলের মধ্যে বাইনাচ করিতেছে, আর বলিতেছে, বেশ আছি···বেশ আছি···ঝক্কি নেই, খাসা আছি—

একজন সহযাত্রী আমার দিকে আসিলেন। কহিলেন, বড় ঘুরঘুট্টি অন্ধকার এই যা। নইলে, নরবাঁধ বেড়াবার বেশ জায়গা।

আমি বলিলাম, নরবাঁধ বলছেন কাকে? সে সব আর নেই। এ হল টার্নার ব্রিজ—

একটা পয়সা—

কে রে? তাকাইয়া দেখি, অন্ধকারের মধ্যে ছোট একটি ছেলে আসিয়া আমাদের মধ্যে দাঁড়াইয়াছে। আশ্চর্য হইয়া প্রশ্ন করিলাম: এইটুকু ছেলে তুই, এখানে কোত্থেকে এলি?

জবাব না দিয়া ছেলেটি হাত পাতিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

তারপর মুখ ফিরাইয়া দেখি, একটা দু'টা নয়—পিঁপড়ার সারির মতো অশ্বথতলা দিয়া ছায়াচ্ছন্ন অনেক মূর্তি আসিতেছে—গণিয়া শেষ করা যায় না, এত। বিলের কোন্ নির্নিরীক্ষ প্রান্ত হইতে বাহির হইয়া রাস্তা পার হইয়া একে একে টার্নার ব্রিজের উপরে

তাহারা উঠিতে লাগিল। কঙ্কালসার দেহ—প্রাণ আছে কিনা সন্দেহ, কলের পুতুলের মতো আমাদের সামনে আসিয়া নিঃশব্দে হাত পাতিয়া দাঁড়াইতে লাগিল। শিহরিয়া উঠিলাম। সহযাত্রী মহাশয় বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। বলিলেন, দেখছেন কি, এই হয়েছে বেটাদের পেশা। ঐ সব গ্রামের লোক, গ্রাম-ট্রাম আর একটা লোক পেলে যেন ছেঁকে ধরবে মশায়। হারামজাদাদের পুলিশেও ধরে না।

অকস্মাৎ সেই কৃষ্ণছায়াগুলি কথা কহিয়া উঠিল। অতি ক্ষীণ কণ্ঠস্বর—কিন্তু সেই ছলছলায়িত বিলের প্রান্তে ঘনান্ধকার বর্ষারাত্রির উন্মুক্ত শীতল বায়ুপ্রবাহের মধ্যে আমার মনে হইল, ইন্দ্রিয়াতীত অশরীরী জগৎ হইতে রক্তমাংসের মানুষের উদ্দেশে শত সহস্র প্রেমমূর্তি হাহাকার করিয়া উঠিতেছে। কি তাহারা বলিল, বহুজনের সমবেত কাকুতির মধ্যে তাহার একবিন্দু বুঝিলাম না, শুধু মাথা হইতে পা অবধি বিদ্যুৎ-স্পর্শের মতো সুতীব্র কম্পন বহিয়া গেল। হঠাৎ মোটর হইতে তীব্র আলো জ্বলিল, কল ঠিক হইয়া গিয়াছে। ড্রাইভার চিৎকার করিয়া উঠিল: রাস্তা ছাড়্, তফাৎ যা, তফাৎ—

মূর্তিগুলি ছুটাছুটি করিয়া রাস্তার নিচে যে অদৃশ্য প্রান্ত হইতে বাহির হইয়াছিল, মুহূর্ত মধ্যে সেখানে বিলুপ্ত হইয়া গেল।

আবার দ্বারিক দত্তর কথা মনে পড়িল। দাড়ি নাড়িয়া তিনি কি বলিতেছেন। বুড়া মারা গিয়াছেন বছর আষ্টেক আগে। ভাবিলাম, বুড়াকে মিথ্যুক বলিয়াছিলাম—প্রেতভূমি হইতে তাই কি ডজন পাঁচ-ছয় আমদানি করিয়া বলির নমুনা দেখাইয়া গেলেন?

মৌজাটি নিতান্ত ছোট নয়। অগ্রহায়ণ হইতে জরিপ চলিতেছে, খানাপুরি শেষ হইল এতদিনে। হিঞে-কলমির দামে আঁটা নদীর কূলে বটতলার কাছাকাছি সারি সারি তিনটি তাঁবু পড়িয়াছে। চারিদিকে বিস্তীর্ণ ফাঁকা মাঠ।

শঙ্কর-ডেপুটি সদর-ক্যাম্প হইতে আজ আসিয়া পৌঁছিয়াছে। উপলক্ষ একটা জটিল রকমের মকদ্দমা। ছোকরা মানুষ, ভারি চটপটে—পত্নীবিয়োগের পর হইতে চাঞ্চল্য যেন আরও বাড়িয়া গিয়াছে। আসিয়াই আমিনের তলব পড়িল।

আমিনকে ডাকিতে পাঠাইয়া একটা চুরুট বাহির করিল। চুরুটের কৌটায় সেই সাত মাস আগেকার শুকনো বেলের পাতা কটি এখনও রহিয়াছে।

সাত মাস আগে একদিন বিকালবেলা তাহাদের দেশের বাড়িতে দোতলার ঘরে ঢুকিয়া শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিয়াছিল: সুধারানী, কালকে কি বার?

সুধা বলিয়াছিল, পাঁজি দেখগে যাও, আমি জানিনে। তারপর হাসিয়া চোখ দুটি বিস্ফারিত করিয়া বলিয়াছিল, চলে যাবেন, তাই ভয় দেখানো হচ্ছে! ভারি কিনা ইয়ে—

শঙ্করও খুব হাসিয়াছিল। বলিয়াছিল, যদি মানা করো, তবে না হয় যাইনে।

থাক!

কোনো জবাব না দিয়া সুধারানী অত্যন্ত মনোযোগের সহিত কাপড় কোঁচাইয়া পাট করিতে লাগিল। শঙ্কর তাহার হাত ধরিয়া কাছে আনিল।

শোনো সুধারানী, উত্তর দাও।

বা-রে, পরের মনের কথা আমি জানি বুঝি!

নিজের তো জান ?

তবু কথা কহে না দেখিয়া শঙ্কর বলিতে লাগিল, আমি চলে যাব বলে তোমার কষ্ট হচ্ছে কিনা সেই কথাটা বলো আমায়, না বললে শুনছিনে কিছুতে।

না।

সত্যি বলছ ?

না—না—না। 'বলিয়া হাত ছাড়াইয়া সুধা বাহির হইয়া যাইতেছিল। শঙ্কর পলায়নপরার সামনে গিয়া দাঁড়াইল।

মিছে কথা। দেখি, আমার দিকে চাও—কই, চাও দিকি সুধারানী।

সুধা তখন দুই চক্ষু প্রাণপণে বুজিয়া আছে। মুখ ফিরাইয়া ধরিতেই ঝরঝর করিয়া গাল বাহিয়া চোখের জল গড়াইয়া পড়িল। আঁকিয়া বাঁকিয়া পাশ কাটাইয়া বধূ পলাইল।···

শেষ রাতে বৃষ্টি নামিয়াছে। লক্ষ্মণ বাহির হইতে ডাকিল, ছোটবাবু, ঘাটে স্টিমার সিটি দিয়েছে।

সুধারানী গলায় আঁচল বেড়িয়া প্রণাম করিল। কহিল, দাঁড়াও একটু। তাড়াতাড়ি কুলুঙ্গির কোণ হইতে সন্ধ্যাকালে গোছাইয়া-রাখা বিল্বপত্র আনিয়া হাতে দিল।

দুর্গা, দুর্গা, দুর্গা। হপ্তায় একখানা করে চিঠি দিও, যখন যেখানে থাক, বুঝলে ?

আরও একটা দিনের কথা মনে পড়ে, এমনি এক বিকালবেলা মামুদপুর ক্যাম্পে সে জরিপের কাজ করিতেছে, এমন সময় চিঠি আসিল, সুধারানী নাই।

ইতিমধ্যে নকশা ও কাগজপত্র লইয়া ভজহরি আমিন সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

দু-শ দশ—এগারো—তার উত্তরে এই হলগে দু-শ বারো নম্বর প্লট—বলিয়া ভজহরি নকশার উপর জায়গাটা চিহ্নিত করিল।

বলিতে লাগিল, অনাবাদী বন-জঙ্গল একটা, মানুষজন কেউ যায় না ওদিকে, তবু এই নিয়ে যত মামলা।

হঠাৎ একবার চোখ তুলিয়া দেখিল, সে-ই কেবল বকিয়া মরিতেছে, শঙ্কর বোধকরি একবারও কাগজপত্রের দিকে তাকায় নাই—সামনের উত্তরের মাঠের দিকে এক নজরে তাকাইয়া আপন মনে দিব্য শিস দিতে শুরু করিয়াছে, চুরুটের আগুন নিভিয়া গিয়াছে।

বলিল, হ্যাঁ, ঐ যে তালগাছ ক'টার ওধারে কালো কালো দেখা যাচ্ছে—জঙ্গলের আরম্ভ ঐখানে। এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে না ঠিক, কিন্তু ওর মধ্যে জমি অনেক···এইবারে রেকর্ড একবার দেখবেন হুজুর, ভারি গোলমেলে ব্যাপার।

হাঁ হাঁ না—এই রকম বলিতে বলিতে একটু অপ্রস্তুত হইয়া শঙ্কর কাগজপত্রে মন দিল। পড়িয়া দেখিল, দু'শ বারোর খতিয়ানে মালিকের নাম লেখা হইয়াছে, শ্রীধনঞ্জয় চাকলাদার।

ভজহরি বলিতে লাগিল, আগে ঐ একটা নাম শুধু লিখেছিলাম। তারপর দেখুন ওর নিচে নিচে উডপেন্সিল দিয়ে আরও সাতটা নাম লিখতে হয়েছে। রোজই এই রকম নতুন নতুন মালিকের উদয় হচ্ছে। আজ অবধি একুনে আটজন তো হলেন—যে রেটে ওঁরা আসতে লেগেছেন দু-একদিনের মধ্যে কুড়ি পুরে যাবে বোধ হচ্ছে, এই পাতায় কুলোবে না।

শঙ্কর কহিল, কুড়ি পুরে যাবে, যাওয়াচ্ছি আমি—রোসো না। আজই খতম করে দেব সব। তুমি ওদের আসতে বললে কখন?

সন্ধ্যের সময়। গেরস্ত লোক সারাদিন কাজকর্মে থাকে—একটু রাত হয় হবে, জ্যোৎস্না রাত আছে—তার আর কি?

আরও খানিকটা কাজকর্ম দেখিয়া শঙ্কর সহিসকে ঘোড়া সাজাইতে হুকুম দিল।

বলিল, মাঠের দিক দিয়ে চক্কোর দিয়ে আসা যাক একটা—এ রকম হাত-পা কোলে করে তাঁবুর মধ্যে কাঁহাতক বসে থাকা যায়

এ জায়গাটা কিন্তু তোমরা বেশ সিলেক্ট করেছ, আমিন মশাই। ওগুলো ভাঁটফুল, না? কিন্তু গাঙের দশা দেখে হাসি না কাঁদি—

বলিতে বলিতে আবার কি ভাবিল। বলিল, ঘোড়া থাকগে, এক কাজ করলে হয় বরং—চলো না কেন, দুজনে পায়ে পায়ে জঙ্গলটা ঘুরে আসি। মাইলখানেক হবে—কি বল? বিকেলে ফাঁকায় বেড়ালে শরীর ভালো থাকে। চলো—চলো—

মাঠের ফসল উঠিয়া গিয়াছে। কোনোদিকে লোক-চলাচল নাই। শঙ্কর আগে আগে যাইতেছিল, ভজহরি পিছনে। জঙ্গলের সামনেটা খাতের মতো—অনেকখানি চওড়া, খুব নাবাল। সেখানে ধান হইয়া থাকে, ধানের গোড়াগুলা রহিয়াছে। পাশ দিয়া উঁচু আল বাঁধা।

সেখানে আসিয়া শঙ্কর কহিল, গাঙের বড় খাল-টাল ছিল এখানে?

ভজহরি কহিল, না হুজুর, খাল নয়—এটা গড়খাই। সামনের জঙ্গলটা ছিল গড়।

গড়?

আজ্ঞে হ্যাঁ, রাজারামের গড়। রাজারাম বলে নাকি কে একজন কোনকালে এখানে গড় তৈরি করেছিলেন। এখন তার কিছু নেই, জঙ্গল হয়ে গেছে সব।

তারপর দুজনে নিঃশব্দে চলিতে লাগিল।

মাঝে একবার শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল—বাঘ-টাঘ নেই তো?

ভজহরি তাচ্ছিল্যের সহিত জবাব দিল, বাঘ! চারিদিকে ধু ধু করছে ফাঁকা মাঠ, এখানে কি আর···তবে হ্যাঁ, অন্যান্যবার শুনলাম কেঁদো-গোবাঘা দু-একটা আসত। এবারে আমাদের জ্বালায়—

বলিয়া হাসিল। বলিতে লাগিল, উৎপাতটা আমরা কি কম করছি হুজুর? সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই—কম্পাস নিয়ে চেন ঘাড়ে করে করে সমস্তটা দিন। ঐ পথ যা দেখছেন, জঙ্গল কেটে আমরাই

বের করেছি, আগে পথঘাট কিছু ছিল না—এ অঞ্চলের কেউ এ বনে আসে না।

বনে ঢুকিয়া খানিকটা যাইতেই মনে হইল, এই মিনিট দুয়ের মধ্যেই বেলা ডুবিয়া রাত্রি হইয়া গেল।

ঘন শাখাজাল-নিবদ্ধ গাছপালা, আম আর কাঁঠাল গাছের সংখ্যাই বেশি। পুরু বাকল ফাটিয়া চৌচির হইয়া গুড়িগুলি পড়িয়া আছে যেন এক-একটা অতিকায় কুমির, ছাতাধরা সবুজ, ফাঁকে ফাঁকে পরগাছা···একদা মানুষেই যে ইহাদের পুঁতিয়া লালন করিয়াছিল আজ আর তাহা বিশ্বাস হয় না। কত শতাব্দীর শীত-গ্রীষ্ম-বর্ষা মাথার উপর দিয়া কাটিয়া গিয়াছে, তলার আঁধারে এইসব গাছপালা আদিম কালের কত সব রহস্য লুকাইয়া রাখিয়াছে কোনোদিন সূর্যকে উঁকি মারিয়া কিছু দেখিতে দেয় নাই।

এই রকম একটানা কিছুক্ষণ চলিতে চলিতে শঙ্কর দাঁড়াইয়া পড়িল।

ওখানটায় তো ফাঁকা বেশ! জল চকচক করছে—না?

আমিন বলিল, ওর নাম পঙ্কদীঘি।

খুব পাঁক বুঝি?

তা হবে। কেউ আবার বলে পক্ষী-দীঘির থেকে পঙ্কদীঘি হয়েছে।

বলিয়া ভজহরি গল্প আরম্ভ করিল:

সেকালে এই দীঘির কালো জলে নাকি অতি সুন্দর ময়ূরপঙ্খী ভাসিত। আকারেও সেটি প্রকাণ্ড—দুই কামরা, ছয়খানি দাঁড়। এত বড় ভারী নৌকা, কিন্তু তলির ছোট্ট একখানা পাটা একটুখানি ঘুরাইয়া দিয়া পলকের মধ্যে সমস্ত ডুবাইয়া ফেলা যাইত। দেশে সে সময় শাসন ছিল না, চট্টগ্রাম অঞ্চলের মগেরা আসিয়া লুটতরাজ করিত, জমিদারদের মধ্যে রেষারেষি লাগিয়াই ছিল। প্রত্যেক বড়লোকের প্রাসাদে গুপ্তদ্বার ও গুপ্তভাণ্ডার থাকিত, মান-সম্ভ্রম লইয়া পলাইয়া

যাইবার—অন্ততপক্ষে মরিবার—অনেক সব উপায় সম্ভ্রান্ত লোকেরা হাতের কাছে ঠিক করিয়া রাখিতেন। কিন্তু নৌকার বহিরঙ্গ দেখিয়া এসব কিছু ধরিবার জো ছিল না। চমৎকার ময়ূরকণ্ঠী রঙে অবিকল ময়ূরের মতো করিয়া গলুইটি কুঁদিয়া তোলা—শোনা যায়, এক-একদিন নিঝুম রাত্রে সকলে ঘুমাইয়া পড়িলে রাজারামের বড় ছেলে জানকীরাম তাঁর তরুণী পত্নী মালতীমালাকে লইয়া চিত্রবিচিত্র ময়ূরের পেখমের মতো পাল তুলিয়া ধীর বাতাসে ঐ নৌকায় দীঘির উপর বেড়াইতেন। এই মালতীমালাকে লইয়া এ অঞ্চলের চাষারা অনেক ছড়া বাঁধিয়াছে, পৌষ-সংক্রান্তির আগের দিন তাহারা বাড়ি বাড়ি সেইসব ছড়া গাহিয়া নূতন চাউল ও গুড় সংগ্রহ করে, পরদিন দল বাঁধিয়া সেই গুড়-চাউলে আমোদ করিয়া পিঠা খায়।

গল্প করিতে করিতে তখন তাহারা সেই দীঘির পাড়ের কাছে আসিয়াছে। ঠিক কিনার অবধি পথ নাই, কিন্তু নাছোড়বান্দা শঙ্কর ঝোপঝাড় ভাঙিয়া আগাইতে লাগিল। ভজহরি কিছুদূরে একটা নিচু ডাল ধরিয়া দাঁড়াইয়া রহিল।

নল-খাগড়ার বন দীঘির অনেক উপর হইতে আরম্ভ হইয়া জলে গিয়া শেষ হইয়াছে, তারপর কুচো-শেওলার ঝাড়। ঝুঁকিয়া-পড়া গাছের ডাল হইতে গুলঞ্চলতা ঝুলিতেছে। একটু দূরের দিকে কিন্তু কাকচক্ষুর মতো কালো জল। সাড়া পাইয়া কটা ডাকপাখি নলবনে ঢুকিল। অল্প খানিকটা ডাইনে বিড়াল-আঁচড়ার কাঁটাঝোপের নীচে এককালে যে বাঁধানো ঘাট ছিল, এখন বেশ বুঝিতে পারা যায়।

সেই ভাঙাঘাটের অনতিদূরে পাতলা সেকেলে ইটের পাহাড়। কতদিন পূর্বে বিস্মৃত শতাব্দীর কত কত নিভৃত সুন্দর জ্যোৎস্না রাত্রে জানকীরাম হয়তো প্রিয়তমাকে লইয়া ওখান হইতে টিপিটিপি এই পথ বহিয়া এই সোপান বহিয়া দীঘির ঘাটে ময়ূরপঙ্খীতে চড়িতেন। গভীর অরণ্যছায়ে সেই আসন্ন সন্ধ্যায় ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের সমস্ত সংবিৎ হঠাৎ কেমন আচ্ছন্ন হইয়া উঠিল।

ধ্যেত, আমার ভয় করে—কেউ যদি দেখে ফেলে!

কে দেখবে আবার? কেউ কোথাও জেগে নেই, চলো মালতী-মালা—লক্ষ্মীটি, চলো যাই।

আজ থাক, না না—তোমার পায়ে পড়ি, আজকের দিনটে থাক শুধু।

ঐ যেখানে আজ পুরানো ইটের সমাধিস্তূপ, ওখানে বড় বড় কক্ষ অলিন্দ বাতায়ন ছিল, উহারই কোনোখানে হয়তো একদা তারা-খচিত রাত্রে ময়ূরপঙ্খীর উচ্ছ্বসিত বর্ণনা শুনিতে শুনিতে এক তন্বঙ্গী রূপসী রাজবধূর চোখের তারা লোভে ও কৌতুকে নাচিয়া উঠিতেছিল, শব্দ হইবে বলিয়া স্বামী হয়তো বধূর পায়ের নূপুর খুলিয়া দিল, নিঃশব্দে খিড়কি খুলিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া দুইটি চোর সুপ্তপুরী হইতে বাহির হইয়া ঘাটের উপর নৌকায় উঠিল, রাজবাড়ির কেউ তা জানিল না। ফিসফাস কথাবার্তা···স্বচ্ছ মেঘের আড়ালে চাঁদ মৃদু মৃদু হাসিতেছিল ···শব্দ হইবার ভয়ে দাঁড়ও নামায় নাই···এমনি বাতাসে বাতাসে ময়ূরপঙ্খী মাঝদীঘি অবধি ভাসিয়া চলিল—

ভাসিতে ভাসিতে দূরে—বহুদূরে—শতাব্দীর আড়ালে কোথায় তাহারা ভাসিয়া গিয়াছে!

ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের কেমন ভয় করিতে লাগিল। গভীর নির্জনতার একটি ভাষা আছে, এমন জায়গায় এমনি সময় আসিয়া দাঁড়াইলে তবে তাহা স্পষ্ট অনুভব হয়। চারিপাশের বনজঙ্গল অবধি ঝিম-ঝিম করিয়া যেন এক অপূর্ব ভাষায় কথা কহিতে আরম্ভ করিয়াছে। ভয় হইল, আরও কিছুক্ষণ সে যদি এখানে এমনিভাবে চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকে, জমিয়া নিশ্চয় গাছের গুঁড়ির মতো হইয়া এই বনরাজ্যের একজন হইয়া যাইবে; আর নড়িবার ক্ষমতা থাকিবে না।···সহসা সচেতন হইয়া বারংবার সে নিজের স্বরূপ ভাবিতে লাগিল, সে সরকারী কর্মচারী···তার পসার-প্রতিপত্তি··· ভবিষ্যতের আশা···মনকে ঝাঁকা দিয়া দিয়া সমস্ত কথা স্মরণ করিতে লাগিল। ডাকিল: আমিন মশাই!

ভজহরি কহিল, সন্ধ্যে হয়ে গেল, হুজুর।

যাচ্ছি।

ক্যাম্পের কাছাকাছি হইয়া শঙ্কর হাসিয়া উঠিল। কহিল, ডাকাত পড়েছে নাকি আমাদের তাঁবুতে? বাপরে বাপ! এবং হাসির সহিত ক্ষণপূর্বের অনুভূতিটা সম্পূর্ণরূপে উড়াইয়া দিয়া বলিতে লাগিল, চুরুট টেনে টেনে তো আর চলে না—হুঁকো-কলকের ব্যবস্থা করতে পার আমিন মশাই, খাঁটি স্বদেশি মতে বসে বসে টানা যায়?

আমিনও হাসিয়া বলিল, অভাব কি? মুখের কথা না বেরুতে গাঁ থেকে বিশটা রুপোবাঁধা হুঁকো এসে হাজির হবে, দেখুন না একবার—

গ্রামের ইতর-ভদ্র অনেকে আসিয়াছিল, উহাদের দেখিয়া তটস্থ হইয়া সকলে একপাশে সরিয়া দাঁড়াইল। মিনিট দশেক পরে শঙ্কর তাঁবুর বাহিরে আসিয়া মামলার বিচারে বসিল। বলিল, মুখের কথায় হবে না কিছু, আপনাদের দলিলপত্তোর কার কি আছে দেখান একে একে। ধনঞ্জয় চাকলাদার আগে আসুন।

ধনঞ্জয় সামনে আসিল। কোষ্ঠীর মতো জড়ানো একখানা হলদে রঙের কাগজ, কালো ছাপ-মারা পোকায় কাটা, সেকেলে বাংলা হরফে লেখা। শঙ্কর বিশেষ কিছু পারিল না, ভজহরি কিন্তু হেরিকেনটা তুলিয়া ধরিয়া অবাধে আগাগোড়া পড়িয়া গেল। কে-একজন দয়ালকৃষ্ণ চক্রবর্তী নামজাদ রাজারামের গড় একশ বারো বিঘা নিষ্কর জায়গা-জমি মায় বাগিচা-পুষ্করিণী তারণচন্দ্র চাকলাদার মহাশয়ের নিকট সুস্থ শরীরে সরল মনে খোশকোবলায় বিক্রয় করিতেছে।

শঙ্কর জিজ্ঞাসা করিল: ঐ তারণচন্দ্র চাকলাদার আপনার কেউ হবেন বুঝি ধনঞ্জয়বাবু?

ধনঞ্জয় সোৎসাহে কহিতে লাগিল, ঠিক ধরেছেন হুজুর, তারণচন্দোর আমার প্রপিতামহ। পিতামহ হলেন কৈলাসচন্দোর —তাঁর বাবা। তিরাশি সন থেকে এই সব নিষ্করের সেস গুনে

আসছি কালেক্টরিতে, গুডিভ সাহেবের জরিপের চিঠি রয়েছে। কবলার তারিখটে একবার লক্ষ্য করে দেখবেন, হুজুর—

আরও অনেক কথা বলিতে যাইতেছিল, কিন্তু উপস্থিত অনেকে না না—করিয়া উঠিল। তাহারাও রাজারামের গড়ের মালিক বলিয়া নাম লেখাইয়াছে, এতক্ষণ অনেক কষ্টে ধৈর্য ধরিয়া শুনিতেছিল, কিন্তু আর থাকিতে পারিল না।

ধমক খাইয়া সকলে চুপ করিল। শঙ্কর ভজহরিকে চুপিচুপি কহিল, তুমি ঠিকই লিখেছ, চাকলাদার আসল মালিক, আপত্তিগুলো ভুয়ো—ডিসমিস করে দেব।

ভজহরি কিন্তু সন্দিগ্ধভাবে এদিক-ওদিক বার দুই ঘাড় নাড়িয়া বলিল, আসল মালিক ধরা বড় শক্ত হয়ে দাঁড়াচ্ছে, হুজুর—

বারো শ উনিশ সনের পুরোনো দলিল দেখাচ্ছে যে!

ভজহরি কহিতে লাগিল, এখানে আটঘরা গ্রামে একজন লোক রয়েছে, ন সিকে কবুল করুন তার কাছে গিয়ে—উনিশ সন তো কালকের কথা, হুবহু আকব্বর বাদশার দলিল বানিয়ে দেবে। আসল নকল চেনা যাবে না।

বস্তুত ধনঞ্জয়ের পর অন্যান্য সাতজনের কাগজপত্র তলব করিয়া দেখা গেল, ভজহরি মিথ্যা বলে নাই—ঐ রকম পুরানো দলিল সকলেরই আছে। এবং বাঁধুনিও প্রত্যেকটির এমনি নিখুঁত যে যখনই যাহার কাগজ দেখে একেবারে নিঃসন্দেহ বুঝিয়া যায়, রাজারামের গড়ের মালিক একমাত্র সেই লোকটাই। এ যেন গোলক-ধাঁধায় পড়িয়া গেল। বিস্তর ভাবিয়া-চিন্তিয়া সাব্যস্ত হইল না কাহাকে ছাড়িয়া কাহাকে রাখা যায়।

হাল ছাড়িয়া দিয়া অবশেষে শঙ্কর বলিল, দেখুন মশাইরা, আপনারা ভদ্রসন্তান—

হাঁ—হাঁ—করিয়া তাহারা তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিল।

এই একটা প্লট একসঙ্গে ঐরকম ভাবে আটজনের তো হতে পারে না?

সকলেই ঘাড় নাড়িল। অর্থাৎ, নয়ই তো—

আপনারা হলফ করে বলুন, এর সত্যি মালিক কে।

ভদ্রসন্তানেরা তাহাতে পিছপাও নহেন। একে একে সামনে আসিয়া ঈশ্বরের দিব্য করিয়া বলিল, দু-শ বারোর প্লট একমাত্র তাহারই, অপর সকলে চক্রান্ত করিয়া মিথ্যা কথা কহিতেছে।

লোকজন বিদায় হইয়া গেলে শঙ্কর বলিল, না, এরা পাটোয়ারি বটে! দেখে-শুনে সম্ভ্রম হচ্ছে।

ভজহরি মৃদু মৃদু হাসিতেছিল, এ রকম সে অনেক দেখিয়াছে।

শঙ্কর বলিতে লাগিল, তোমার কথাই মেনে নিলাম যে কাঁচা দলিলগুলো জাল। কিন্তু যেগুলো রেজেষ্ট্রি? দেখ, এদের দূরদৃষ্টি কত দেখ একবার—কবে কি হবে, দু-পুরুষ আগে থেকে তাই তৈরি হয়ে আসছে। চুলোয় যাকগে দলিলপত্তোর—তুমি গাঁয়ে খোঁজখবর করে কি পেলে বল? যা হোক একরকম রেকর্ড করে যাই—পরে যেমন হয় হবে।

ভজহরি বলিল, কত লোককে জিজ্ঞাসা করলাম, আপনি আসবার আগে কত সাক্ষিসাবুদ তলব করেছি, সে আরও মজা—এক-একজনে এক-এক রকম বলে। বলিয়া সহসা প্রচুর হাসিতে হাসিতে বলিল, নরলোকে আশকারা হল না, এখন একবার কুমার বাহাদুরের সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করতে পারলে হয়।

শঙ্কর কথাটা বুঝিতে পারিল না।

ভজহরি বলিতে লাগিল, কুমার বাহাদুর মানে জানকীরাম। সেই যে তখন ময়ূরপঙ্খীর কথা বলছিলাম, গাঁয়ের লোকেরা বলে—আশপাশের গ্রাম নিশুতি হয়ে গেলে জানকীরাম নাকি আসেন—উত্তর মাঠের ঐ নাক-কাটির খাল পেরিয়ে তেঘরা-বকচরের দিক থেকে তীরবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে রোজ রাত্তিরে মালতীমালার সঙ্গে দেখা করে যান—সে ভারি অদ্ভুত গল্প—কাজকর্ম নেই তো এখন?

তারপর রাত্রি অনেক হইল। তিনটি তাঁবুরই আলো নিভিয়াছে, কোনো দিকে সাড়াশব্দ নাই। শঙ্করের ঘুম আসিতেছিল না। একটা চুরুট ধরাইয়া বাহিরে আসিল, আসিয়া মাঠে খানিক পায়চারি করিতে লাগিল।

ভজহরি বলিয়াছিল, কেবল জঙ্গল নয় হুজুর, এই মাঠেও সন্ধ্যের পর একলা কেউ আসে না। এই মাঠ সেই যুদ্ধক্ষেত্র, নদীপথে শত্রুরা এসেছিল। বেলা না ডুবতে রাজারামের পাঁচ-শ ঢালী ঘায়েল হয়ে গেল, সেই পাঁচ-শ মড়ার পা ধরে টেনে টেনে পরদিন ঐ নদীতে ফেলে দিয়েছিল···

উলুঘাসের উপর পা ছড়াইয়া চুপটি করিয়া বসিয়া শঙ্কর আনমনে ক্রমাগত চুরুটের ধোঁয়া ছাড়িতে লাগিল।

চার-শ বৎসর আগে আর একদিন সন্ধ্যায় গ্রামনদীকূলবর্তী এই মাঠের উপর এমনি চাঁদ উঠিয়াছিল। তখন যুদ্ধ শেষ হইয়া গিয়া সমস্ত মাঠে ভয়াবহ শান্তি থমথম করিতেছে। চাঁদের আলোয় স্তব্ধ রণভূমির প্রান্তে জানকীরামের জ্ঞান ফিরিল। দূরে গড়ের প্রাকারে সহস্র সহস্র মশালের আলো—আকাশ চিরিয়া শত্রুর অশ্রান্ত জয়োল্লাস···দুই হাতে ভর দিয়া অনেক কষ্টে জানকীরাম উঠিয়া বসিয়া তাঁহারই অনেক আশা ও ভালোবাসার নীড় ঐ গড়ের দিকে চাহিতে চাহিতে অকস্মাৎ দুই চোখ ভরিয়া জল আসিল। ললাটের রক্তধারা ডান হাতে মুছিয়া ফেলিয়া পিছনে তাকাইয়া দেখিলেন, কেবল কয়েকটা শিয়াল নিঃশব্দে শিকার খুঁজিয়া বেড়াইতেছে—কোনো দিকে কেহ নাই···

সেই সময়ে ওদিকে অন্দরের বাতায়নপথে তাকাইয়া মালতী-মালাও চমকিয়া উঠিলেন, তবে কি একেবারেই—? অবমানিত রাজপুরীর উপরেও গাঢ় নিঃশব্দতা নামিয়া আসিয়াছে। দাসী বিবর্ণমুখে পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মালতীমালা আয়ত কালো চোখে তাহার দিকে চাহিয়া প্রশ্ন করিলেন: শেষ?

খবর আসিল, গুপ্তদ্বার খোলা হইয়াছে, পরিজনেরা সকলে বাহির হইয়া যাইতেছে।

দাসী বলিল, বউমা, উঠুন—

বধূ বলিলেন, নৌকা সাজানো হোক।

কেহ সে কথার অর্থ বুঝিতে পারিল না। নদীর ঘাটে শত্রুর বহর ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, সে সন্ধানী-দৃষ্টি ভেদ করিয়া জলপথে পালাইবার সাধ্য কি!

মালতীমালা বলিলেন, নদীর ঘাটে নয় রে, দীঘির ময়ূরপঙ্খী সাজাতে হুকুম দিয়েছি। খবর নিয়ে আয়, হল কি না।

সেদিন সন্ধ্যায় রাজোদ্যানে কনকচাঁপা গাছে যে ক'টি ফুল ফুটিয়াছিল তাড়াতাড়ি সেগুলি তুলিয়া আনা হইল, মালতীমালা লোটন-খোঁপা ঘিরিয়া তার কতকগুলি বসাইলেন, বাকিগুলি আঁচল ভরিয়া লইলেন। সাধের মুক্তাফল দুটি কানে পরিলেন, পায়ে আলতা দিলেন, মাথায় উজ্জ্বল সিঁদুর পরিয়া কত মনোরম রাত্রির ভালোবাসার স্মৃতি-মণ্ডিত ময়ূরপঙ্খীর কামরার মধ্যে গিয়া বসিলেন।

নৌকা ভাসিতে ভাসিতে অনেক দূরে গেল। তখন বিজয়ীরা গড়ে ঢুকিয়াছে, নদীর পাড় দিয়া দলে দলে রক্তপতাকা উড়াইয়া জনমানবশূন্য প্রাসাদে ঢুকিতে লাগিল। সমস্ত পুরবাসী গুপ্তপথে পলাইয়াছে।

বিশ-পঁচিশটি মশালের আলো দীঘির জলে পড়িল।

ধর, ধর নৌকা—

মালতীমালা তলির পাটাখানি খুলিয়া দিলেন। দেখিতে দেখিতে দীর্ঘ মাস্তুলটিও নিশ্চিহ্ন হইয়া গেল। নৌকা কেহ ধরিতে পারিল না, কেবল কেমন করিয়া কোন ফাঁক দিয়া জলের উপর ভাসিয়া উঠিল আঁচলের চাঁপাফুল কয়েকটি।

তার পর ক্রমে রাত্রি আরও গভীর হইয়া গড়ের উঁচু চূড়ার আড়ালে চাঁদ ডুবিল। আকাশে কেবল উজ্জ্বল তারা কয়েকটি পরাজিত বিগত-গৌরব ভগ্নজানু জানকীরামের ধূলিশয্যার উপর

নির্নিমেষ দৃষ্টি বিসারিত করিয়া ছিল। সেই সময় কে-একজন অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া অতি সন্তর্পণে আসিয়া রাজকুমারকে ধরিয়া তুলিল।

চলুন, প্রভু—

কোথা?

বটতলায়। ওখানে ঘোড়া রেখেছি, ঘোড়ায় তুলে নিয়ে চলে যাব।

গড়ের আর আর সব?

বিশ্বস্ত পরিচারক গড়ের ঘটনা সব কহিল। বলিল, কোনো চিহ্ন নেই আর জলের উপর কনকচাঁপা ছাড়া—

কই? বলিয়া জানকীরাম হাত বাড়াইলেন। বলিলেন, আনতে পারনি? ঘোড়ায় তুলে দিতে পার আমায়? দাও না আমায় তুলে দয়া করে—আমি একটা ফুল আনব শুধু।

নিষেধ মানিলেন না। খটখট খটখট করিয়া সেই অন্ধকারে উত্তরমুখো বাতাসের বেগে ঘোড়া ছুটিল। সকালে দেখা গেল, পরিখার মধ্যে যেখানে আজকাল ধান হইয়া থাকে—জানকীরাম পড়িয়া মরিয়া আছেন, ঘোড়ার কোন সন্ধান নাই।

সেই হইতে নাকি প্রতি রাত্রে এক অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়া আসিতেছে। রাত দুপুরে সপ্তর্ষিমণ্ডল যখন মধ্য-আকাশে আসিয়া পৌঁছে, আশপাশের গ্রামগুলিতে নিষুপ্তি ক্রমশ গাঢ়তম হইয়া উঠে, সেই সময়ে রাতের পর রাত ঐ গভীর নির্জন জঙ্গলের মধ্যে চার শ বছর আগেকার সেই রাজবধূ পঙ্কদীঘির হিম-শীতল অতল জলশয্যা ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়ান, ভাঙা ঘাটের সোপান বহিয়া বিড়াল আঁচড়ার গভীর কাঁটাবন দুই হাতে ফাঁক করিয়া সাবধানে লঘু চরণ মেলিয়া তিনি ক্রমশ আগাইতে থাকেন। তবু বনের একটানা ঝিঁঝিঁর আওয়াজের সঙ্গে পায়ের নূপুর ঝুন-ঝুন করিয়া বাজিয়া উঠে। কুঙ্কুমে-মাজা মুখ, গায়ে শ্বেতচন্দন আঁকা, সিঁথায় সেই চার শতাব্দী আগেকার সিঁদুর লাগানো, পায়ে রক্তবরণ আলতা, অঙ্গের চিত্র-

বিচিত্র কাঁচলি ও মেঘডম্বুর শাড়ি হইতে জল ঝরিয়া ঝরিয়া বনভূমি সিক্ত করে—বনের প্রান্তে আমের গুঁড়ি ঠেস দিয়া দক্ষিণের মাঠে তিনি তাকাইয়া থাকেন···

আবার বর্ষায় যখন ঐ গড়খাই কানায় কানায় একেবারে ভরিয়া যায়, ঘোড়া তখন জল পার হইয়া বনের সামনে পৌঁছিতে পারে না, মালতীমালা সেই কয়েকটা মাস আগাইয়া ফাঁকা মাঠের মধ্যে আসিয়া দাঁড়ান। দুধসর ধানের সুগন্ধি ক্ষেতের পাশে পাশে ভিজা আলের উপর হিম-রাত্রির শিশিরে পায়ের আলতার অস্পষ্ট ছোপ লাগে, চাষারা সকাল বেলা দেখিতে পায়, কিন্তু রোদ উঠিতে না উঠিতে সমস্ত নিশ্চিহ্ন হইয়া মিলাইয়া যায়।

চুরুটের অবশিষ্টটুকু ফেলিয়া দিয়া শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল। মাঠের ওদিকে মুচিপাড়ায় পোয়ালগাদা, খোড়ো ঘর, নূতন বাঁধা গোলাগুলি কেমন বেশ শান্ত হইয়া ঘুমাইতেছে। চৈত্রমাসের সুশুভ্র জ্যোৎস্নায় দূরের আবছা বনের দিকে চাহিতে চাহিতে চারদিককার সুপ্তিরাজ্যের মাঝখানে বিকালের দেখা সেই সাধারণ বন হঠাৎ অপূর্ব রহস্যময় ঠেকিল, ঐখানে এমনি সময়ে বিস্মৃত যুগের বধূ তাকাইয়া আছে, নায়ক তীরবেগে ঘোড়া ছুটাইয়া সেই দিকে যাইতেছে, কিছুই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় না। মনে হয়, সন্ধ্যাকালে ওখানে সে যে অচঞ্চল নিষ্ক্রিয় ভাব দেখিয়া আসিয়াছে, এতক্ষণ জঙ্গলের সে রূপ বদলাইয়া গিয়াছে, মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি আজও যাহা আবিষ্কার করিতে পারে নাই তাহারই কোনও একটা অপূর্ব ছন্দ-সঙ্গীতময় গুপ্ত রহস্য এতক্ষণ ওখানে বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

সঙ্গে সঙ্গে তার সুধারাণীর কথা মনে পড়িল—সে যা-যা বলিত, যেমন করিয়া হাসিত, রাগ করিত, ব্যথা দিত, প্রতিদিনকার তুচ্ছাতিতুচ্ছ সেইসব কথা। ভাবিতে ভাবিতে শঙ্করের চোখে জল আসিয়া পড়িল। জাগরণের মধ্যে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ হইয়া কোনদিন সে আর আসিবে না।···ক্রমশ তাহার মনে কারণ-যুক্তিহীন একটা

অদ্ভুত ধারণা চাপিয়া বসিতে লাগিল। ভাবিল, সে দিনের সেই সুধারাণী, তার হাসি চাহনি, তার ক্ষুদ্র হৃদয়ের প্রত্যেকটি স্পন্দন পর্যন্ত এই জগৎ হইতে হারায় নাই—কোনোখানে সজীব হইয়া বর্তমান রহিয়াছে, মানুষে তার খোঁজ পায় না। ঐ সব জনহীন বন-জঙ্গলে এইরূপ গভীর রাত্রে একবার খোঁজ করিয়া দেখিলে হয়। শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, কেবল মালতীমালা সুধারাণী নয়, সৃষ্টির আদিকাল হইতে যত মানুষ অতীত হইয়াছে, যত হাসি-কান্নার ঢেউ বহিয়াছে, যত ফুল ঝরিয়াছে, যত মাধবী-রাত্রি পোহাইয়াছে, সমস্তই যুগের আলো হইতে এমনি কোথাও পলাইয়া রহিয়াছে। তদ্‌গত হইয়া যেই মানুষ পুরাতনের স্মৃতি ভাবিতে বসে অমনি গোপন আবাস হইতে তারা টিপিটিপি বাহির হইয়া মনের মধ্যে ঢুকিয়া পড়ে। স্বপ্নঘোরে সুধারাণী এমনি কোনখান হইতে বাহির হইয়া আসিয়া কত রাতে তার কাছে আসিয়া বসিয়াছে, ঘুম ভাঙিলে আবার বাতাসে মিশাইয়া পলাইয়া গিয়াছে।···

বটতলার বটের ঝুরির সঙ্গে ঘোড়া বাঁধা ছিল, ঐখানে আপাতত আস্তাবলের কাজ চলিতেছে, পৃথক ঘর আর বাঁধা হয় নাই। নিজে নিজেই জিন কষিয়া স্বপ্নাচ্ছন্নের মতো শঙ্কর ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া বসিল। ঘোড়া ছুটিল। সুপ্ত গ্রামের দিকে চাহিয়া চাহিয়া অনুকম্পা হইতে লাগিল—মূর্খ তোমরা, জঙ্গলের বড় বড় কাঁঠাল গাছগুলাই তোমাদের কেবল নজরে পড়িল এবং গাছ মারিয়া তক্তা কাটাইয়া দু পয়সা পাইবার লোভে এত মকদ্দমা-মামলা করিয়া মরিতেছ। গভীর নিঝুম রাত্রে ছায়ামগ্ন সেই আম-কাঁঠাল-শিত্তিরাজের বন, সমস্ত ঝোপ-ঝাড়-জঙ্গল, পঙ্কদীঘির এপার-ওপার যাঁদের রূপের আলোয় আলো হইয়া যায়, এতকাল পাশাপাশি বাস করিলে একটা দিন তাঁদের খবর লইতে পারিলে না।

গড়খাই পার হইয়া বনের সামনে আসিয়া ঘোড়া দাঁড়াইল। একটা গাছের ডালে লাগাম বাঁধিয়া শঙ্কর আমিনদের সেই জঙ্গল-কাটা সঙ্কীর্ণ পথের উপর আসিল। প্রবেশমুখের দুইধারে দুইটি

অতিবৃহৎ শিরীষ গাছ, বিকালে ভজহরির সঙ্গে কথায় কথায় এসব নজর পড়ে নাই, এখন বোধ হইল মায়াপুরীর সিংহদ্বার উহারা। সেইখানে দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ সে সেই ছায়াময় নৈশ বনভূমি দেখিতে লাগিল। আর তাহার অণুমাত্র সন্দেহ রহিল না, মৃত্যু-পারের গুপ্ত রহস্য আজি প্রভাত হইবার পূর্বে ঐখান হইতে নিশ্চয় আবিষ্কার করিতে পারিবে। আমাদের জন্মের বহুকাল আগে এই সুন্দরী পৃথিবীকে যারা ভোগ করিত, বর্তমানকালের দুঃসহ আলো হইতে তারা সব তাদের অদ্ভুত রীতি-নীতি বীর্য ঐশ্বর্য প্রেম লইয়া সৌরালোকবিহীন ঐ বন-রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া আছে। আজ জনহীন মধ্যরাত্রে যদি এই সিংহদ্বারে দাঁড়াইয়া নাম ধরিয়া ধরিয়া ডাক দেওয়া যায়, শতাব্দীপারের বিচিত্র মানুষেরা অন্ধকারের যবনিকা তুলিয়া নিশ্চয় চাহিয়া দেখিবে।

কয়েক পা আগাইতে অসাবধানে পায়ের নিচে শুকনা ডালপালা মড়মড় করিয়া ভাঙিয়া যেন মর্মস্থানে বড় ব্যথা পাইয়া বনভূমি আর্তনাদ করিয়া উঠিল। স্থির গম্ভীর অন্ধকারে নির্নিরীক্ষ্য সান্ত্রিগণ তাহাকে বাক্যহীন আদেশ করিল ঃ জুতা খুলিয়া এসো।

শুকনা পাতা খসখস করিতেছে, চারিপাশে কত লোকের আনাগোনা···জ্যোৎস্নার আলো হইতে আঁধারে আসিয়া শঙ্করের চোখ বাঁধিয়া গিয়াছে বলিয়াই সে যেন কিছু দেখিতে পাইতেছে না। মনের ঔৎসুক্যে উদ্বেগাকুল আনন্দে কম্পিত হস্তে পকেট হইতে তাড়াতাড়ি সে টর্চ বাহির করিয়া জ্বালিল।

জ্বালিয়া চারিদিক ঘুরাইয়া ফিরাইয়া দেখে—শূন্য বন। বিশ্বাস হইল না, বারংবার দেখিতে লাগিল।···আর-একটা দিনের ব্যাপার শঙ্করের মনে পড়ে। দুপুরবেলা, বিয়ের কয়েকটা দিন পরেই, সুধারাণী ও আর কে-কে তার নূতন দামি তাসজোড়া লইয়া চুরি করিয়া খেলিতেছিল। তখন তার আর-এক গ্রামে নিমন্ত্রণে যাইবার কথা, সন্ধ্যার আগে ফিরিবার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু কি গতিকে যাওয়া হইল না। বাহির হইতে খেলুড়েদের খুব হৈ-চৈ শোনা

যাইতেছিল, কিন্তু ঘরে ঢুকিতে না ঢুকিতে সকলে কোন দিক দিয়া কি করিয়া যে পলাইয়া গেল—শঙ্কর দেখিয়াছিল, কেবল তাসগুলি বিছানার উপর ছড়ানো···

টর্চের আলোয় কাঁটাবনের ফাঁকে ফাঁকে সাবধানে দীঘির সোপানের কাছে গিয়া সে বসিল। জলে জ্যোৎস্না চিকচিক করিতেছে। আলো নিভাইয়া চুপটি করিয়া অনেকক্ষণ সে বসিয়া রহিল।

ক্রমে চাঁদ পশ্চিমে হেলিয়া পড়িল। কোনো দিকে কোনো শব্দ নাই, তবু অনুভব হয়—তার চারিপাশের বনবাসীরা ক্রমশ অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছে। প্রতিদিন এই সময়ে তারা একটি অতি-দরকারী নিত্যকর্ম করিয়া থাকে, শঙ্কর যতক্ষণ এখানে থাকিবে ততক্ষণ তা হইবে না—কিন্তু তাড়া বড্ড বেশি। নিঃশব্দে ইহারা তার চলিয়া যাওয়ার প্রতীক্ষা করিতেছে।

হঠাৎ কোনদিক হইতে হু-হু করিয়া হাওয়া বহিল, এক মুহূর্তে মর্মরিত বনভূমি সচকিত হইয়া উঠিল। উৎসবক্ষেত্রে নিমন্ত্রিতেরা এইবার যেন আসিয়া পড়িয়াছে, অথচ এদিকে কোনো কিছুর যোগাড় নাই। চারিদিকে মহা শোরগোল পড়িয়া গেল। অন্ধকার রাত্রির পদধ্বনির মতো সহস্রে সহস্রে ছুটাছুটি করিতেছে। পাতার ফাঁকে ফাঁকে এখানে-ওখানে কম্পমান ক্ষীণ জ্যোৎস্না, সে যেন মহামহিমার্ণব যারা সব আসিয়াছে, তাহাদের সঙ্গের সিপাহিসৈন্যের বল্লমের সুতীক্ষ্ণ ফলা। নিঃশব্দচারীরা অঙ্গুলি-সঙ্কেতে শঙ্করকে দেখাইয়া দেখাইয়া পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল : এ কে? এ কোথাকার কে - চিনি না তো।

উৎকর্ণ হইয়া সমস্ত শ্রবণশক্তি দিয়া শঙ্কর আরও যেন শুনিতে লাগিল, কিছু দূরে সর্বশেষ সোপানের নিচে কে যেন গুমরিয়া গুমরিয়া কাঁদিতেছে। কণ্ঠ অনতিস্ফুট, কিন্তু চাপা কান্নার মধ্য দিয়া গলিয়া গলিয়া তার সমস্ত ব্যথা বনভূমির বাতাসের সঙ্গে চতুর্দিকে সঞ্চরণ করিয়া বেড়াইতে লাগিল। অন্ধকারলিপ্ত প্রেমের মতো গাছেরা

মুখে আঙুল দিয়া তাহাকে বারংবার থামিতে ইশারা করিতেছে—সর্বনাশ করিল, সব জানাজানি হইয়া গেল।…

কিন্তু কান্না থামিল না। নিশ্বাস রোধ করিয়া ঐ অতল জলতলে চার-শ বছরের জরাজীর্ণ ময়ুরপঙ্খীর কামরার মধ্যে যে মাধুরীমতী রাজবধূ সারাদিনমান অপেক্ষা করে, গভীর রাতে এইবার সে ঘোমটা খুলিয়া বাহিরে আসিয়া নিত্যকার মতো উৎসবে যোগ দিতে চায়। যেখানে শঙ্কর পা ঝুলাইয়া বসিয়া ছিল, তাহার কিছু নিচে জলে-ডোবা সিঁড়ির ধাপে মাথা কুটিয়া কুটিয়া বোবার মতো সে বড় কান্না কাঁদিতে লাগিল।

তারপর কখন চাঁদ ডুবিয়া দীঘিজল আঁধার হইল, বাতাসও একেবারে বন্ধ হইয়া গেল, গাছের পাতাটিরও কম্পন নাই—কান্না তখনও চলিতেছে। অতিষ্ঠ হইয়া কাহারা দ্রুতহাতে চারিদিকে অন্ধকারের মধ্যে ঘন কালো পর্দা খাটাইয়া দিতে লাগিল—শঙ্কর বসিয়া থাকে, থাকুক—তাহাকে কিছুই উহারা দেখিতে দিবে না।

আবার টর্চ টিপিয়া চারিদিকে ঘুরাইয়া ঘুরাইয়া দেখিল। আলো জ্বলিতে না জ্বলিতে গাছের আড়ালে কে কোথায় সব যেন পলাইয়া গিয়াছে, কোনোদিকে কিছু নাই।

তখন শঙ্কর উঠিয়া দাঁড়াইল। মনে মনে কহিতে লাগিল, আমি চলিয়া যাইতেছি, তুমি আর কাঁদিও না হে লজ্জারুণা রাজবধূ, মৃণালের মতো দেহখানি তুমি দীঘির তল হইতে তুলিয়া ধরো, আমি তাহা দেখিব না। অন্ধকার রাত্রি, অনাবিষ্কৃত দেশ, অজানিত গিরিগুহা, গভীর অরণ্যভূমি এ সব তোমাদের। অনধিকারের রাজ্যে বসিয়া থাকিয়া তোমাদের ব্যাঘাত ঘটাইয়া কাঁদাইয়া গেলাম, ক্ষমা করিও—

যাইতে যাইতে আবার ভাবিল, কেবল এই সময়টুকুর জন্য কাঁদাইয়া বিদায় লইয়া গেলেও না-হয় হইত। তাহা তো নয়। সে যে ইহাদের একেবারে উদ্বাস্তু করিতে এখানে আসিয়াছে। জরিপ শেষ হইয়া একজনের দখল দিয়া গেলে বন কাটিয়া লোকে এখানে

টাকা ফলাইবে। এত নগর-গ্রাম মাঠ-ঘাটেও মানুষের জায়গায় কুলায় না—তাহারা প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিয়াছে, পৃথিবীতে বন-জঙ্গল এক কাঠা পড়িয়া থাকিতে দিবে না। তাই শঙ্করকে সেনাপতি করিয়া আমিনের দলবল যন্ত্রপাতি নক্‌শা কাগজপত্র দিয়া ইহাদের এই শত শত বৎসরের শান্ত নিরিবিলি বাসভূমি আক্রমণ করিতে পাঠাইয়া দিয়াছে। শাণিত খড়্গের মতো ভজহরির সেই সাদা সাদা দাঁত মেলিয়া হাসি—উৎপাত কি আমরা কম করছি হুজুর? সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই, কম্পাস নিয়ে চেন ঘাড়ে করে করে…

কিন্তু মাথার উপরে প্রাচীন বনস্পতিরা ভ্রূকুটি করিয়া যেন কহিতে লাগিল, তাই পারিবে নাকি কোনো দিন? আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া তাল ঠুকিয়া জঙ্গল কাটিতে কাটিতে সামনে তো আগাইতেছ আদিকাল হইতে, পিছনে পিছনে আমরাও তেমনি তোমাদের তাড়াইয়া চলিয়াছি। বন-কাটা রাজ্যে নূতন ঘর তোমরা বাঁধিতে থাক, পুরানো ঘরবাড়ি আমরা ততক্ষণ দখল করিয়া বসিব।…

হা-হা হা-হা-হা তাহাদেরই হাসির মতো আকাশে পাখা ঝাপটাইতে ঝাপটাইতে কালো এক ঝাঁক বাদুড় বনের উপর দিয়া মাঠের উপর দিয়া উড়িতে উড়িতে গ্রামের দিকে চলিয়া গেল।…

বনের বাহির হইয়া শঙ্কর ঘোড়ায় চাপিল। ঘোড়া আস্তে আস্তে হাঁটাইয়া ফিরিয়া চলিল। পিছনের বনে ডালে ডালে ঝাঁক-বাঁধা জোনাকি, আমের গুটি ঝরিতেছে তার টুপটাপ শব্দ, অজানা ফুলের গন্ধ…বারবার পিছন দিকে সে ফিরিয়া ফিরিয়া তাকাইতে লাগিল। অনেক দূরে কোথায় কুকুর ডাকিতেছে, কাহাদের বাড়িতে আকাশ-প্রদীপ আকাশের তারার সহিত পাল্লা দিয়া দপদপ করিতেছে… এইবার গিয়া সেই নিরালা তাঁবুর মধ্যে ক্যাম্প-খাটটির উপর পড়িয়া পড়িয়া ঘুম দিতে হইবে। যদি এই সময় মাঠের এই অন্ধকারের মধ্যে সুধারানী আসিয়া দাঁড়ায়…কপালে জলজলে সিঁদুর, একপিঠ চুল এলাইয়া টিপিটিপি দুষ্টামির হাসি হাসিতে হাসিতে যদি সুধারানী ঘোড়ার লাগাম ধরিয়া সামনে আসিয়া দাঁড়াইয়া দুই চোখ

ভরিয়া তার দিকে তাকাইয়া থাকে…মাথার উপর তারাভরা আকাশ, কোন দিকে কেউ নাই—ঘোড়া হইতে লাফাইয়া পড়িয়া শঙ্কর তাহার হাত ধরিয়া ফেলিবে, হাত ধরিয়া কঠোর সুরে শুনাইয়া দিবে—কি শুনাইবে সে? শুধু তাহাকে এই কথাটা জিজ্ঞাসা করিবে: কি করেছি আমি তোমার?

এই সময় হঠাৎ লাফ দিয়া ঘোড়া একটা আল পার হইল। শঙ্করের হুঁশ হইল, এতক্ষণের মধ্যে এখনও গড়খাই পার হয় নাই—জঙ্গল বেড়িয়া ঘোড়া ক্রমাগত ধানক্ষেতের উপর দিয়াই চলিতেছে। জুতা-পায়ে জোরে ঠোক্কর দিল, আচমকা আঘাত পাইয়া ঘোড়া ছুটিল। গড়খাইয়ের যেন শেষ নাই, যত চলে ততই ধানবন, দিক ভুল হইয়া গিয়াছে, মাঠে না উঠিয়া ধানবন ঘুরিয়া মরিতেছে। শঙ্করের মনে হইতে লাগিল, যেমন এখানে সে মজা দেখিতে আসিয়াছিল, ঘোড়াসুদ্ধ তাহাকে ঐ বনের সহিত বাঁধিয়া রাখিয়াছে, সমস্ত রাত ছুটিলেও কেবল বন প্রদক্ষিণ করিতে হইবে—নিষ্কৃতি নাই—গড়খাই পার হইয়া মাঠে পৌঁছানো রাত পোহাইবার আগে ঘটিবে না। জেদ চাপিয়া গেল, ঘোড়া জোরে—আরও জোরে—বিদ্যুতের বেগে ছুটাইল, ভাবিল এমনি করিয়া সেই অদৃশ্য ভয়ানক বাঁধন ছিঁড়িবে। আর একটা উঁচু আল, অন্ধকারে ঠাহর হইল না, ছুটিতে ছুটিতে হুমড়ি খাইয়া ঘোড়া সমেত তাহার উপর পড়িল। শঙ্করের মনে হইল, ঘোড়ার ঝুঁটি ধরিয়া তাহাকে আলের উপর কে জোরে আছাড় মারিল। তীব্র আর্তনাদ করিতে করিতে সে নিচে গড়াইয়া পড়িল। ঘোড়াও ভয় পাইয়া গেল, শঙ্করকে মাড়াইয়া ফেলিয়া ঝড়ের মতো মাঠে গিয়া উঠিল। শুকনা মাঠের উপর দ্রুত বেগে খুর বাজাইতে লাগিল—খট খট খট খট। রাত্রির শেষ প্রহর, আকাশে শুকতারা জ্বলিতেছে। চার শ বছর আগে যেখানে একদা জানকীরাম পড়িয়া মরিয়া ছিলেন, সেইখানে অর্ধমূর্ছিত শঙ্কর ভাবিতে লাগিল, সেই জানকীরাম কোন দিক হইতে আসিয়া তাহাকে ফেলিয়া ঘোড়া কাড়িয়া লইয়া উত্তর-মাঠের ওপারে তেঘরা বকচরের দিকে চলিয়া যাইতেছেন। ঘোড়ার খুরের শব্দ আঁধার মাঠে ক্রমশ মিলাইয়া যাইতে লাগিল।